বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
৮৭
৩

# বর্ণানুক্রমিক সূচী।


| বিষয়। | | | নাম। | | পৃষ্ঠা। |
|---|---|---|---|---|---|
| ষ্ট | ... | ... | শ্রীহরিহর শেঠ | ... | ৮৭ |
| ষ্ট (গল্প) | ... | ... | শ্রীসরোজকুমারী দেবী | | ২৪৭ |
| ভব্যক্তিবাদের আপত্তিখণ্ডন | | ... | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, | ... | ১৯২ |
| রালে (কবিতা) | ... | ... | শ্রীহরিহর শেঠ | ... | ৪৪১ |
| ুর চপ মাংসখণ্ড দিয়া (খাদ্যপাক) | | ... | শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | ... | ৩১৭ |
| ুমেখেলা বা কাণ্ট্রি কাপ্টেন্ (খাদ্যপাক) | | | ঐ | ... | ৩৭৪ |
| াজি স্বরলিপি ('স্তব্ধরাত্রে' গান) | | ... | | ... | ৩২৬ |
| র ও জগৎ | ... | ... | শ্রীঃ | ... | ৭৯ |
| র প্রেম ও দূরদর্শিতা | | ... | ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর | .. | ২৭৯ |
| হার (গল্প) | | ... | শ্রীহরিহর শেঠ | ... | ১৬৯ |
| াকন্দ (খাদ্যপাক) | ... | ... | শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | ... | ৫৫ |
| র্প সিংহের ভালবাসা (ফরাসী গল্প) | | | শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর | | ৩৩১ |
| াণ প্রার্থনা (কবিতা) | | ... | শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ২১৮ |
| টনি ও জব্বলপুর | ... | ... | শ্রীসরযূবালা দত্ত | ... | ৩৮ |
| া আম দিয়া মটন্-কারী (খাদ্যপাক) | | | শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | ... | ৪৯৪ |
| ইন্স্ কেক্ (খাদ্যপাক) | | ... | ঐ | ... | ৪৯৯ |
| া চিংড়ির বারাহু (খাদ্যপাক) | | ... | ঐ | ... | ২০৪ |
| তজ্ঞতা | ... | ... | ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ৩৬৯ |
| পকলনির কথা | ... | ... | শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ৮২ |
| (কবিতা) | ... | ... | শ্রীসরোজকুমারী দেবী | ... | ৪৩২ |
| ণেশ বাহন ইঁদুর, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা ও ষষ্ঠীর বাহন বেড়াল (সচিত্র) | | ... | শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ৬৯ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| গঙ্গাদেব (জয়পুরী গল্প) | ... | শ্রীশোভনা সুন্দরী দেবী ... | ২৯২ |
| গান | ... | ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... | ২৬৫ |
| গাধিপুর ও গাজীপুর ... | ... | শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... | ৩৯৯ |
| গৃহমুখী ভাব (সচিত্র) | ... | ঐ ... | ২১১ |
| গৃহানুষ্ঠানে স্ত্রীস্বাধীনতা | ... | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, ... | ৩০ |
| গোপালন (বালিকার রচনা) | ... | শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী ... | ১০৬ |
| গ্রাম্য সেতু (লিথো চিত্র) | ... | শ্রীপ্রতিভা সুন্দরী দেবী | |
| গীতিকুঞ্জ— | | | |
| (১) প্রতিজ্ঞা ... | ... | শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... | ৬৮ |
| (২) বীণাপাণি ... | ... | ঐ ... | ৬৯ |
| (৩) প্রার্থনাগীতি ... | ... | ঐ ... | ৬৯ |
| (৪) তারিতরে ... | ... | ঐ ... | ৭০ |
| (৫) তিনি কে ... | ... | ঐ ... | ৭০ |
| (৬) পূরবী—রূপক ... | ... | ঐ ... | ৭০ |
| (৭) শরণাগত ... | ... | ঐ ... | ৭১ |
| (৮) আনন্দধাম ... | ... | ঐ ... | ৭১ |
| (৯) মায়ের করুণা ... | ... | ঐ ... | ৭২ |
| (১০) রণসজ্জা ... | ... | ঐ ... | ৭৩ |
| (১১) তোমারেই চাই ... | ... | ঐ ... | ১৮৮ |
| (১২) হৃদয়ের প্রত্যুষে ... | ... | ঐ ... | ১৮৮ |
| (১৩) প্রকৃত শক্তি ... | ... | ঐ ... | ১৮৯ |
| (১৪) কে কোথায় ... | ... | ঐ ... | ১৮৯ |
| (১৫) ভারত জননীর প্রতি | ... | ঐ ... | ১৯০ |
| (১৬) হাসি ... | ... | ঐ ... | ১৯০ |
| (১৭) তিনি ... | ... | ঐ ... | ১৯০ |
| (১৮) সেই কথা ... | ... | ঐ ... | ১৯১ |
| (১৯) বোঝা দায় ... | ... | ঐ ... | ১৯১ |





| | | | |
|---|---|---|---|
| (২০) সুন্দরি ... | ... | ঐ ... | ১৯১ |
| (২১) আলো ছায়া ... | ... | ঐ ... | ২৬৩ |
| (২২) ছিল ভাল না দেখাই | ... | ঐ ... | ২৬৪ |
| (২৩) প্রভো তুমি কৃপা কর | ... | ঐ ... | ২৬৪ |
| (২৪) সুখ যদি লোকে মূর্খ কয় | ... | ঐ ... | ২৬৫ |
| (২৫) ফুলবনে ... | ... | ঐ ... | ২৬৫ |
| (২৬) দেখ ... | ... | ঐ ... | ২৬৬ |
| (২৭) দুই জনে ... | ... | ঐ ... | ২৬৬ |
| (২৮) কেমনে তোমায় পাব | ... | ঐ ... | ২৬৬ |
| (২৯) হেসে হেসে চলে গেছে | ... | ঐ ... | ২৬৮ |
| (৩০) মধুর স্বপন ... | ... | ঐ ... | ২৬৮ |
| (৩১) দুঃখের জীবন ... | ... | ঐ ... | ২৬৯ |
| (৩২) একা যেতে বন পথে | ... | ঐ ... | ২৭০ |
| (৩৩) তবুরে একাকী ... | ... | ঐ ... | ৪৫৫ |
| (৩৪) তোমায় জেনেছি | ... | ঐ ... | ৪৫৬ |
| (৩৫) আমার নয়নপরে তোমার নয়ন | | ঐ ... | ৪৫৬ |
| (৩৬) পাপীর প্রতি দয়া | ... | ঐ ... | ৪৫৭ |
| (৩৭) করুণাময় ... | ... | ঐ ... | ৪৫৭ |
| (৩৮) তব পদ সেবা ... | ... | ঐ ... | ৪৫৮ |
| (৩৯) প্রেম ... | ... | ঐ ... | ৪৫৮ |
| (৪০) রাগ ... | ... | ঐ ... | ৪৫৮ |
| (৪১) কি কথা ... | ... | ঐ ... | ৪৬০ |
| (৪২) দূরে ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে— | ... | ঐ ... | ৪৬০ |
| (৪৩) এখনো ভুলিনি ... | ... | ঐ ... | ৪৬১ |
| (৪৪) কার মনে কি যে আছে | ... | ঐ ... | ৪৬২ |
| (৪৫) ছদ্মবেশ ... | ... | ঐ ... | ৪৬২ |
| (৪৬) তবতরে ... | ... | ঐ ... | ৪৬৩ |
| (৪৭) দূর নিকট ... | ... | ঐ ... | ৪৬৩ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (৪৮) মুখচন্দ্র ... | ... | ঐ | ৪৬৩ |
| (৪৯) বৃন্দাবনে ... | ... | ঐ | ৪৬৪ |
| (৫০) যতক্ষণ দেহ ... | ... | ঐ | ৪৬৫ |
| (৫১) হাসি ও অশ্রু ... | ... | ঐ | ৪৬৬ |
| (৫২) আলেয়ার আলো | ... | ঐ | ৪৬৬ |
| (৫৩) করিব না কারো হানি | ... | ঐ | ৪৬৭ |
| চিড়ের পিঠে (খাদ্যপাক) | ... | | ২০৫ |
| ছেঁড়া কাগজের ডোমলা (জয়পুরী শিল্প) | | শ্রীশোভনাসুন্দরী দেবী | ২০২ |
| জড়ের সাধারণ গুণ (সচিত্র) | ... | ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর. | ৫৬ |
| জপজী (শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ) | ... | শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১৮৩, ৪৩৪ |
| (১) জগন্নাথ তীর্থে গুরুনানক ও জগন্নাথের আরতি ... | ... | শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২৮১ |
| (২) টা ও খান ... | ... | ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ৩০৫ |
| (৩) তৈল ব্যবহার ... | ... | ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২৮৩ |
| (৪) দয়ে মালাই (খাদ্যপাক) | ... | শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | ৩১৮ |
| (৫) দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা (সচিত্র) | ... | শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২০৭ |
| (৬) ধ্রুবাঙ্ক ... | ... | শ্রীকানাই লাল ঘোষাল | ৩৬২ |
| (৭) নস্যদানী (গল্প) | ... | শ্রীসরোজ কুমারী দেবী | ১২৯ |
| (৮) পরিবৃত্তি (সচিত্র) ... | ... | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, | ১ |
| পরাজয় ... | ... | শ্রীসরোজ কুমারী দেবী | ৩৭৮ |
| পাঁফাতিয়া (খাদ্যপাক) ... | ... | শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | ৫৩ |
| পিতৃগণ (তর্পণতত্ত্ব) | ... | শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১১৮ |
| পিতৃগণ অমূর্ত্ত ও সমূর্ত্ত (তর্পণতত্ত্ব) | ... | শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১৫৩ |
| পুণ্য ভাণ্ডার— | | | |
| (ক) আমের বিচিত্র নাম | ... | শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১০২ |
| (খ) কবিবর ৺বিহারি লাল চক্রবর্ত্তীর অপ্রকাশিত কবিতা (সচিত্র) | ... | ৺বিহারি লাল চক্রবর্ত্তী | ১১৫ |





| | | | |
|---|---|---|---|
| (গ) পালিশ ... | শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ৩১৯ |
| পুরাতন বর্ষের বিদায়গ্রহণ (কবিতা) ... | শ্রীহরিহর শেঠ | ... | ২৮৭ |
| পেয়ারার জেলি (খাদ্যপাক) ... | শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | ... | ৩১২ |
| প্রার্থনা (সচিত্র) ... | ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ১১২ |
| বর্ণভেদে জীবরক্ষা ... | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, | ... | ৩৪২ |
| বাবু আনন্দ নারায়ণ ঘোষের আগমনী সঙ্গীত ও তাহার স্বরলিপি ... | শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ৩০১ |
| বাল্যবিবাহের অশুভ ফল ... | শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর | | ১৬৮ |
| বিছুয়া (খাদ্যপাক) ... ... | শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | ... | ৫৪ |
| বিবাহে স্ত্রীস্বাধিনতা ... | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, | ... | ১০৫ |
| বিলাতী কুমড়ার রসেদার হালুয়া (খাদ্যপাক) ... | শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | ... | ৩৭২ |
| ভাপা ভেটকী (খাদ্যপাক) ... | ঐ | ... | ৩৭৫ |
| ভূগর্ভে অভিব্যক্তির সাক্ষ্য ... | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, | ... | ২৩৩ |
| ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার ... ... | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, | ... | ৪১৪ |
| মনুষ্যশরীরের কৌশল ... | ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ৪৬৮ |
| মাংসের বিরিঞ্চি (খাদ্যপাক) ... | শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | ... | ১৪৩ |
| মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ... | | | ২২৭, ৩২২ |
| মৃত্যু (কবিতা) ... | শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ১৪৪ |
| মোক্ষ (কবিতা) ... | শ্রীহিতেন্দ্রনাথঠাকুর | ... | ৪৪৩ |
| যোগেশ (গল্প) ... ... | ৺কালিদাস চক্রবর্ত্তী | ... | ১৫ |
| য়্যাণ্টিগণ ... | শ্রীকমল কৃষ্ণ শাহা | ... | ১৪৫ |
| রঞ্জনী (গান) ... ... | শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ২৯ |
| রঞ্জিৎ দীঘীর পুরাবৃত্ত ... | শ্রীহারাধন দত্ত | ... | ১৬১ |

| | | |
|---|---|---|
| রাঙা মোথার মোহন ক্ষীর (খাদ্যপাক) | শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | ১৪১ |
| রাঙা আলু-সিদ্ধ গুড় দিয়া (খাদ্যপাক) | ঐ | ১৯৪ |
| রাসায়নিক আকর্ষণ | ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ৪৪৪ |
| লঞ্জা (হিন্দুস্থানী আচার, খাদ্যপাক) | শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | ১৪২ |
| শশাচিংড়ি (খাদ্যপাক) | শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী | ৫২ |
| শিল্প সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র | শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২৪৪ |
| শৈশবে গুরুনানক (সচিত্র) | শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ৯০ |
| সৎ সৈ বা দ্বিজ বেহারী দাস বিরচিত "সৎশ্লোকাবলী" | শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, এম, আর, এ, এস, এফ, আর, এস, এল, | ২১৯, ৩০৯ |
| সংস্কৃত ও প্রাকৃত | | ৪৭০ |
| সাংখ্যস্বরলিপি (এখনো পড়িতেছে মনে, গান) | শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ৭৩ |
| সাংখ্যস্বরলিপি ('তোমার মত কে আছে আপন' গান) | ঐ | ১৫০ |
| সাংখ্যস্বরলিপি ("সত্যসূচনা বিনা" গান) | ঐ | ৪৭৬ |
| সাংখ্যস্বরলিপি ("মেঘের রাজারসাথে করিব আলাপ গান") | শ্রীসুঃ দেবী | ২২৫ |
| সাঙ্কেতিক গুপ্তলিপি | শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ৩৭৭ |
| সুরভি (কবিতা সচিত্র) | শ্রীইন্দিরা দেবী | ১৬০ |
| সুরভি (মেঠাই, খাদ্যপাক) | | ৩১৪ |
| সুরা দেবী | ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ৩৭১ |
| সৃষ্টি (সচিত্র) | মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ৩০১ |
| স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত | শ্রীহরিহর শেঠ | ৩৬০ |
| স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত (চিত্র) | | |
| হিতৌষধ সংগ্রহ | শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১৪৮ |
| হেমকণা পায়স (খাদ্যপাক) | | ২০৩ |


# পুণ্য।

## পরিবৃত্তি।

সংসারে সকলই অনিত্য, সকলই পরিবর্ত্তনশীল। প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন-স্রোত একই ধ্রুব নিত্য সত্যসনাতন পুরুষের পরিধিস্বরূপে আবর্ত্তিত হইতেছে। সেই ধ্রুব সত্য কেন্দ্র স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়াই কি জড়রাজ্যে, কি প্রাণরাজ্যে, কি অধ্যাত্মরাজ্যে, জগতের সর্ব্বত্র অচলপ্রতিষ্ঠ মঙ্গলনিয়ম সকল প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। সেই আশ্চর্য্য নিয়মসমূহের কার্য্যফলেই এই সুশোভন জগতসংসার আদিম বাষ্পরাশির অন্ধকার গর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। পরমাণু সমূহের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণরূপ একটী মঙ্গলনিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারই ফলে সুপক্ক ফলরাশি বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া প্রাণীগণের প্রাণধারণের সহায় হইতেছে; নদনদী সকল সমুন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে জন্মলাভ করিয়া শতসহস্রক্রোশ দূরবর্ত্তী নগরপল্লী ধনধান্যে পরিপূর্ণ করিয়া ভগবানের বিজয়সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। অধ্যাত্মরাজ্যেও আত্মার স্বাধীনবিচরণ প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মঙ্গলনিয়মের বলে সত্যেরই জয়, মঙ্গলেরই জয় সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। আবার প্রাণরাজ্যও অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলে এখানেও কতকগুলি মঙ্গলনিয়ম প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। আমরা এই শেষোক্ত নিয়ম সমূহের মধ্যে একটীর বিষয় আলোচনা করিব—তাহার নাম পরিবৃত্তি।

জড়জগতের ন্যায় প্রাণরাজ্যেও নিয়ত পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। কিন্তু জড়-পদার্থের পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য একটা বহিঃশক্তির প্রয়োজন হয়, প্রাণ-রাজ্যের পরিবর্ত্তনসাধনে পরোক্ষভাবে সহায় হইলেও প্রত্যক্ষভাবে বহিঃ-

শক্তির প্রয়োজন হয় না—প্রাণীদিগের অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবেই তাহাদের অজ্ঞাতসারে মূলপরিবর্ত্তনগুলি সাধিত হয়। যে নিয়মের বলে প্রাণরাজ্যের এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহারই নাম আমরা পরিবৃত্তি দিতেছি। অনেক দূরবর্ত্তী নক্ষত্র কিরণবিস্তার করিলেও সেই কিরণজাল আমাদের নয়নে প্রতিভাত না হইলে যেমন তাহার অস্তিত্ব আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিতে পারি না, সেইরূপ পরিবৃত্তি চিরকাল কার্য্য করিতে থাকিলেও ডার্বিনের পূর্ব্বে অপর কাহারো বুদ্ধিতে তাহা সম্যক্ প্রতিভাত হয় নাই। এই পরিবৃত্তিই ডার্বিনপ্রচারিত অভিব্যক্তিবাদের অন্যতর মূলভিত্তি। পরিবৃত্তির অভাবে জীবনসংগ্রাম জনিত অথবা কাম্য (Sexual), কোন প্রকারই নির্ব্বাচন সম্ভব হইত না এবং সুতরাং অভিব্যক্তির কথাই উঠিতে পারিত না। এই পৃথিবীতে তুমি, আমি, সে, সকলেরই অবস্থা এক হইলে, শরীরমনের বল সর্ব্বতোভাবে সমান হইলে, ঘটনাচক্র সমান অনুকূল হইলে জীবনসংগ্রাম তো দূরের কথা, কার্য্যমাত্রই সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত—এক কথায়, সে প্রকার অবস্থার অস্তিত্ব অন্তত আমাদের কল্পনার নিতান্তই অগোচর।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিলাম যে পরিবৃত্তি একটী নিয়ম মাত্র, যে নিয়মের ফলে প্রাণরাজ্যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া উভয়বিধ নির্ব্বাচনের সহায়তা করে। কিন্তু এই সম্বন্ধে প্রধানত দুই সম্প্রদায়ের মতামত দৃষ্ট হয়—এক সম্প্রদায় পরিবৃত্তি নিয়মের কার্য্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন, অপর সম্প্রদায় পরিবৃত্তি নিয়মে ভগবানের হস্ত প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অস্বীকার করেন। প্রথম সম্প্রদায় বলেন যে প্রত্যেক প্রাণী ভগবান পৃথক্‌ভাবে সংসৃষ্টি করেন, একটা বিশেষ নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইয়া যে জীবাদি অবধি মনুষ্য পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না—ইহাঁরা সংসৃষ্টিবাদী; ইহাঁরা আশঙ্কা করেন যে অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলে বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত মতের সহিত বিরোধ আসিয়া পড়ে এবং সুতরাং সেরূপ শাস্ত্রবিরোধী মতের সমর্থন অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কোন প্রকার শাস্ত্রীয় মতের সহিত অভিব্যক্তিবাদের বিরোধ ঘটে কিনা, তাহা বিচার করিবার ইহা উপযুক্ত স্থান নহে। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে প্রমাণদৃষ্টে প্রাণরাজ্যের পরিবর্ত্তন সকল পরিবৃত্তি নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বীকার



করিলে অধর্ম্মের কোনই আশঙ্কা নাই, বরঞ্চ ইহাতে ঈশ্বরের মহিমাই উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ পায়।

অপর সম্প্রদায় সকল পরিবর্ত্তন পরিবৃত্তি নিয়মেরই কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু তাহাতে ভগবানের হস্ত অস্বীকার করেন। "নিয়ম" কথাটী আমি বড়ই সঙ্কোচের সহিত ব্যবহার করিতেছি, কারণ বর্ত্তমানের সংশয়বাদী সম্প্রদায় "নিয়ম" কথাটীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইচ্ছাময় মঙ্গলময় ভগবানের অস্তিত্বের লোপাপত্তি করিতে সচেষ্ট। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে "নিয়ম" কথাটী কথামাত্র। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে যেমন ইহার মূল্য বলিয়া শেষ করা যায় না, অপর দিক্ দিয়া ধরিলে তেমনি ইহার মূল্য নাই বলিলেও বলে। একটু অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলেই বুঝা যাইবে যে দৈবাৎ বলিয়া জগৎসংসারে কোনো কিছুই নাই, সকলই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছে। যাঁহারা কোন কার্য্যকে দৈবাৎ হইল বলিয়া উল্লেখ করেন, সেটা কেবল তাঁহাদের তদ্বিষয়ক নিয়মের অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। এইখানেই নিয়মের মূল্য। "নিয়ম" কথাটীর দ্বারা অনেকগুলি ঘটনার কার্য্যপ্রণালী সংক্ষেপে বুঝান যায়—এক কথায়, প্রকৃতির ব্যাকরণ হিসাবে নিয়মের যথেষ্ট মূল্য আছে, কিন্তু তদতিরিক্ত মূল্য কোথায়? অগ্নিতে সকলই দগ্ধ হয় অর্থাৎ অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে, এই হইল একটী নিয়ম। আগুনে হাত দাও, কাপড় দাও, যাহাই দিবে, তাহাই পুড়িয়া ছাই হইবে, এই ভাবটী এক কথায় ব্যক্ত করিতে গেলে অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে, এই সংক্ষেপ নিয়মের উল্লেখ করিতে হইবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে অগ্নিতে ইহা দগ্ধ হয়, উহা দগ্ধ হয় বলিবার পরিবর্ত্তে সংক্ষেপে ঐ নিয়মের উল্লেখ করিলেই বুঝিবারও সুবিধা হয়, বুঝাইবারও সুবিধা হয়। এই সুবিধা টুকুর জন্যই নিয়ম কথাটী বহুমূল্য। অগ্নিতে হাত পোড়ে, কাপড় পোড়ে, সকল পদার্থই দগ্ধ হয়, ইহাই হইল ঠিক কথা, আমরা মাত্র ব্যক্ত করিবার সুবিধার জন্য সাধারণভাবে উল্লেখ করি যে অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে। এতক্ষণে যাহা বলিলাম তাহা হইতেই অনায়াসে বুঝা যাইবে যে একটা "নিয়মের" শক্তি ও কার্য্য উৎপাদন করিবার কোনই ক্ষমতা নাই। তবেই প্রশ্ন আসে এই যে, যে পদার্থে যে শক্তি আছে, সে পদার্থ সে শক্তি

পাইল কোথা হ'তে? উত্তর এই—জ্ঞানময় মঙ্গলময় ভগবান প্রত্যেক পদার্থে নিজ নিজ শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন। ভগবান মঙ্গলময়—প্রমাণ, এই সুশোভন বিচিত্র জগৎ, যেখানে ক্ষুধার আহার আছে, তৃষ্ণার জল আছে, এবং যেখানে মঙ্গলভাবেরই সমাদর দিন দিন অধিকতর হইতেছে। ভগবান জ্ঞানময়—প্রমাণ, এই জগত সংসারের সকল ঘটনারই গণিতসাধ্য সূক্ষ্মতা সহকারে নিষ্পাদন, যাহার ফলে গ্রহনক্ষত্র ধূমকেতু সমূহের পুনরাবর্ত্তন, সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতির পুনরাবর্ত্তন শত শত বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতির্বেত্তারা অভ্রান্তরূপে বলিতে পারেন; বুদ্ধি বিশিষ্ট জ্ঞানবান মানবই জ্ঞানময় ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান। তবেই দাঁড়াইতেছে এই যে পরিবৃত্তি নিয়ম কোনই কার্য্য করিতেছে না, ভগবান পরিবৃত্তি নিয়মে কার্য্য করাইতেছেন।

এখন প্রশ্ন এই যে পরিবৃত্তি নিয়মটী কি? জীবরাজ্যে এই একটী আশ্চর্য্য নিয়ম দৃষ্ট হয় যে একই পিতামাতার সন্তানেরা পিতামাতার সহিত অথবা পরস্পরের সহিত ঠিক এক সমান হয় না এবং কোন প্রকারেই অবিকল অনুরূপ অবস্থায়ও পতিত হয় না—পরস্পর এতটুকু, কিছু না কিছু, কোন না কোন বিষয়ে বিভিন্ন হইবেই, কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেই। যে নিয়মের বলে এই বিভিন্নতার সৃষ্টি হয় তাহারই নাম পরিবৃত্তি। এই নিয়মের দূরব্যাপী ফল ডার্বিনের পূর্ব্বে কাহারই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই; ডার্বিন এবং ওয়ালেসই সর্ব্বপ্রথমে ইহার গুরুত্ব জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের অন্তরে মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অভিব্যক্তিবাদীগণের বক্তব্য এই যে এই পরিবৃত্তির ফলে যখন একই পিতামাতার সন্তানেরা প্রথমত পিতামাতার সহিত সমান হয় না এবং সমান অবস্থায়ও পতিত হয় না, তখন পিতামাতার সহিত সন্তানদিগের জীবনসংগ্রাম উপস্থিত হয়। এখানে ধরিয়া লওয়া যাক যে বয়োধিক্য জনিত অপটুতা প্রভৃতি কারণে পিতামাতাই জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন আবার সন্তানগণ পরস্পরের সহিত অসমান হওয়ায় তাহাদের আপনাদের মধ্যে জীবনসংগ্রাম ঘটে। এই জীবনসংগ্রামে জয়ী, সর্ব্বাংশে যোগ্যতম সন্তানেরাই আবার সময়ে পিতামাতা হইবে, আবার



তাহাদের সন্তানদিগের মধ্যে যোগ্যতম সন্তানেরাই জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে হইতে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং উন্নতির সোপানাবলী সংরচিত হয়। তবেই দেখিতেছি যে জীবনসংগ্রামের ও সুতরাং অভিব্যক্তিবাদেরও মূল অবলম্বন পরিবৃত্তি। সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত না হইলেও এই পরিবৃত্তি কোন্ অবস্থায় কতটুকু কার্য্য করিবে, তাহারও আবার বিশেষ বিশেষ নিয়মপ্রণালী আছে—কেবল পরিবৃত্তি কেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে কোন শক্তিই, কোন নিয়মই অনিয়মে স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পারে না। এক জোড়া পক্ষীর দুইটী শাবক বিভিন্ন প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিল—কেন এরূপ হইল? ইহার কারণ সমূহ আমাদিগের সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত না হইলেও কারণের সমবায়ে ও নিয়মের ফলেই যে এরূপ ঘটিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

এইবারে পরিবৃত্তি নিয়মের নিয়মত্ব পরীক্ষা করিতে হইবে; দেখিতে হইবে যে ইহার প্রসার কতদূর। মাধ্যাকর্ষণ একটী নিয়ম আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু তাহার নিয়মত্ব জগতের অসংখ্য ঘটনায় অসংখ্য অবস্থায় পরীক্ষিত হইয়া দেখা গিয়াছে যে জড়জগতের সর্ব্বত্র তাহার প্রসার। অবস্থাভেদে ইহার কার্য্যের বিভিন্ন আকার দেখা যায়—গ্রহনক্ষত্রের পরিভ্রমণে এক আকার, নদীপ্রবাহে এক আকার, আবার হিমানীযুগের বরফপাতে পৃথিবীর ধ্বংশে অন্য আকার। সেইরূপ পরিবর্ত্তন নিয়মের প্রসার জগতের সর্ব্বত্র—কোন জীব, কোন পদার্থ এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহা থাকিবে, এক মুহূর্ত্ত পরে তাহা কোন প্রকারেই অপরিবর্ত্তিত আকারে থাকিতে পারিবে না। কেবল অবস্থাভেদে ইহার কার্য্যের বিভিন্ন আকার প্রকার দৃষ্ট হয়। বাষ্প হইতে জল, জল হইতে বরফ এবং পুনরায় বরফ হইতে জল ও জল হইতে বাষ্প, এই এক প্রকার সহজ পরিবর্ত্তন হইল। আবার বিভিন্ন পদার্থসংযোগে যে পৃথক্ পদার্থের উদ্ভব হয়, তাহার প্রণালী বিভিন্ন এবং সেই পরিবর্ত্তনের নাম রাসায়নিক পরিবর্ত্তন। আবার এই পরিবর্ত্তন যখন প্রাণরাজ্যে কার্য্য করে, তখন তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার ধারণ করে এবং তাহার প্রণালীও স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। প্রাণরাজ্যের এই পরিবর্ত্তন প্রণালীর নামই

আমরা পরিবৃত্তি দিয়াছি। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পরিবৃত্তির প্রসার প্রাণ-রাজ্যের উপরে।

জীবতত্ত্ববিদেরা এক প্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রাণরাজ্যের অভিব্যক্তির আদি জীবাদি বা প্রাণপঙ্ক এবং অন্ত মানব। আমাদিগের দেখিতে হইবে যে প্রাণপঙ্ক অবধি মানব পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর উপরেই পরিবৃত্তি কার্য্য করে কিনা। প্রাণপঙ্কের প্রকৃত স্বরূপ এখনও স্থিরীকৃত না হওয়াতে, বলা বাহুল্য যে, তাহাতে পরিবৃত্তির কার্য্যও বিশেষভাবে বিজ্ঞানের আয়ত্ত হইতে পারে নাই। প্রাণপঙ্ক ছাড়িয়া পুরুভুজ শ্রেণীতে আসিয়া পৌঁছিলে পরিবৃত্তির কার্য্য উপলব্ধ হইতে পারে। অধিকাংশ পুরুভুজ মুখের পরিবর্ত্তে গাত্রের অবনতির দ্বারা সাময়িক একটা মুখাকৃতি গর্ত্ত করিয়া আহার গ্রহণ করিয়া থাকে—কতকটা কীটভুক বৃক্ষের ন্যায়। * স্পঞ্জ, প্রবাল প্রভৃতি পুরুভুজ শ্রেণীরই বর্ণবিভাগ মাত্র। দোকানে গিয়া কতকগুলি স্পঞ্জখণ্ড দেখিলেই বুঝা যাইবে যে সকলগুলি এক শ্রেণীর স্পঞ্জ নহে। এক শ্রেণীর স্পঞ্জ এক আকারে গঠিত, অপর শ্রেণীর স্পঞ্জ সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকারে। সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার কার্পেণ্টার বলেন যে "স্পঞ্জ শ্রেণীর পুরুভুজের ( Foraminifera ) মধ্যে পরিবৃত্তির প্রসার এত বিস্তৃত যে বিশেষ বিশেষ অংশের পরিবর্ত্তন বশতঃ ইহাদের কেবল শ্রেণীবিভাগ নহে, জাতিবিভাগ এবং বর্ণবিভাগও করিতে হইয়াছে।" † প্রবালসমূহে

---

* Protozoans generally have no mouth or only such as may be formed by a depression of the surface at the time when a particle of food is to be received and digested. They include * * sponges and many of the so called animalule ; the sponges * * being compound groups of protozoans * * *. Dana quoted by Webster.

† The range of variation is so great among the Foraminifera as to include not merely those different characters which have been usually accounted *specific*, but also those upon which the greater part of the *genera* of this group have been founded, and even in some instances those of its *orders*".

Dr. Carpenter quoted by Wallace.



পরিবৃত্তির কার্য্য বিশেষভাবে লক্ষিত হইতে পারে। এই কলিকাতার যাদুঘরে ( museum ) রক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবাল দেখিলেই এই বিষয় সহজে বুঝা যাইবে। এক শ্রেণীর প্রবাল জ্বালামুখীর গর্ত্তের ( Valcanic crater ) ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হয়—আমরা তাহার নাম 'জ্বালাগর্ত্ত' প্রবাল দিলাম। এক শ্রেণী "প্রশাখ" প্রবাল অবিকল বিস্তৃতশাখ বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে। পরিবৃত্তির ফলে এই প্রকার নানা শ্রেণীর প্রবালের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। বিভিন্নভাবে অবস্থিতি দ্বারাই যে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবাল চিহ্নিত হয় তাহা নহে, তাহাদের গুঁয়া, মুখের আকার প্রভৃতি বিষয়েও বিস্তর বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। শম্বূক প্রভৃতি মেরুদণ্ডবিহীন জীবসমূহেরও মধ্যে বিভিন্নতা এবং সুতরাং পরিবৃত্তির কার্য্য দৃষ্ট হয়। গুগ্‌লিও শম্বূক জাতীয়, আর দ্বিদল মুক্তাশম্বূকও শম্বূক জাতীয় অথচ উভয়ের প্রভেদ কত।

ধীর পদক্ষেপে কীটপতঙ্গের দিকে অগ্রসর হইলে এখানেও এক এক জাতির ভিতরে কত শ্রেণী, কত বর্ণবিভাগ, সুতরাং পরিবৃত্তির কার্য্য দেখা যাইতে পারে। প্রজাপতির বিষয় আলোচনা কর, দেখিবে যে এক শ্রেণীর প্রজাপতি পক্ষসমেত দৈর্ঘ্যে ৩ ইঞ্চি প্রস্থে ২।২৷৷০ ইঞ্চি এবং দেখিতে ঘোর নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ; অপর শ্রেণীর প্রজাপতি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ১ ইঞ্চি হয় কিনা সন্দেহ এবং দেখিতে ঈষৎ বেগুনে মেঘের ন্যায়, দুএকটী দাগ আছে, চক্ষু দুইটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, চারিধারে সবুজ রঙ্গের পরিধি। আমাদের দেশে এমনি একটা বিজ্ঞানবিরোধী ভাব বিদ্যমান যে সচরাচর যে সকল কীট সন্ধ্যাপ্রদীপের নিকটে প্রতিদিন উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত উত্যক্ত করে, তাহাদেরও নাম, প্রকৃতি, আকৃতি কোন বিষয়েই কোন লক্ষ্য রাখি না। ধেপ্‌সো পোকা, ইংরাজীতে যাহাকে মথ moth বলে, তাহার প্রচলিত নামের অনুসন্ধান করিয়া হতাশ হইয়াছি। এই ধেপ্‌সো পোকারই বিভিন্নতা কত। আবার পিপীলিকা জাতি ধরিলে দেখি, (১) লাল পিঁপড়ে, ইহারা অত্যন্ত কামড়ায়। (২) কাল ছোট পিঁপড়ে —মোটেই কামড়ায় না। (৩) কাল ডেঁয়ে পিঁপড়ে—ইহাদের পুরুষগুলো অত্যন্ত বিষাক্ত এবং মাংসপ্রিয়; শুনিয়াছি একটী এক মাসের ছেলেকে

রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল, গৃহকর্ম্ম সারিয়া আসিয়া তাহার জননী ছেলের পরিবর্ত্তে এক রাশ ডেঁয়ে পিঁপড়ে দেখিতে পাইল। ইহা আশ্চর্য্য নহে, ডেঁয়ে পিপড়ের বাসার কাছে একটী মাংসখণ্ড রাখিলেই এই ঘটনার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। (৩) কাঠ পিঁপড়ে—ইহারা সচরাচর গাছে মাকড়-সার বাসার ন্যায় বাসা প্রস্তুত করে। ইহাদের ক্ষমতা এত যে ভীমরুল ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হয়, ইহারা ভীমরুলের কটিদেশ কাটিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে, পশ্চিমে ভীমরুলের উপদ্রব অতিমাত্রায় হইলে এই পিপড়ের বাসা গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া আনিয়া তাহাদের চাকের কাছে রাখিয়া দেয়। (৪) গন্ধী ( গোঁদো ) পিপড়ে—এই পিপড়ে অতি ক্ষুদ্র, কাম-ড়ায় না, কিন্তু ইহাদের এক প্রকার গন্ধ আছে, দৈবাৎ মারিয়া ফেলিলে এক প্রকার গন্ধ নির্গত হয়—তাহা আঘ্রাণ করিতে নিতান্ত ভাল লাগে না। ইহা ব্যতীত আরও কত বিভিন্ন শ্রেণীর পিপড়ে দৃষ্ট হয়, তাহার সকল গুলি এখানে উল্লিখিত হইল না।

কীটপতঙ্গের ঊর্দ্ধে সরীসৃপ—এখানেও পরিবৃত্তির কার্য্যকারিতার অভাব নাই। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি জীবতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক মিলনে এডোয়ার্ডস্ টিকটিকি জাতির বিভিন্নতা দেখাইয়াছেন। * আমরাও কোন শ্রেণীর নাম দিয়াছি গিরগিটি, কোনটার বা টিকটিকি কোনটার বা বামুন টিকটিকি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে গোধা টিকটিকিরই অভিব্যক্তি। যে অর্থে আমরা বাঘের মাসী বিড়াল বলি, সেই অর্থে গোধার মাসী টিকটিকি বলিতে পারি।

---

* ওয়ালেস এই সম্বন্ধে ডার্বিনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"M. Milne Edwards ( Annales des Sci. Nat. 1 ser. Tom XVI P. 50 ) has given a curious table of measurement of fourteen species of Lacerta Muralis, and taking the length of the head as a standard, he finds the neck, trunk, tail, front and hind legs, colour, and femoral pores, all varying wonderfully ; and so it is more or less with other species. So apparently trifling a character as the scales on the head affording almost the only constant characters".



কীটপতঙ্গ সরীসৃপের পর আমরা পক্ষীরাজ্যে উপস্থিত হই। আমরা কালো কাক সচরাচর দেখিতে পাই, কিন্তু সাদা কাক অতি অল্প লোকেই দেখিয়াছেন, আমরা দেখিয়াছি,—বোধ হয় একটী মৃত সাদা কাক কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রন্থে পরিবৃত্তির একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। নিউজীলণ্ডের কীয়া নামক তোতাপাখী ইউরোপীয়দিগের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মধু, মধুপায়ী কীট ও ফল প্রভৃতি আহার করিত; ইউরোপীয় বসতি হইবার পরে মাংস খাইতে সূত্রপাত করে; মেষচর্ম্ম কিম্বা মাংস শুকাইবার জন্য ঝুলাইয়া রাখা হইত, তাহাই খাইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এরূপ ঘোর মেষমাংসপ্রিয় হইয়া উঠিল যে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জীবন্ত মেষ আক্রমণ করিতে দৃষ্ট হয়। ক্রমে এখন জীবন্ত মেষের পৃষ্ঠে বসিয়া যকৃৎ পর্য্যন্ত কুরিয়া না খাইলে তাহার তৃপ্তিসাধন হয় না। ইহার ফলে তাহার ধ্বংসসাধনের উপায় অবলম্বিত হইতেছে। এই দৃষ্টান্তে এক পরি-বৃত্তির ফলে বৃদ্ধি ও ধ্বংস কেমন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। চড়ুই, শালিখ প্রভৃতি সকল পক্ষীগণের মধ্যেও পরিবৃত্তির কার্য্য সকল সময়ে প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও নিশ্চয়ই যে ঘটিতেছে তাহা স্বীকার্য্য কারণ তাহা না হইলে তাহারা আপনাপন শাবক নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিত না এবং যে সকল পক্ষী অনেকগুলি ডিম্ব এক সময়ে প্রসব করে, তাহারা সেই সকল ডিম্বপ্রসূত শাবকগণের মধ্যে প্রভেদ করিয়া যথাক্রমে প্রয়োজনমত আহার যোগাইতে সক্ষম হইত না। এই কথাটী পশুরাজ্যেও প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত কয়েকটী দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে। আমরা সচরাচর ধূসর বর্ণের শৃগাল দেখিয়া থাকি, কিন্তু সুমেরু কেন্দ্রে শ্বেত শৃগাল দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমরাও বারাকপুরের পশুশালায় একটী দেখিয়াছিলাম। সেইরূপ ধূসর, কৃষ্ণ, শ্বেত প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের ভল্লুকও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছি, সে গুলির মধ্যে পরি-বৃত্তির কার্য্য অনেকটাই স্বীকার করিয়া লইয়াছি, স্বীকার করিয়া লইলেও তাহা অনুমান। কিন্তু সেই অনুমান অবলম্বন করিবার হেতু আছে—যখন গৃহপালিত পশুপক্ষীর মধ্যে পরিবৃত্তিকে প্রত্যক্ষভাবে কার্য্য করিতে দেখি, তখন বন্য জীবজন্তুর মধ্যে বর্ণবিভাগ প্রভৃতি দেখিলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে এই বিভাগ পরিবৃত্তির কার্য্যকারিতায় ঘটিয়াছে।

রূপে অনুগৃত হইয়া থাকিতে হয়। এই কারণে হিন্দুর বিবাহবিচ্ছেদের নালিস করিবার প্রয়োজনও নাই এবং তদুপযোগী আইনও নাই।

হিন্দুর বিবাহ পদ্ধতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম তাহা শাস্ত্রীয় পদ্ধতি সম্বন্ধেই প্রযুজ্য, বর্ত্তমানের কন্যাবিক্রয়, কন্যার সহিত কন্যাকর্ত্তারও যথাসর্ব্বস্ব হরণ প্রভৃতি প্রচলিত নৃশংস আগাছা অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে। আমার বক্তব্য এই যে আমাদের আদর্শ অতি উন্নত এবং উন্নত থাকাও উচিত। মনুষ্য সকল সময়ে উন্নত পথে ঠিক থাকিতে পারে না, অপূর্ণ মানবের পতন মধ্যে মধ্যে অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু যদি উন্নত আদর্শ নয়নের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে আশা থাকে যে সময়ে এই আদর্শের পথে আবার চলা যাইতে পারে এবং সুতরাং উদ্ধারের আশাও একেবারে বিলুপ্ত হয় না। তাই বলি যে ভারতের হিন্দুজাতির স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে আদর্শ অতি উন্নত আছে, সেই কারণে হিন্দুভারতের উদ্ধারের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই এবং সুতরাং আমার ক্ষীণ-কণ্ঠেও সকলকে সেই ঋষিপ্রদর্শিত উন্নত আদর্শের পথে চলিবার উপদেশ দিতেও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না—ক্ষান্ত থাকা পাপবোধ হয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# প্রার্থনা।

স্নেহময়ী জননীর শ্যামল ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারের রৌদ্র-তপ্ত পথে পথে নয়নালোর সম্বল করিয়া আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। নরক যন্ত্রণার অন্ধকার বিভীষিকায় জীবনের মধুর প্রভাত অতিবাহিত করিয়া আমাদের হৃদয়ের শোভন সৌকুমার্য্য দিনে দিনে মুছিয়া যাইতেছে। তোমার সন্তানের মুখশ্রীতে যে পবিত্র মহত্ত্ব ছিল—যে গভীর সৌন্দর্য্যে মানবের হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, অযতনে সে হৃদয়ের অনুপম ভাব ম্লান হইয়া পড়িতেছে। আর সে মহান্ সৌন্দর্য্য—গম্ভীর শোভা—সুমধুর পবিত্রতা নাই। বিষয়চিন্তায় ইহকাল ফুরাইয়া যায়; পরকাল চক্ষের সম্মুখে ধোঁয়ার মত—সেখানেই বা আশা কোথায়? জননীর ক্রোড়ে আমাদের আর স্বত্ব নাই, মাতার স্নেহে



আমাদের আর অধিকার নাই, সংসারের আদেশে স্নেহের উৎস প্রেমের সাগর ছাড়িয়া চিরদিন পরের মুখ চাহিয়া জীবন কাটাইতে হইবে—আমাদের যেন জননী নাই, বিপুলা ধরণীতে আমাদের যেন থাকিবার স্থান হয় নাই, মাতৃ স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া পাপের আশ্রয়ে জীবনের শান্তি রচনা করিতে হইবে। স্নেহময়ি! এই দুর্দ্দিনে তোমার নিরন্ন ক্ষুধাকাতর সন্তানকে ক্রোড়ে আশ্রয় দাও। আমাদের চারিদিকে অবসাদ ঘনাইয়া আসিতেছে। আপনভারে আমরা অবসন্ন—আর ভার বহিতে পারি না। বাসনা আমাদিগকে শতপাকে জড়াইয়াছে—কুহকিনীর মন্ত্রপাশ ছিন্ন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। পাপ-পঙ্কিল হৃদয়ে একবার তোমার চরণকমল অর্পণ কর—তোমার পুণ্যচরণ-স্পর্শে মায়াবিনীর নাগপাশ ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমাদের হৃদয়ে সকলই অন্ধকার। অন্ধকার আসিয়া আলোককে ছাইয়া ফেলিয়াছে, রাহু আসিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিয়াছে, হিংসা আসিয়া প্রেমকে আক্রমণ করিতেছে, সত্যের অবমাননা করিয়া মিথ্যা দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের আর মঙ্গল নাই—এখন তুমিই একমাত্র অগতির গতি।

জানিয়া, না জানিয়া বাসনার পূজার জন্য কতবার কত সুকুমার হৃদয়ে আঘাত দিয়াছি—কত হৃদয়ের সমস্ত সুখশান্তি দলিত করিয়া ক্ষুদ্রত্বের গর্ব্বে এমনি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছি যে, তোমার নাম লইয়া রসনা তৃপ্তিরও অবসর পাই না। কথায় কথায় তর্ক করিতে ছুটি, আস্ফালন করিতে থাকি, তোমার নাম লইয়া পরস্পরের প্রতি অন্যায়াচরণ করি—কাপট্য অবলম্বন পূর্ব্বক তোমার পবিত্র নামে অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করি। প্রভুত্বের জন্য, যশের জন্য, হৃদয়ের সহস্র তুচ্ছ বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য পরস্পরের বিপক্ষে শাণিত রসনার তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার স্থাপন করিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। মনে করিয়াছি, পরলোক নাই, ধর্ম্ম নাই, সত্য নাই, ফাঁকিদ্বারা সকল কার্য্য সমাধা করিয়া সহজেই আপনাকে ধর্ম্মের অবতার প্রতিপন্ন করিব। এইরূপে ফাঁকির উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দিন দিন আমরা ফাঁকিতে পড়িতেছি। রসনা যাহা বলে হৃদয় তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না, বাক্য যে উপদেশ দিয়া যায় কার্য্য তাহা দূরে ফেলিয়া দেয়, কায়মনোবাক্য একভাবের সেবা করিতে চাহে না। তোমার করুণা বিনা আমাদের আর গতি নাই।

তোমার ন্যায়দণ্ডে আমাদিগকে শিক্ষা দাও, যাহাতে পাপের কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিয়া তোমার পূর্ণমঙ্গলভাব উপলব্ধি করিতে পারি।

আমাদের পাপের অন্ত নাই—সাধ করিয়া আমরা পরের হৃদয় লইয়া টানাটানি করি, পরের মনে কষ্ট দিয়া সুখী হই—আমাদের পাপের শেষ নাই। নির্ম্মম-শকুনি-ভাবে আমাদের হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে। দুই মুঠা তর্কের সাহায্যে আপনার মূর্ত্তি গড়িয়া অহোরাত্র আপনাকেই পূজা করিতেছি। বিপদে পড়িলে চৈতন্য উপস্থিত হয়—তখন একবার তোমার জন্য কাঁদিয়া উঠি। তোমার করুণায় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া আবার আপনার অহঙ্কারে মত্ত হই। সাংসারিক প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনায় হৃদয় টলমল—কিন্তু দাম্ভিকতা ছাড়িতে পারিলাম না। কথার উপর কথা জড় করিয়া আপনার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতেছি—কথা কাটাকাটিতে পরাজয় সহিতে হইবে না। হৃদয় যে অনুর্ব্বর হইয়া উঠিতেছে সে দিকে দৃষ্টি নাই। বহিঃ শত্রু হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে গিয়া অন্তরে রিপুকুলের প্রতিষ্ঠা করিতেছি—তাহা বুঝিতেছি না। এ জড়-হৃদয়ে তোমার চরণ-সৌন্দর্য্য এক-বার স্পর্শ কর—হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক। তোমার ন্যায়-দণ্ড এ পাষাণের পাষাণত্ব ঘুচাইয়া দিক্—পাষাণ গলিয়া গিয়া প্রেমের উৎস বহিতে থাকিবে। আমরা অধঃপাতে যাইতেছি। তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

এই চির-অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া—মৃত্যুন্মুখ মুহূর্ত্তের অঙ্কে মস্তক রাখিয়া—মা আমার! তোমার সন্নিধানে প্রার্থনা, তোমার কার্য্যসাধনে কখনও অবহেলা না করি—মৃত্যু-যন্ত্রণায় তোমার কার্য্য করিতে করিতেই জীবন অবসান হয়।

৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# পুণ্য ভাণ্ডার।

## কবিবর ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর অপ্রকাশিত কবিতা। *

১২৭১ সাল। ৬ জ্যৈষ্ঠ।
রাত্রী ১০ ঘণ্টার সময়

প্রিয় সখা

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"প্রযুক্ত সৎকার বিশেষমাত্মনা
ন মাং পরং সম্প্রতিপত্তুমর্হসি
যতঃ সতাং * * * সঙ্গতং
মনীষিভিঃ সাপ্তপদীনমুচ্যতে॥"

একি এ নূতন আলো অন্তরে উজলে!
অরুণ কিরণ যেন প্রফুল্ল কমলে।
বহু দিন যে রস করিনি আস্বাদন,
আজি সে মধুর রসে রসিয়াছে মন।
মৈত্রী কিম্বা প্রেম ইহা ঠিক নাহি পাই;
যারে ভালবাসা বলে বুঝি হবে তাই।

---

* পিতৃদেব ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গসাহিত্য সম্পর্কীয় নানা সংগৃহীত বিষয়গুলির মধ্য হইতে কবিবর ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর এই পত্রও পাওয়া গিয়াছে। ইহা বঙ্গসাহিত্যের পাঠকদিগের প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত পুণ্যে প্রকাশিত হইল। কবিবরের রচনার সম্ভ্রম রক্ষার্থ আমরা তাঁহার কোনরূপ ভ্রমটীতেও হস্তক্ষেপ করিলাম না।—যেমনটী আছে তেমনটী ছাপাইলাম। কবিবরের ছবিখানি পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পেন্সিলে অঙ্কিত চিত্রের অনুলিপি। কবির সে সময়ের হস্তের স্বাক্ষরটীও আমরা অবিকল খোদিত করিয়া আনিয়া প্রকাশ করিলাম।

পুঃ সং

ছেলেবেলা ছেলেখেলা ফুরায়ে গিয়েছে,
মানুষের মনে মন পশিতে শিখেছে ;
তা না হোলে একটুও ছাড়াছাড়ি নাই।
আজি কেন পশিতে প্রবৃত্তি নাহি হয় ?
ছেঁড়া খোঁড়া ভাবিতেও জন্মে যেন ভয় ?
যেন ইহা প্রভাতের পবিত্র কুষম, ( কুষুম )
ছেঁড়ে কোন্ সহৃদয়, অহৃদয় সম ?
নির্ম্মল বাতাশে বেস হেলিবে দুলিবে,
মধুর আমোদে আত্মা উথলে উঠিবে।

হায় কেন মন ফের দোলে গো দোলায় !
ঢাকে বা উষার ছটা মেঘের ছায়ায়।
বটে এই মনোহর কুষুম রতন
সৌরভে গৌরবে মোরে করে আকর্ষণ ;
কে জানে ইহার নাই কেহ অধিকারি ?
কে জানে যে নহে ইহা নিজস্ব তাহারি ?
পাছে আমি নাহি পাই সম্ভোগের পথ,
হই পাছে মাঝ্ পথে ভগ্ন মনোরথ,
অথবা চরমে মম মরমের মাজে
আচম্বিতে চোরা বাণ বেগে এসে বাজে ?
কি আছে অদৃষ্টে, তাহা বলা নাহি যায়,
"সুখেতে থাকিতে পাছে ভুতেতে কিলায় ?"
দূর হোক্ এ দোলায় কেন দুলি আর,
সন্দেহে প্রণয় সুখ হয় ছার্খার্।
উদার অন্তরে দিয়ে হৃদয় ঢালিয়ে
চুপ্ কোরে বোসে থাকি নিশ্চিন্ত হইয়ে।

হয় তো আমার মন মজেছে যেমন,
সে তাহার বিন্দুমাত্র করেনি গ্রহণ।

৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

ছিল। পিতৃসম্প্রদায়ভুক্ত ঋষিরা কঠোর বৈজ্ঞানিক ঋষি ছিলেন। পিতৃগণের অভ্যুদয় কাল হইতেই ভারতে বিশেষ রূপে বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব। দেব ও পিতৃভাব এই দুইটী ঠিক বিপরীত মুখী। দেবভাবে প্রকৃতির কল্যাণে সকলি সহজে সম্পন্ন হয় আর পিতৃভাবে বিজ্ঞানের বলে নানা কৃত্রিম উপায়ে সকল বিষয় সম্পন্ন করিতে হয়। মানব সমাজের অঙ্কুর বা অপক্ক শৈশবাবস্থায় দেবভাবের প্রাধান্য এবং পরিপক্ক অবস্থায় পিতৃভাবের প্রাধান্য। পিতৃগণের অভ্যুদয়ে সভ্যতা বা উন্নতি চরম পরিপক্কতা লাভ করে। পিতৃযুগে মানবসমাজ দেবযুগের সেই শৈশবসুলভ সহজ ভাব ছাড়িয়া বিজ্ঞানের পদভরে দাঁড়াইতে সক্ষম। মানবসমাজ বয়োবৃদ্ধ হইলে প্রকৃতি মাতা যখন তাঁহার স্নেহহস্ত মানবের পৃষ্ঠ হইতে তুলিয়া লইতে চাহেন, মানব তখন আপনার বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপায় সমূহকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে থাকে। দেবভাবে শৈশবের উন্মুক্ত সহজ ভাব এবং পিতৃভাবে বয়োবৃদ্ধের কঠোর সংযত ভাব বিদ্যমান। বৈদিক যুগের অন্তে অথর্ব্ববেদের কাল হইতেই প্রকৃষ্ট পিতৃকালের আরম্ভ। অথর্ব্ববেদ ও উহার শাখা আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্র প্রভৃতি পিতৃগণরোপিত বিজ্ঞানবৃক্ষের প্রকৃষ্ট ফল। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে সচরাচর ঋষিরা অথর্ব্ববেদকে উচ্চ আসন দিতে চাহিতেন না কেননা অথর্ব্ববেদে পরের অনিষ্টকারী অভিচারাদি মন্ত্র স্থান পাইয়াছে। * এই কারণেই অথর্ব্ববেদ বেদের মধ্যে সর্ব্বনিম্নে আসন লাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রথম প্রথম ঋষিসমাজে অথর্ব্ববেদ অনেকের নিকট ঘৃণিত হইলেও উত্তরোত্তর উহার শিষ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অথর্ব্ববেদ বিজ্ঞানের অগ্নি চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত করিয়া দিল। চিকিৎসা ও ওষধি বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনার দ্বারা অথর্ব্ববেদ ক্রমশঃ লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে লাগিল। অতএব দেখা যাইতেছে সমগ্র জগতে প্রথম বিজ্ঞানের পথ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন পিতৃগণ।

এই উচ্চ পিতৃভাবের কারণে পিতৃগণ লোকে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। কঠোর সাধনার বলেই তাঁহারা এই উচ্চ শিখরে আসন লাভ করিয়াছিলেন। নিভৃত অরণ্য বিজন শ্মশান ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পিতৃগণ

* ভাব

'ঋষিভাব' "যজ্ঞ ও আহার" প্রবন্ধ দেখ। (পুণ্য দ্বিতীয় বৎসর ১০ম ও ১১শ সংখ্যা।)



লোকহিতের জন্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের আবিষ্কারের দ্বারা জগতের ইষ্টসাধনে রত ছিলেন। গৃহে পুত্র কলত্রাদির নিকট পিতা যেমন মহা শ্রদ্ধার পাত্র—আকাশের উচ্চে যেমন তাঁহার আসন, পিতৃগণও সেইরূপ জনসমাজের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আকাশের উচ্চে স্থান লাভ করিয়াছেন। গৃহের পিতার সম্বন্ধেও যেমন মনীষী শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—

মাতা গুরুতরাভুমেঃ খাৎ পিতা উচ্চতর স্তথা।

"মাতা ভূমি অপেক্ষা গুরুতরা পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর" সেইরূপ পিতৃগণ সম্বন্ধেও উচ্চতর স্থান আকাশ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণাদিক তথৈবচ। * (সুমন্ত)

"পিতৃদিগের স্থান আকাশ ও দক্ষিণদিক।"

দক্ষিণদিকেরও সহিত পিতৃগণ যেন কি এক সূক্ষ্ম সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত ছিলেন; তাই শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে উচ্চে আসন দিবার জন্য যেমন তাঁহাদিগের স্থান আকাশ বলিয়াছেন তেমনি দক্ষিণদিকও বলিয়াছেন। দিগ্বীক্ষণের কাঁটার ন্যায় তাঁহাদিগের অন্তরের টান দক্ষিণাভিমুখে ছিল। তাঁহারা অন্তরে যেমন দক্ষিণাহাদিথী বাহিরেও তেমনি দক্ষিণাভিমুখী ছিলেন। যেমন মুসলমান দিগের ভৃগুবা লক্ষ্য পশ্চিমাভিমুখে, তাহারা যেমন সকল কর্ম্মই মক্কার দিকে পশ্চিঃ তাঁহ হইয়া সম্পন্ন করিতে চাহে, পিতৃগণও সেইরূপ দক্ষিণাভিমুখে লক্ষ্য কৎসা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহারা যজ্ঞে বসিবেন তাহাও দক্ষিতেন,ক জানু পাতিয়া বসিবেন। ঋগ্বেদে পিতৃলোক সম্বন্ধীয় সূক্তে স্পষ্টই আছেকরে

আঃ কজানু দক্ষিণতো নিষদ্যেমং যজ্ঞমভিগৃণীত বিশ্বে। †

"হে পিতৃচক্ষু তোমরা দক্ষিণদিকে ভূমিনিহিত জানু হইয়া উপবেশন

দেবগ

* যেমন এ গবলেঃ পালোক গৃহের চতুর্দ্দিক আলোকিত করে, সেইরূপ একটী সত্যবাক্যও কোন বি চতুর্দ্দিক আলোকিত না করিয়া যায় না। "পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণাদিক তথৈব সাহ এই শাস্ত্র বাক্যটী পিতৃস্থান দক্ষিণদিক ও পিতৃপক্ষ দক্ষিণায়ন সম্বন্ধে যেমন সত্য সে বিষ্ণুপদ ভ তৃগণও পিতৃলোক চন্দ্র সম্বন্ধেও সত্য। এই শক্তিশালী শাস্ত্র বাক্যটী পিতৃ সম্পর্কী চতুর্দ্দিকে কিরণ জাল বিস্তার করিয়া সত্যার্থ সমূহ উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছে।

† ঋরিবংশ অষ্টাদমণ্ডল, ১৫সূক্ত।

পূর্ব্বক এই যজ্ঞকে প্রশংসা কর।" আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ একাধারে যেমন অনন্ত ওষধির আকর সেইরূপ অনন্তরত্নেরও আকর বলিয়াই ওষধিপতি বিজ্ঞানবিৎ পিতৃগণের একমাত্র লক্ষ্য দক্ষিণদিক ছিল। "দক্ষিণোনুকূলঃ" অন্তরেও তাঁহারা দাক্ষিণ্যাদি গুণভূষিত হইয়া সংসারের অনুকুল ভাবাপন্ন অর্থাৎ মঙ্গলকারী ছিলেন। রোগীর চিকিৎসা, ঔষধ প্রদান, অন্নের দ্বারা প্রজার ভরণপোষণ প্রভৃতি দাক্ষিণ্যগুণ পিতৃভাবের একটী প্রধান লক্ষণ। * দানার্থ দক্ষিণা ও দাক্ষিণ্য শব্দদ্বয় 'দক্ষিণ' হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই দাক্ষিণ্যগুণে পিতৃগণ বিশেষ মহত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

পিতা যেরূপ সহস্র ক্লেশ সহ্য করিয়াও পুত্রাদির ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন পিতৃগণও সেইরূপ নানারূপে কঠোরতার সাধন করিয়া পুত্রস্নেহে জন-সমাজের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান ছিলেন। লোকগুরু †পিতৃগণ তজ্জন্য লোকে শ্রদ্ধার পাত্র না হইয়া যাইতে পারেন নাই। এই ‡কারণেই প্রকৃতপক্ষে গৃহের পিতার ন্যায় পিতৃগণেরও উদ্দেশে শাস্ত্রকারেরা শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহাভারতে তাই আছে—

আপ্যায়য়ন্তি যে পূর্ব্বং সোমং যোগবলেন বৈ ...র ...
তস্মাৎ শ্রাদ্ধানি দেয়ানি যোগিণান্ত বিশেষতঃ ।পরের ...

ইঁহারাই (পিতৃগণই) কেবল পূর্ব্বে যোগবল দ্বারা সো... বেদে... আপ্যায়িত করিতেন এই হেতু বিশেষ যোগীদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ দ্রব্যসম্‌সমাজ্ঞেদেয়।"

পিতৃগণের যোগবল সম্বন্ধে অন্যত্র শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—...ষ্য ...

**পিতৃণাং হি বল যোগো যোগাৎ সোমঃ প্রবর্ত্ত...তে ...ত ...**

"পিতৃগণের যোগই বল এবং যোগের দ্বারা সোম প্র... অথবা হয় অর্থাৎ শরীর, মন ও আত্মায় রসের সঞ্চার হয়। পিতৃগণের হৃদয় ...তেছে কি প্রীতি ও মহত্বপূর্ণ ছিল এবং বিজ্ঞানের বলে যে তাঁহারা কতদূর শ্রদ্ধা ...কর্ষণ করিয়া

...ষ শ্রদ্ধা

...শিখরে

* দাক্ষিণ্যগুণ পিতৃভাবের একটী প্রধান লক্ষণ বলিয়াই সব... ...র পিতৃশ্রাদ্ধে "দক্ষিণাদান" একটী প্রধান কর্ম্মরূপে পরিগণিত।

...না কি...

† হরিবংশ অষ্টাদশ অধ্যায়।

‡ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

...ও ১১শ সংখ্যা।



ছিলেন তাহা মহাভারতের নিম্নলিখিত সনৎকুমারের বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে।

পিতৃন্ প্রীণাতি যো ভক্ত্যা পিতরঃ প্রীণয়ন্তি তং
যচ্ছন্তি পিতরঃ পুষ্টিং প্রজাশ্চ বিপুলাস্তথা
স্বর্গমারোগ্যমেবাথ যদন্যদপি চেপ্সিতং
দেবকার্য্যাদপি মুনে পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে।
দেবতানাং হি পিতরঃ পূর্ব্বমাপ্যায়নং স্মৃতং ॥
শীঘ্রপ্রসাদা হ্যক্রোধা লোকস্যাপ্যায়নং পরং।
স্থির প্রসাদাশ্চ সদা তান্নমস্যস্ব ভার্গব ॥ *

সনৎকুমার পিতৃভক্ত ভৃগুনন্দন **মার্কণ্ডেয়কে বলিতেছেন** "যিনি ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃগণের প্রীতিবিধান করেন, পিতৃগণ তাঁহাকে প্রীতিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং পুষ্টি বিপুল প্রজা, স্বর্গ, আরোগ্য ও অন্য যাহা অভিলষিত থাকে, তৎসমুদয় প্রদান করেন। হে মুনে! দেবকার্য্য অপেক্ষা পিতৃকার্য্য উৎকৃষ্ট। দেবগণের পূর্ব্বে পিতৃগণের পরিতৃপ্তিবিধান স্মৃত আছে। পিতৃগণ শীঘ্র প্রসন্ন হন এবং তাঁহাদিগের ক্রোধ নাই, তাঁহারা লোকের পরম তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকেন। ভৃগুবংশ-প্রভব মার্কণ্ডেয়! পিতৃগণের প্রসন্নতা সতত স্থিরতর থাকে, তুমি তাঁহাদিগকে নমস্কার কর।" আয়ুর্ব্বেদপারদর্শী রসায়ণ শাস্ত্রবিৎ পিতৃগণ চিকিৎসা ও ঔষধাদির দ্বারা লোকের আরোগ্য, পুষ্টি ও সুখ স্বচ্ছন্দাদি প্রদান করিতেন, সেই কারণেই পিতৃগণ তৃপ্ত হইলে 'আরোগ্য, পুষ্টি ও পুত্রাদি দান করেন' ইহা বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। ইহার পরে পিতৃগণের বিজ্ঞানচক্ষুরও কথা সনৎকুমার বলিতেছেন "হে মার্কণ্ডেয় আমি তোমাকে যে বিজ্ঞান চক্ষু প্রদান করিতেছি ইহা পিতৃগণের পরমাগতি। * * এই বিজ্ঞান চক্ষু দেবগণের দুর্লভ।" বস্তুতঃ বিজ্ঞানেই পিতৃগণের বিশেষত্ব। একদিকে যোগবলের দ্বারা যেমন পিতৃগণ অধ্যাত্মবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন সেইরূপ অগ্নির সাহায্যে জড়বিজ্ঞানেও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

যখন বিষ্ণুপদ অনুসরণ করিয়া ঋষিরা উত্তরদিকের দেবধাম হইতে প্রথম

* হরিবংশ অষ্টাদশ অধ্যায়।

হিমালয়ের পাদদেশ ভারতের ব্রহ্মাবর্ত্তে আসিয়া উপনীত হইলেন তখন অরণ্যসঙ্কুল ভারতবর্ষ লোকবাসের উপযোগী ছিল না। এই নবোপনিবেশকারী ঋষিদিগের নিকট ভারত স্বদেশরূপে ঠিক বিবেচিত হইবার কথা নয়। কিন্তু ক্রমে সেই ঋষি বংশধরেরা দক্ষিণে আর্য্যাবর্ত্তের অভিমুখে অগ্রসর হইলে তখন হিমালয়ের উত্তর দেশের কথা লোকের স্মৃতির বিষয়ীভূত হইল এবং ভারতই ক্রমে পিতৃগৃহরূপে পরিগণিত হইতে চলিল। এইরূপে ঋষিরা আরো দক্ষিণে অগ্রসর হইতে থাকিলে ভারতের চারিদিকে জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু যেমন পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় আসিয়া দেখা দেয় পূর্ণচন্দ্রের পরে যেমন কৃষ্ণপক্ষ আসিয়া থাকে সেইরূপ ভারতের মর্ত্ত্যভূমি একদিকে যেমন লোকালয়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল সেইরূপ আরেকদিকে সেখানে লোকক্ষয়েরও সূচনা আরম্ভ হইল। ভয়াবহ রোগ, ব্যাধি ও মারীমরক ঘোররূপ ধারণপূর্ব্বক নিত্য লোক গ্রাস করিয়া ভারতকে শ্মশানে পরিণত করিবার উয্যোগ করিল। এইরূপ যখন মৃত্যুর ঘোর অন্ধকার মর্ত্ত্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল সেই সময় পিতৃভাবের শুভ চন্দ্রোদয়ে ভারতের অন্ধকার গগন সৌম্য হেম-জ্যোতিতে আপ্লাবিত হইল। মধ্যাহ্নে যেমন দিবালোকের প্রখর কিরণে চতুর্দ্দিক আলোকিত হয় সেইরূপ ঋষিযুগে দেবালোকের প্রখর কিরণ মণ্ডলে অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণের গুণকীর্ত্তনকারী ঋকমণ্ডলে চারিদিক আলোকিত হইয়াছিল। আবার দিবাবসানে যেমন চন্দ্রের উদয় হয় ও গৃহে গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় সেইরূপ ঋষিযুগের অবসানে দেবালোকের শেষ কিরণ রেখা অস্তমিত হইলে সোমাত্মক পিতৃগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগেরই যত্নে অগ্নিমাহাত্ম্য জগতে প্রচারিত হইয়াছিল।

বস্তুতঃ চন্দ্রের সহিত সোমাত্মক পিতৃগণের যেন একটা মূলগত সম্বন্ধ বিদ্যমান। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

পিতৃণাং হি বলং যোগো যোগাৎ সোমঃ প্রবর্ত্ততে।

"পিতৃগণের যোগই বল এবং যোগের দ্বারা সোম প্রবর্ত্তিত হয়।"

গীতাকারও তাই বলিয়াছেন—

তত্র চান্দ্রমসংজ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।



"দক্ষিণায়ন প্রভৃতি পিতৃমার্গে গমনশীল যোগী চান্দ্রমস জ্যোতাঁহারা হইয়া সংসারে আগমন করেন।"

যোগ কি ?

যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ। (পাতঞ্জল)

"চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ।" এই যোগবলের দ্বারা সোমরস পানপূর্ব্বক পিতৃগণ সোমময় হইয়া বিরাজ করিতেন। * ঋষিদিগের ধ্যান ধারণা ও তপশ্চরণ ঘনীভূত হইয়া পিতৃগণে যোগে পরিণত হইয়াছিল। যোগে ও বিজ্ঞানে বস্তুতঃ পিতৃগণ্ সিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু যোগের কারণে ব্রহ্মনিষ্ঠ পিতৃগণ সংসারের পুণ্য ইষ্টকর্ম্ম হইতে বিরত ছিলেন না। স্বদেশকে স্বগৃহের চক্ষে দেখিয়া পিতৃভাবের উচ্চ আসনে বসিয়া সতত তাহার পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

শাস্ত্রকারগণ যোগবলসম্পন্ন সোমাত্মক পিতৃগণের "চান্দ্রমস জ্যোতি"র কথা কেন বলিয়াছেন ? ওষধিপতি হিমাংশু চন্দ্রের সহিত পোষণধর্ম্মী প্রসন্নস্বভাব পিতৃগণের সকল বিষয়েই এরূপ সাদৃশ্য ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান যে তাঁহারা অনেক স্থলে চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতৃদেবরূপে কল্পিত না হইয়া যাইতে পারেন নাই। রসের আধার চন্দ্র যেমন রসসঞ্চার দ্বারা ওষধির পরিপোষক হিসাবে ওষধিপতি, রাসায়নিক পিতৃগণও সেইরূপ ওষধিতত্ত্বজ্ঞ হিসাবে ওষধিপতি নামের অধিকারী। চিকিৎসায় ও লোকপালনে ওষধিই প্রধান অবলম্বন, এই কারণেই পিতৃগণ বিশেষভাবে ওষধিবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানবিৎ পিতৃগণ ওষধিসমূহের গুণাগুণ ও বিনিয়োগ বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। এই কারণে তাঁহারা ভারতের ওষধি সমূহকে আহার ও যজ্ঞকার্য্যে এবং ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লোকপালনের জন্য যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম্ম তাঁহাদিগের ইষ্টকর্ম্ম ছিল। ঋগ্বেদে তাই ওষধিপতি পিতৃলোকদিগকে "যজ্ঞিয়" নামে বিশেষিত করা হইয়াছে ;—

---

* এস্থলেও দেব ও পিতৃভাবের বৈপরীত্য পাঠক বিশেষরূপ লক্ষ্য করিবেন। প্রকৃতির শিশু দেবগণের চিত্তবৃত্তি শিশুর মত উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত কঠোর উপায়ে চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা সংহত যোগবল অর্জনই পিতৃগণের লক্ষ্য ছিল।

হিমালয়ে তেষাং বরং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি
অব- ভদ্রে সৌমনসে স্যাম। *

"সেই যজ্ঞিয় পিতৃগণ যেন আমাদিগের শুভানুষ্ঠান করেন যেন আমরা তাঁহাদিগের প্রসন্নতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।" যে ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান দেখিয়া এখনও জগৎ স্তম্ভিত তাহার উন্নতির মূলে পিতৃগণ।

এই পিতৃগণ সচরাচর কবি নামে অভিহিত হইতেন। কবি'র অর্থ ক্রান্তদর্শী পরমজ্ঞানী। ভৃগুনন্দন অসুর গুরু শুক্র এই কারণে কবি নামে অভিহিত হইতেন।

কবীনামুশনা কবিঃ
(ভগবদ্গীতা)

বেদেও আছে

সা ত্বা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা বহন্তেনারাজন্ হবিষামাদয়স্ব॥ †

"তোমার উদ্দেশে কবিদিগের মুখোচ্চারিত মন্ত্র সকল চলিতে থাকুক।" মহাভারতেও আছে—

উৎপন্না যে স্বধায়াস্তু সোমপা বৈ কবেস্তু যে।

"ওষধিতত্ত্বজ্ঞ কবিকন্যা স্বধাতে যে সমস্ত সোমপ পিতৃগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।" আজকাল ঔষধ্‌দাতা চিকিৎসক বৈদ্যদিগকে সচরাচর যে লোকে কবিরাজ বলিয়া থাকে সেই কবিরাজ নাম আয়ুর্ব্বেদের জন্মদাতা ক্রান্তদর্শী ওষধিপতি (অর্থাৎ ওষধিতত্ত্বজ্ঞ) পিতৃগণের কবি নাম হইতে আসিয়াছে।

পালনধর্ম্মী পিতৃগণ লোক পালনব্রত অবলম্বন করিয়া কি গৃহ কি শ্মশান সর্ব্বত্রই পর্য্যটন করিতেন। কখনো প্রজাপালনের জন্য লোকালয়ে থাকিতেন কখনো বা সাধনার বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য শ্মশান বা শ্মশান তুল্য বিজন প্রদেশে বাস করিতেন। এই কারণে লোকে তাঁহাদিগকে গৃহীর চক্ষেও দেখিত আবার শ্মশানবাসী প্রেতচক্ষেও দেখিত। কি লোকালয় কি লোকশূন্য শ্মশানপ্রদেশ সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র ছিল।—এই

* ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল ১৫ সূক্ত।
† ৯ ঋগ্বেদ; ১০ম মণ্ডল ১৫ সূক্ত।



জন্যই কি গৃহ কি শ্মশানবৎ মহাবিজন প্রদেশ পিতৃগণের বিহারভূমি। তাঁহারা জনহীন শ্মশান প্রদেশ হইতেও লোকের যে মহোপকারী উপকরণ সমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে মানবসমাজ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। সমগ্র জগতে তাঁহাদিগের পুণ্যকীর্ত্তি বিঘোষিত দেখিতেছি। হিমালয়স্থ দেবধামের স্বাস্থ্যের তুলনায় এই ভারতভূমি মর্ত্তধাম বা মৃত্যুপরিবেষ্টিত শশ্মান সদৃশ ছিল। বিশেষ আর্য্যবর্ত্তের দক্ষিণাংশ এই বঙ্গভূমি জনশূন্যতা ও অস্বাস্থ্য প্রভৃতির কারণে প্রেতভূমি অর্থাৎ শ্মশানভুমি বা চৈত্যভূমি নামে চিরপ্রসিদ্ধ। শ্মশানতুল্য হইলেও এই দক্ষিণদিকবর্ত্তী বঙ্গদেশ অনন্ত ওষধির আকর বলিয়া দক্ষিণ-প্রাণ পিতৃগণের প্রধান বাসভূমিতে অর্থাৎ এক কথায় প্রকৃত পিতৃভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। তাই আজও বিহার বা উত্তর বঙ্গের গয়াধাম পিতৃবিহার বা প্রধান পিতৃতীর্থরূপে পরিগণিত দেখিতে পাই। * দেবগণ স্বাস্থ্যকর অমরধামে বাস করিয়া প্রকৃতির কল্যাণে অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু পিতৃগণ মৃত্যুবেষ্টিত মর্ত্তধামে থাকিয়াও যোগ ও বিজ্ঞানবলে মৃত্যুকে জয় করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সুধাকর চন্দ্র যেমন শ্মশান বা মৃতগ্রহ হইয়াও সুধাবর্ষণে জগৎকে তৃপ্ত করে সেইরূপ পিতৃগণ মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া—শ্মশানচারী হইয়াও সাধনা ও বিজ্ঞানের বলে অমৃত লাভপূর্ব্বক সেই অমৃত বর্ষণে সমগ্র জগৎবাসীকে তৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা একদিকে অন্ন ও মৃত সঞ্জীবন ঔষধাদি দ্বারা এবং অন্যদিকে মৃত সঞ্জীবন যোগ বলের দ্বারা লোকের প্রাণদান করিয়া সকলের শ্রদ্ধার পাত্ররূপে পিতার উচ্চ আসন লাভ করিয়া গিয়াছেন।

আমরা দেখিলাম উন্নতি বা সভ্যতার তিনকালে তিনভাব বা তিন অবস্থা আসিয়া মানব সমাজকে ক্রমান্বয়ে তিন প্রকৃতির গঠিত করিয়া তুলে। প্রথম দেবপ্রকৃতি, দ্বিতীয় ঋষিপ্রকৃতি, তৃতীয় পিতৃপ্রকৃতি। দেবপ্রকৃতির মানবেরা ইন্দ্রাদি দেবগণ, ঋষিপ্রকৃতির মানবেরা ঋষিগণ এবং পিতৃপ্রকৃতির মানবেরা পিতৃগণ। আশ্চর্য্য এই যে কেবল ঋষিপ্রকৃতির স্তরটী এপর্য্যন্ত ইতিহাসে স্থান পাইয়া আসিতেছে, এবং দেব ও পিতৃপ্রকৃতির স্তরদ্বয় পৃথিবীর ইতিহাস হইতে বিতাড়িত হইয়া দূর শূন্যে দেব ও পিতৃরাজ্যে চিরনির্ব্বাসিত হইয়াছে।

* এ বিষয়ে পরে পিতৃস্থান প্রবন্ধে বিশেষরূপ আলোচিত হইবে।

দেব ও পিতৃগণের ইতিহাস একেবারে তমসাচ্ছন্ন। অধিকাংশ লোকের ধারণা দেব ও পিতৃগণ কেবল একটা ঋষিদিগের কল্পনাপ্রসূত আধ্যাত্মিক জীব বা আধ্যাত্মিক ভাব বিশেষ। কিন্তু ইহা প্রকৃত সত্য নহে। ভারতের ও জগতের ইতিহাসে দেব ও পিতৃগণের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে। ভক্তদিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ স্তবস্তুতিতে দেব ও পিতৃগণ আধ্যাত্মিকতার অমররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন মাত্র, নহিলে তাঁহারাও আমাদিগের ন্যায় এককালে মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধনে রত ছিলেন। ভক্তির পাত্রকে অতিরিক্ত বড় করিয়া দেখা ভক্তের স্বভাব কিন্তু তাই বলিয়া মহাপুরুষদিগেকে মানবইতিহাস হইতে চিরবিদায় দিয়া একেবারে সুদূর অধ্যাত্মলোকে প্রেরণ করাও সঙ্গত নহে। দেবগণ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলে ঋষিরা তাঁহাদিগের মানবত্বকে প্রসারিত করিয়া প্রকৃতির বিশাল শক্তির সহিত তুলনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহারা অমর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন বটে কিন্তু ক্রমে ইহা জনসাধারণে ভূলিতে লাগিল যে তাঁহারা এককালে মর্ত্ত্য শরীরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যের নামে যদি আধ্যাত্মিকতা আরোপ করিয়া চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বলা যায় তাহা হইলে চৈতন্যদেবের মানবত্ব সপ্রমাণ করা ভবিষ্যতে ইতিহাসের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। ঋষিদিগের দেবস্তুতিতেও অনেকস্থল সেই একই প্রকার গোলোযোগ ঘটিয়াছে। যেমন "যজ্ঞ ও অগ্নি" প্রবন্ধে স্পষ্টই দেখাইয়াছি যে, অগ্ন্যুপাধিধারী তেজোমূর্ত্তি উন্নতহৃদয় মনুষ্যগণের সহিত জড় অগ্নির উপমা বা সাদৃশ্য কবিত্ব সহকারে এমনি ঘনীভূত হইয়াছে যে মনুষ্য অগ্নির কথা না বুঝিয়া সহজেই ভ্রম হয় যে ইহা জড় অগ্নির কথা বলা হইতেছে। বেদোক্ত মানবদেহধারী অগ্নিরা বহুদিন লোকান্তরিত হইয়াছেন তাই তাঁহাদিগের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া অজ্ঞানী লোকেরা তৎপরিবর্ত্তে প্রত্যক্ষ জড় অগ্নিকে ধ্যানের বস্তু করিয়া সহজে নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহে। শুদ্ধ অগ্নি নহে, ইন্দ্র মরুৎ প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণেরও অস্তিত্ব, ইতিহাস হইতে ঐ কারণে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। যে গোলোযোগ দেবতার সম্বন্ধে দেখাইলাম সেইরূপ গোলোযোগ পিতৃগণ সম্বন্ধেও না ঘটিয়া যায় নাই। পিতা বলিতে যেমন একাধারে গৃহের পুত্রাদির জনক বুঝায় সেইরূপ পিতৃভাবাপন্ন



ঋষিদিগকেও বুঝায়। এইখানেই বিপদ ঘটিয়াছে। লোকে সমস্যায় পড়িয়া পিতৃভাবাপন্ন ঋষিদিগের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কেবল মাত্র গৃহের লোকান্তরিত পিতৃপুরুষদিগের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের আরোপ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। এইরূপে আধ্যাত্মিকতা, কবিত্ব ও উপমা প্রভৃতির মর্ম্মবোধে অক্ষমতাই ভারতের ইতিহাসের কতকাংশে দুরবস্থা আনয়ন করিয়াছে। * কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভারতের কবিত্বের মজ্জায় মজ্জায় অন্তঃসলিল স্বচ্ছ ইতিহাসের স্রোত বহমান।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# নস্যদানী। †

(গল্প)

লণ্ডন! লণ্ডন! এই কথা একটি বালিকা অতিশয় যন্ত্রণা ব্যঞ্জক স্বরে বলিল। একেলা একটি সামান্য অট্টালিকার উন্মুক্ত বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, মলিন বদনে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয়া এই কথা বলিল। মণিকা ফেয়ার (Monica Fair) তার অতীত জীবনের ঘটনা যেন মানস পটে পুনরায় চিত্রিত করিতেছিল। সেই একদিন যবে সে ও নেল্ (Nell) লণ্ডনে আসিয়াছিল। সেই জনতাপূর্ণ প্রসিদ্ধ হোটেলে পিতার সহিত আনন্দে কেমন দিন কাটিয়াছিল, সে সকল এখন স্বপ্ন মনে হইতেছে। যেদিন সে পিতার সহিত প্রসিদ্ধ সমাধি স্থানে (Abbey) গিয়াছিল, সেদিন যেন তাহার জীবনের

---

* আধ্যাত্মিকতা ও কবিত্ব প্রভৃতির কারণে ইতিহাসের বরঞ্চ কতকটা উপকার ও যে না হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহার দ্বারা ভারতের ইতিহাস অনেকাংশে বাঁচিয়া আছে বলিতে হইবে। ইতিহাস তাৎকালিক, আধ্যাত্মিকতা সর্ব্বকালিক। ইতিহাস ক্ষণভঙ্গুর শরীর ও আধ্যাত্মিকতা অবিনশ্বর আত্মা। ইন্দ্রাদি দেবগণ যদি ঋষিদিগের কর্ত্তৃক আধ্যাত্মিকতা ও কবিত্বের প্রভাবে অমররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত না হইতেন তাহা হইলে দেবগণের সেই প্রাণহীন নীরস ইতিহাস আত্মাবর্জিত মৃতদেহের ন্যায় সম্ভবতঃ লোকের নিকট এত যত্নের

† ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

চির আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূর্ণ হইয়াছিল। এবং সে চিরস্মরণীয় ডিক্‌সন (Dickson) ব্রাউনিং (Browning) এবং জন্‌সনের (Rare Ben Jhonson) সমাধি দেখিয়া কত না আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়, সে সুখ মুহূর্ত্তেই বিদ্যুতের মত মিলাইয়া গেল। লণ্ডনের সে সুখময় স্মৃতি হৃদয় হইতে মিলাইতে না মিলাইতে, তাহার পিতা তাহাকে সেই অকূল সংসার সমুদ্রে ভাসাইয়া, জীবনের অপর কূলে চলিয়া গেলেন। তাই এই বিশাল সংসার সমুদ্রে, সুখালোক হারাইয়া, বিষাদের ছায়া বুকে লইয়া সে ভাবিতেছে, "অতীত জীবন কি সত্যই স্বপ্ন?" সহসা সুখৈশ্বর্য্য হারাইয়া, দরিদ্রতার ভীষণ-অঙ্কে পড়িয়াই সে আপন অবস্থা বিশেষরূপে বুঝিয়া লইল। যখন ঐশ্বর্য্য, সুখ, চলিয়া যায়, অভাব আসিয়া সে স্থান পুর্ণ করে, তখনি আমরা তাহার মূল্য হৃদয়ের শিরায় শিরায় অনুভব করি। তাই মণিকা অর্থহীন, বন্ধুহীন হইয়াও, সাহসে হৃদয় পূর্ণ করিয়া, পুনরায় জীবিকান্বেষণে সেই লণ্ডনে আসিল। লোকে তাহার পিতার নিন্দা করিয়া শত কথা কহিল, আরো বলিল "পিতার অপব্যয়ে, বুদ্ধিহীনতায় মাতৃহীন বালিকাদিগের এই দুর্দ্দশা হইল। মণিকা নীরবে সকলি সহিতে শিখিয়াছে, সে ভগ্নিকে বলিল "নেল্ যদিও লোকে পিতাকে দোষ দেয়, আমি তাহা শুনিতে পারি না, আমার সহ্য হয় না। এখানে সকলেই আমাদিগের পরিচিত, মলিন বসন ও অনশনে দেখিলে দয়া করা দূরে থাক, পিতাকেই দোষ দিবে। চল আমরা দুই বোনে বিদেশে যাই। লণ্ডন বিস্তীর্ণ স্থান, আমাদের সকলি অপরিচিত। কেহ আর আমাদের জন্মকথা বা যথার্থ পরিচয় জানিবে না। সেই অপরিচিত স্থানে চল নির্জ্জনে দুই বোনে লুকাইয়া থাকিব।"

তাই তাহারা লণ্ডনে আসিল। সে আসিয়াই কোন এক পরিচিত লোকের

---

সামগ্রী হইয়া থাকিত না। তাহা হইলে জগত হইতে বেদলোপের সম্ভাবনা ছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ আজ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে কি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ রাখিবার জন্য বড় একটা কাহারও মাথাব্যথা হইত না।—আবর্জ্জনা রাশির ন্যায় সে সকল দূরে নিক্ষিপ্ত হইত। কিন্তু দেবগণ আধ্যাত্মিকতায় ও কবিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধ্যানে পূজার সামগ্রী হইয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। এই কারণেই হিন্দুজাতির ইতিহাস বহু প্রাচীন হইলেও অন্যান্য জাতির ন্যায় একেবারে লোপ পাইতে পারে নাই।



দ্বারা লেডি মার্টিনডেলের (Lady Martindale) নিকট কাজ পাইল। লেডি মার্টিনডেল সে সময় সভ্য স্ত্রী সমাজে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার কমিটি ও বোর্ডে অনেক স্ত্রীলোক কাজ করিত। তাঁহার সংবাদ পত্রের জন্য অনেক স্ত্রীলোক টাইপ রাইটার (Typewriter) ছিল। লণ্ডনে কোন সভ্য স্ত্রী সমাজে লেডি মার্টিনডেল সেক্রেটারী ছিলেন। এবং তাঁহার সপত্নী পুত্র ট্রেন্স মার্টিনডেল (Trence Martindale) লণ্ডনের উন্নতীশীল সভ্যের অগ্রগণ্য ছিলেন ও পার্লিমেণ্টের একজন প্রসিদ্ধ সভ্য ছিলেন।

সে বহুদিনের কথা নয়, যবে এক গার্ডন পার্টিতে মণিকা ট্রেন্স মার্টিনডেলকে দেখিয়াছিল। সেই প্রথম দর্শনেই তাহার বালিকা হৃদয়ের ঘুমন্ত প্রেমের অঙ্কুর উন্মেষিত হইয়াছিল। জীবনে যেন তাহা সুখময় স্বপ্নের মত জাগিয়া ছিল। ট্রেন্স মার্টিনডেলের মুখের ছবি যখন তখন তাহার হৃদয়ে আসিয়া দেখা দিত। বালিকা হৃদয়ের প্রথম প্রণয় প্রভাত গগনে অরুণ রাগের মত তাহার হৃদয়াকাশ রঞ্জিত করিয়া আলোকিত করিয়াছিল। আজ সে সেই ট্রেন্সের বিমাতার নিকট দাসীত্বে আবদ্ধ হইল। তাহার হৃদয় যন্ত্রণায় ছিন্ন হইতেছিল। কিন্তু সে কার্য্যে প্রবেশ করিবার পর কখনো তাঁহাকে দেখে নাই, বা দেখিবার আশা করে নাই। এখন সে যেন ট্রেন্স হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। দরিদ্রতার কঠোর আঘাতে সে সকলি বুঝিতে পারিয়াছে। তাহাদের উভয়ের মাঝখানে এখন যে কি ব্যবধান তাহা আর তাহার বুঝিতে বাকি নাই।

মণিকা লেডি মার্টিনডেলের পত্রের উত্তর লিখিয়া দেয়, শিরোনামা লেখে। সপ্তাহে এক পাউণ্ড বেতন লইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়। আহা তাহারা দুটি বোনে যদি কর্ম্ম করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার জীবনে আর এ কষ্ট হইত না। দুর্ভাগ্যবশত লণ্ডনে আসিয়াই নেল পীড়িত হয়, সেই অবধি প্রায় সে শয্যাগত হইয়াছে। সে আর কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। সেই সামান্য ঘরে, চিমনীর পাশে শুইয়া, দরিদ্র বালকের চীৎকার শুনিয়া, ক্রেতা বিক্রেতার কোলাহলে অস্থির হইয়া, দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোকের মুখ দেখিয়া, তাহার সেই দীর্ঘ দিবস কাটিতেছে। জীবনের এই ঘোরতর পরীক্ষায় উভয়ের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাই আজ মণিকা হতাশ ভাবে বলিতেছে "এই সেই

লণ্ডন! এইখানে সুখের চিত্র কল্পনার স্বপ্ন?" হায় নেল ও মণিকা দুঃখের দারুণ আঘাতে সুখের ছবি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে।

২

"নেল তুমি কিছু খাইতেছ না কেন? কাল তোমার জন্য যে খাদ্য দ্রব্য সকল আনিলাম দেরাজে অমনি পড়িয়া আছে। তোমার জন্য এত যত্নে আনিলাম, তবু খাইলে না?"

"মণিকা আমি জানি ভাই, যে কত কষ্টে ওই টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছ, কিন্তু আর আমি পারি না, আর ওই সব খাইতে পারিব না।"

"এ সব আর কি করিরা খাইতে সাধ যাইবে বোন। সেই যখন আমাদের পিতার ভবনে মিসেস উলি যত্ন করিয়া সব আহারীয় দ্রব্য রন্ধন করিয়া আনিতেন, তাহাতেই আমাদের মন উঠিত না সে সবের কাছে কি এই আহার? আমারও গাড়ী ভাড়া দিতে প্রত্যহ ছয় পেন্স চলিয়া যায়। তোমার জন্য কিছুই আনিতে পারি না। বোধ হয় নেল তুমি একটু চিকেন রোষ্ট বা প্যান কেক্ পেলে খাও। তোমার কি ক্রিম দিয়ে ষ্ট্রবেরি খাইতে ইচ্ছা হয়?"

নেল্ মৃদু হাসিল। কিন্তু তাহার চক্ষু দুটি অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মণিকার কথায় তাহার অতীতের সুখময় জীবন, মানসপটে জীবন্ত ভাবে জাগিয়া উঠিল। সেই আহারের ঘরে, পরিষ্কার শুভ্রবস্ত্র বিস্তৃত টেবিল। সুরঞ্জিত ফুলদানীতে সুরভিত ফুল, রৌপ্যপাত্রে নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য দ্রব্য। তখনত আর তাহাদের আহারের জন্য এত ভাবিতে হইত না। সকল কর্ম্মই এখন মনে হয় যেন ঐন্দ্রজালের দ্বারা হইত। তখন কে জানিত যে পরে এইরূপ দিন আসিবে। তাই এত দুঃখেও মণিকার কথায় সে মৃদু হাসিল। এমন সময় সহসা দূরে ঘণ্টাধ্বনি হইল, মণিকার কর্ম্মস্থানে যাইবার সময় হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া সযত্নে মণিকার ক্লোক্‌খানি আনিয়া দিল। তাহাদের সুখের স্বপ্ন মেঘের মত বায়ুস্তরে মিশাইয়া গেল।

মণিকা গাড়ী হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে কর্ম্মস্থানে চলিল। চরণ যেন আর অগ্রসর হয় না। সে চিন্তা করিতে চলিল "ওই জঘন্য স্থানে থাকিয়া নেল বুঝি আর বাঁচিবে না। সে ত কিছুই খাইতে পারে না। আহা যদি



আবার তাহাকে উন্মুক্ত সুন্দর গৃহে রাখিতে পারিতাম, আবার পূর্ব্বের মত আহার্য্য দ্রব্য দিতাম, তাহা হইলে হয়ত সে বাঁচিত। আজ লেডি মার্টিন ডেলের নিকট আমাদের অনেক কর্ম্ম আছে। আমাদের আজ সারাদিন থাকিতে হইবে। আজ আমাদের দ্বিপ্রহরের আহার (Lunch) লেডি মার্টিন ডেল পাঠাইবেন। ওঃ স্থির হইয়াছে আমি আমার আহার্য্য দ্রব্য হইতে কিছু তুলিয়া আনিব। ইহা কি চুরি? না তাহা কখনো হইতে পারে না। আমাকে খাইতে দিবে, আমি আমার অংশ না খাইয়া লুকাইয়া আনিব, ইহা কখন চুরি হইতে পারে না"।

হায় মণিকার যখন আহার আসিল, তখন সারা দিবসের পরিশ্রমে সে নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিল। যখন আহার আসিল অন্য রমণীরা একটি টেবিলে সকলে মিলিয়া আহারে বসিবার উদ্যোগ করিল। মণিকা তাহাদিগের সহিত আহার করিল না। সঙ্গীরা মুখ ফিরাইয়া হাসিল। আহারের জন্য লেডি মার্টিন ডেলের বিশেষরূপে বলা ছিল। সেইজন্য নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর সুন্দর আহার্য্য দ্রব্য তিনি সেই ম্লান দরিদ্রক্লিষ্ট রমণীদিগের জন্য পাঠাইয়া ছিলেন।

মণিকা আপন অংশের দ্রব্য লইয়া অন্য টেবিলে চলিয়া গেল। অন্য সঙ্গীরা সকলে একত্রে হাসিয়া গল্প করিয়া আহার করিতে লাগিল। একজন মৃদু স্বরে বলিল "উনি যেন একজন লেডি সেইজন্য আমাদের সহিত খাইতে পারিলেন না" মণিকা সেই অবসরে তাড়াতাড়ি রোষ্টটুকু, স্যাণ্ডউইচ খানি লইয়া আপনার নিজের ড্রেসের পকেটে লুকাইয়া রাখিল। তাহার লজ্জায়, ঘৃণায়, মলিন মুখ রক্তিমবর্ণ হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্যালেড টুকু খাইতে লাগিল।

এমন সময় সহসা দ্বার খুলিয়া লেডি মার্টিনডেল সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিয়া, সকলকে প্রাতঃকুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নিকটস্থ আসনে বসিয়া পড়িলেন। সকলের পরিতৃপ্তির সহিত আহার হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে তাহাদিগকে হস্তস্থিত একটি ক্ষুদ্র বাক্স দেখাইলেন। বাক্সটি একখণ্ড রূপালি কাগজে মোড়া ছিল। লেডি মার্টিনডেল যখনি কোন মহামূল্য সুন্দর দ্রব্য কিনিয়া আনিতেন, অভ্যাসবশত সর্ব্বদাই তাঁহার এই স্ত্রী কর্ম্মচারীদের দেখাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।

তিনি বলিলেন "আজ লেপিরিয়ের ( Leparie ) দোকানে গিয়া এই সুবর্ণ নস্যদানী ( Sunff Box ) কিনিয়া আনিয়াছি। ইহা ডিউক অফ ওয়েলিংটনের ছিল। কেমন খুব সুন্দর নয়? দেখ একে একে সকলে হাতে লইয়া দেখ।"

সকল রমণীরাই ঝুঁকিয়া পড়িল। মণিকাও দেখিতে আসিল। একে লইয়া অপরের হস্তে দিল। সহসা সে নস্যদানী আর পাওয়া গেল না। এক-জন বলিল 'এইমাত্র টেবিলের উপর রাখিলাম'। লেডি মার্টিনডেল গৃহের একপার্শ্বে কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। সহসা সেই কোলাহল শুনিয়া, সেই স্থানে আসিয়া, বিস্মিত হইয়া চাহিলেন। রমণীরা প্রত্যেকে তন্ন তন্ন করিয়া সারা গৃহ অন্বেষণ করিল, কোন খানে সে নস্যদানী মিলিল না।

মণিকাও সকলের সহিত মিলিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন লেডি মার্টিনডেল সরোষে, সন্দেহযুক্ত নয়নে, তাহার প্রতি চাহিয়া আছেন। তাহার ম্লান মুখ সহসা রক্তিমবর্ণ হইল। তাহার মনে হইল অন্য রমণীরাও তাহার প্রতি কিরূপ ভাবে চাহিয়া আছে। এমন সময় একজন রমণী বলিল,

"লেডি আপনি যদি ইচ্ছা করেনত, আমাদের পরিধেয় বস্ত্র ও পকেট দেখিতে পারেন। আমরা নস্যদানী লই নাই।"

এই কথা শুনিয়া মণিকার আনন শুভ্র হইয়া গেল। যেন সহসা তাহার দেহের শোণিত প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল।

আর একজন বলিল "লেডি আপনি অনুমতি করেনত আমরা আপন **আপন পকেট আপনিই দেখাইয়া দি। আমাদের নিকট যাহা যাহা আছে সমস্ত দেখিয়া লউন।"**

মণিকা মনে মনে ভাবিল **"পকেট দেখাইব তাহা হইলে** সকলের কৌতূ-হল পূর্ণ নয়নের দৃষ্টি আমার এই সামান্য খাদ্য দ্রব্যে পড়িবে। না আমি কখনও তাহা পারিব না। আমি দেখাইব না" সে ক্ষুদ্র কণ্ঠে, বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া কহিল,

"আমি নস্যদানী লই নাই, আমি পকেট দেখাইব না।"

এই কথা শুনিবামাত্র সকলেই তাহার প্রতি সন্দেহ পূর্ণ নয়নে চাহিল।



লেডি মার্টিনডেলের চক্ষু রোষে বিস্ময়ে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দৃঢ় অবিশ্বাস-পূর্ণ স্বরে বলিলেন

"আমি তোমাদের কাহাকেও পকেট দেখাইতে বলি নাই। কিন্তু তোমার একি কথা মিস ফেয়ার? তোমার দেখাইতে বা বাধা কি?"

অন্য রমণীরা মুখ ফিরাইয়া, ঘৃণার সহিত কহিল "ছি! এ কি রকম কথা।"

**মণিকা সকলি শুনিল, তাহার হৃদয় স্তব্ধ হইয়া গেল।** এই তাহার ট্রেন্সের গৃহে সে **আজ চোর অপবাদ লইয়া** দাঁড়াইয়া আছে। সে কি করিবে? না তবু সে পকেট দেখাইতে পারিবে না। সে লেডি মার্টিন ডেলকে বলিল "আমি নস্যদানী লই নাই, আপনি আমায় বৃথা সন্দেহ করিতে-ছেন। পরে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে আমি নির্দ্দোষী, এবং আমি আপ-নাকে সত্য কথাই বলিতেছি। আমি দুঃখের সহিত এই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছি আপনার বোধ হয় ইহাতে কোনও আপত্তি নাই?"

লেডি মার্টিনডেল বলিলেন,

"তাহাই হউক। আমারো তাহাই ইচ্ছা। কিন্তু তোমার এই ব্যবহারে কাহার না সন্দেহ হইবে?"

মণিকা তাহার বনেট, দস্তানা, ক্লোক তুলিয়া লইল। তাহার বিবর্ণ মুখ, অধীর চাহনি দেখিয়া সকলেই স্থির করিল সেই লইয়াছে। মণিকা কর্ত্রীকে সম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। অন্য রমণীরা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল

"চুরি করিয়াও এত মেজাজ! যেন একজন মাননীয়া লেডি।"

মণিকা হলে দাঁড়াইয়া ছাতা লইতেছিল। এমন সময় একটি শকট আসিয়া গাড়ীবারান্দায় থামিল। পরক্ষণেই হলের দ্বার খুলিয়া, একজন দীর্ঘকায় যুবা প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিয়াই আনন্দ উৎফুল্ল আননে চাহিয়া হাত বাড়াইয়া দিল।

ট্রেন্স সর্ব্বদাই সেই শুভ্র বস্ত্র পরিধানা বালিকা মূর্ত্তি, সেই কালো আঁখি তারা দুটি, মানসপটে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কতবার তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। কিন্তু কার্য্যের গতিকে অতদূরে যাইবার

সুযোগ হয় নাই। যাহাকে বহুদূরে ভাবিয়া ছিল, আজ সে সম্মুখে, লণ্ডনেই তাঁহাদের বাটীতে। ট্রেন্স মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখিলেন। আর সে বালিকার বিকশিত আননে হরষ হিল্লোল নাই। ম্লান বিবর্ণ মুখ। পরিধানে মলিন শোকবস্ত্র। বালিকার আনন্দ উৎসাহ, আর যেন সে শুষ্ক মুখে নাই। চক্ষের আকুল চাহনিতে যেন দুঃখের কালো ছায়া ভাসিতেছে।

"মিস ফেয়ার? তুমি এখানে মিস ফেয়ার? তুমি কি আমার জননীর পরচিত?"

"হাঁ আমি তাঁহার নিকট কর্ম্ম করিতাম। এখন আমায় যাইতে দিন। এই কথা বলিয়া সহসা সে ট্রেন্সের হাত ছাড়াইয়া, বিদ্যুতের মত চলিয়া গেল। ট্রেন্স সম্মোহিতের মত চাহিয়া রহিলেন।

৩

"মা আমি জানিতাম না যে তোমার মিস ফেয়ারের সহিত পরিচয় আছে।" মাতা ও পুত্র আহারের পর ডেজার্টে (Dessert)এ বসিয়া ছিলেন। ট্রেন্স কয়েকটা ষ্ট্রবেরী মুখে দিতে দিতে মাতাকে এই প্রশ্ন করিলেন। লেডি মার্টিনডেল বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া কহিলেন

"কোন মিস ফেয়ার? ওঃ যার কথা আমার বন্ধু মিঃ রে বলিয়াছিলেন। হাঁ তাকে জানি বই কি। কিন্তু আজ তার জন্য কি ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়াছে। অত্যন্ত লজ্জার কথা, ছিঃ।"

ট্রেন্স ব্যস্ত হইয়া বলিলেন

"কি ঘটনা মা?"

"সে আমার ডিউকের নস্যদানী চুরি করিয়াছে।"

"সে তোমার নস্যদানী চুরি করিয়াছে? কি বলিতেছ মা? কোন ডিউক? কোন নস্যদানী? আমিত স্বপ্নেও জানিতাম না, যে তোমার নিকট এরূপ কোনও দ্রব্য আছে।"

"আমি তোমায় ইহার বৃত্তান্ত সব বলিতেছি শুন। আমি তোমারি জন্মদিনে উপহার দিবার জন্য এই নস্যদানী কিনিয়া আনিয়াছিলাম। দোকানদার আমায় বলিয়া ছিল, তাহা ডিউক অফ ওয়েলিংটনের। আমি জানিতাম



সপত্নী পুত্রে সন্তানের সাধ মিটাইয়াছেন। তিনিও কিছু বুঝিতে না পারিয়া আকুল ভাবে বলিলেন—

"কি করিব ট্রেন্স? আপনি নিজে গিয়া মাইনা চাহিব কি?"

"না মা আমিই যাব। তুমি তাহার বাটীর নম্বর জানত?"

"হা তাহা জানি, উপরে আমার বাক্সে লেখা আছে। মণিকা অতিশয় বিবর্ণ হইয়াছিল, লজ্জায় অপমানে তাহার সারা দেহ কম্পিত হইতেছিল। ট্রেন্স আমার নিজের যাওয়াই কি উচিত নয়? তাহাকে এ কথা না বলিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।"

ট্রেন্সের আননে আনন্দের আলোক ভাসিয়া উঠিল। পুলক বিকম্পিত স্বরে কহিলেন "মা এই তোমার মত উপযুক্ত কথা। আহা তাহাকেও ত শীঘ্র বলা চাই যে তুমি নস্যদানী পাইয়াছ, দ্বিপ্রহরের ঘটনায় দুঃখিত হইয়াছ। কেমন এই কথা বলিলেইত হইবে?"

"হা তাহা হইলেই হইবে। কিন্তু সে কেন পকেট দেখাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিল এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিও না।"

লেডি মার্টিন ডেল চলিয়া যাইবার পর, ট্রেন্স মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। দরিদ্রতা কি ভীষণ! আহা মণিকা, তাহার কি ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই বিকশিত কুসুম শুকাইয়া গিয়াছে। সেই হাস্যোজ্জল আনন বিষাদের কালিমায় ম্লান হইয়াছে। কবে সে দিন আসিবে, যবে ট্রেন্স সেই আননে আনন্দের ছায়া, সেই নয়নে হাসির আলোক আনিয়া দিবে।

তিন মাস অতীত হইবার পর হাউস অফ কমন্সের (House of commons) সম্মুখে একটি ছোট পার্টির লোকেরা চা পান করিতেছিলেন লেডি মার্টিন ডেল নেলকে লইয়া লেডি দিগের গ্যালারীতে চলিয়া গেলেন। ট্রেন্স সেই শুভ্রবস্ত্র পরিধানা রমণীকে লইয়া, প্রস্তর স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, নদীর তরঙ্গ দেখিতেছিলেন। নদী, প্রান্তর, পথ, মাঠ, সূর্য্যের কিরণে হাসিতেছিল। দূরে সমাধি স্থান, যেন আলো ও ছায়াতে নিদ্রিত রহিয়াছে। মণিকা যেন ঘুমন্ত স্বপ্নের রাজ্যে আসিয়াছে। অতি মৃদু স্বরে আপনা আপনি বলিল—

"এই লণ্ডন! এই সেই সুখময় লণ্ডন?"

"মণিকা তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ?"

"আমি ভাবিতেছি লণ্ডন কি সুন্দর।"

তাহারা দুইজনে কেবলমাত্র সেইস্থানে ছিল। অন্য সকলে মহামতি গ্লাড ষ্টোনের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিয়াছিল।

"ট্রেন্স আমি কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডন কি ভয়ানক স্থান ভাবিয়াছিলাম। জীবনের এই ঘোরতর পরীক্ষায় আমি যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছি। যদি চিরকাল আমি ধনবান ও সুখী হইতাম, তাহা হইলে দরিদ্রতার ভীষণ কষ্ট, ক্ষুধার দহন, কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। ট্রেন্স এখনো তোমায় একটি কথা বলিতে আছে।"

"মণিকা কি কথা ?"

"ট্রেন্স সেই দিনের সেই নস্তদানীর কথা! আমি কেন পকেট দেখাই নাই জান ? আমার আহার্য্য হইতে নেলের জন্য খাদ্যদ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম।"

ট্রেন্স মণিকার প্রতি অনিমেষ প্রেমপূর্ণ নয়নে চাহিয়াছিল। নদীর তরঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া বহিতেছিল। একখানি ক্ষুদ্র তরণী তরঙ্গে তরঙ্গে কম্পিত হইতেছিল, দুলিতেছিল। সূর্য্যের কনক কিরণে ধরণী হাসিতেছিল।

"মণিকা আমি তাহা পূর্ব্বেই জানিতাম।"

"তবে তুমি নিশ্চয়ই যাদুকর।"

"মণিকা মাও আমাকে সেইদিন ঠিক এই কথাটি বলিয়াছিলেন। আমি যাদুকরও নই, আমার কিছু ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাও জানা নাই। আমার ডিউকের নস্তদানীর কাহিনী সহসা স্মরণে আসিল, তাহা বলাতেই ত মা নস্তদানী পাইলেন। যাই হোক মণিকা প্রিয়তমে তোমার আমার জীবনে কোন কথা গোপন থাকিবে না। উভয়ের সামান্য কথাটিও উভয়কে বলিব, কেমন তাহাই কি সুখের নয় ? ট্রেন্স হাসিয়া সম্মুখের তরণী মণিকাকে দেখাইলেন, প্রেমপূর্ণ স্বরে বলিলেন—

"মণিকা দূরে ওই তরীটি দেখিতেছ কি ? ঈশ্বর করুন যেন আমরা উভয়ে একত্রে উহারি মত জীবন সমুদ্রে বহিয়া যাইতে পারি। কেবল আমরা দুইজনে। মণিকা তুমি আর আমি।"

"দুই জনে ? আমারো তাহাই কামনা।" মণিকা একটি সুখের নিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে নদীর পানে চাহিয়া রহিল।



যাও তোমরা উভয়ে ওই নদীর মত একত্রে অনন্ত সমুদ্রের দিকে বহিয়া যাও। অনন্ত বিশ্রামের দিনেও যেন তোমাদের অনন্ত মিলন হয়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সমাপ্ত।

---

# রাঙ্গা মোথার মোহন ক্ষীর।

উপকরণ।—বিট (রাঙ্গা মোথা) চারিটা, খোয়া বা ডেলা ক্ষীর আধ পোয়া, ঘি আধ পোয়া, চিনি আধ পোয়া, বড় এলাচ দুইটা, গোলাপ জল আধ ছটাক, বাদাম দশটা, পেস্তা দশ বারটা, একখানি মালাই সর প্রায় এক পোয়া।

প্রণালী।—বেশ লাল দেখিয়া বিট আনিবে। খোসাশুদ্ধ সিদ্ধ করিতে দিবে। ইহা মিনিট পনেরর ভিতর সিদ্ধ হইয়া যাইবে। তারপরে একটি কাপড়ে করিয়া রগড়াইয়া ফেল, তাহা হইলে সব খোসা বেশ সহজে উঠিয়া যাইবে। এখন রাঙ্গা মোথা গুলি মোলায়েম করিয়া বাঁট। বাদাম পেস্তাগুলি কুচাইয়া রাখ। বড় এলাচ কুটিয়া রাখ।

একটি কলাই করা কড়াতে ঘি চড়াও। ডেলা ক্ষীরটা এই ঘিয়ে ভাজ। ক্ষীরটা অল্প লাল্‌চে লাল্‌চে হইলেই নামাইয়া ঢালিয়া রাখ। আবার কড়া আগুণে চড়াও। (লোহার কড়াতে ইহা যখন করিবে না, তাহা হইলে কষে কাল হইয়া যাইবে)। বাকী ঘিটা কড়ায় ঢালিয়া দাও; বিট ছাড়। চামচ দিয়া বিট নাড়িতে থাক। ইহার হাল্‌সেটে গন্ধ চলিয়া গেলে আধ পোয়া জলে চিনি টুকু গুলিয়া ইহাতে ঢালিয়া দাও। জল মরিয়া আসিলে পর যখন দেখিবে বেশ থক্‌থকে হইয়া আসিয়াছে তখন ইহাতে ঘি সমেত ক্ষীরটা ঢালিয়া দিবে। এবারে বেশ করিয়া নাড়িতে থাক। জলীয় ভাব

মরিয়া গিয়া ঘিয়ের উপর চক্‌চক্‌ করিতে থাকিলে নামাইয়া অর্দ্ধেক গুলি বাদাম ও পেস্তা কুচি করিয়া এবং বড় এলাচ দুটী গুঁড়া করিয়া ছড়াইয়া দাও। গোলাপ জল ছড়াইয়া দাও। এখন সাজাও। একটি চেপটা পাত্রে ইহা গোল করিয়া রাখিয়া তাহার উপরে মালাই সরটা বসাইয়া দাও। মালাইয়ের উপরে বাদাম ও পেস্তা কুচি সাজাও।

ভোজন বিধি।—ইহা জলপানে ও পুডিংএর বদলে দেওয়া যাইতে পারে।

ব্যয়। বিট দু আনা, ডেলা ক্ষীর দু আনা, ঘি দুআনা, চিনি দু পয়সা, বাদাম পেস্তা দু পয়সা। গড়ে সাত আনা আনার ভিতর হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

---

## লঙ্কি।

( আচার বিশেষ )

উপকরণ। কাঁচা আম পাঁচ পোয়া, গোটা ধনে আধ পোয়া, হলুদ এক ছটাক, শুক্না লঙ্কা এক ছটাক, জীরা আধ ছটাক, রসুন তিন গাঁঠ ( ইচ্ছামত না দিলেও হয় ), সরিষার তেল পাঁচ পোয়া, নুন এক ছটাক।

প্রণালী। ধনে, হলুদ, শুক্নালঙ্কা ও রসুন সব মিহি করিয়া পিষিয়া রাখ।

কাঁচা আমের খোসা ছাড়াইয়া চিরিয়া চার ফালি কর। জলে ধোও। জল ঝরাইয়া ফেল।

একটি হাঁড়িতে সরিষা তেল চড়াইয়া দাও। তেলের ধোঁয়া বাহির হইলে পর জীরা ফোড়ন দাও। জীরা চুর চুর করিয়া থামিয়া গেলে বাঁটা মশলা ছাড়। মিনট দশ কি পনর মশলাটা বেশ লাল করিয়া কসা হইলে পর ইহা হইতে খানিকটা তেল আর একটি পাত্রে ঢালিয়া রাখ। তারপরে এই মশলাতে আম গুলি ছাড়, এই সঙ্গে নুনও ঢালিয়া দাও। দু তিন মিনিট আমগুলি নাড়া হইলে পর, পূর্ব্বে যে তেল ঢালিয়া রাখা হইয়াছিল সেই তেল এখন আমের উপর ঢালিয়া দাও। হাঁড়ি নামাইয়া ফেল।

একেবারে ঠাণ্ডা হইলে পর একটি মাটির হাঁড়িতে বা একটা বুয়েমে আগে আমগুলি সাজাইয়া রাখ, তার উপরে ক্রমে মশলা ও তেল ঢালিয়া দাও।



হাড়ির উপরে আগে কাপড় বাঁধিয়া তাহার উপরে শরা ঢাকা দিয়া আবার তাহার উপরে কাপড় বাঁধিয়া রাখ।

দু তিন বৎসর রাখিতে চাহিলে হাঁড়ির মুখ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাঁধিয়া মাটীর ভিতরে পুঁতিয়া রাখিলে হয়।

ভোজন বিধি। হিন্দুস্থানী রোটা, পুরু চাপাটী, ভাল পূরী ইত্যাদির সহিত খাইতে ভাল।

ব্যয়। কাঁচা আম দশপয়সা, ধনে দুই পয়সা, হলুদ দু পয়সা, শুক্না লঙ্কা এক পয়সা, জীরা দু পয়সা, রসুন আধ পয়সা, খাঁটি সরিষা তেল দশ আনা, নুন আধ পয়সা। তের চৌদ্দ আনা প্রায় খরচ হইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

---

## মাংসের বিরিঞ্চি।

উপকরণ।—মটন ( ভেড়ার মাংস ) এক পোয়া, আলু তিনটী, পেঁয়াজ নয় দশটী, শুক্না লঙ্কা দু তিনটী, আদা এক গিরা, ঘি আধ পোয়া, নুন প্রায় আধ তোলা, ছোট এলাচ দুইটী, লঙ্গ ছয় সাতটী, দারচিনি আধ তোলা, দই দেড় ছটাক, জল দেড় ছটাক, তেজপাতা দুখানা।

প্রণালী।—আলুগুলির খোসা ছাড়াইয়া চার টুকরা করিয়া বানাও। মাংস বড় ডুমা ডুমা আকারে কাট। পেঁয়াজ অর্দ্ধেক গুলি ভাজিবার জন্য কুঁচাও। বাকী অর্দ্ধেক পেঁয়াজ, শুক্না লঙ্কা আদা একত্রে পিষিয়া রাখ।

হাঁড়িতে ঘি চড়াও। ঘিয়ে আলুগুলি লাল ভাজা ভাজা করিয়া উঠাও; ছয় সাত মিনিটের মধ্যে হইয়া যাইবে। পেঁয়াজ কুচিগুলি এই ঘিয়েতেই লাল করিয়া ভাজিয়া উঠাইয়া রাখ। মিনিট চার পাঁচের ভিতর হইয়া যাইবে। এবারে মাংস ছাড়। খুব ভাজা ভাজা করিয়া কস। যখন দেখিবে জল নাই কেবল ঘি রহিয়াছে তখন নামাইবে। প্রায় মিনিট আঠার লাগিবে। মাংস হইতে ঘি টুকু ঝরাইয়া মাংস আলাদা পাত্রে রাখিয়া দেন।

হাঁড়ি করিয়া এই ঘি আবার চড়াইয়া তাহাতে গরম মশলাগুলি ও তেজপাতা ফোড়ন দাও। গরম মশলার সুবাস বাহির হইলে সমস্ত দই, পেষা মশলা ও মাংস খণ্ডগুলা ছাড় এবং এই সঙ্গে দেড় ছটাক জল ঢালিয়া দাও। দশ মিনিট বেশ ফুটিলে পর নামাইয়া দমে বসাও। এই দমে মিনিট দশ পনের বসান থাকিবার পর আস্তে আস্তে জল মরিয়া গেলে তখন নামাইবে।

ভোজন বিধি।—ইহা এক প্রকার কোর্ম্মা কারী বলা যাইতে পারে। ভাল খিচুড়ির সহিত কি মাংসের পোলাওয়ের সহিত খাইতে ভাল।

ব্যয়।—ইহাতে প্রায় আনা পাঁচ খরচ হইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

---

# মৃত্যু।

তুমি পাঠাইলে মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে,
তব আহ্বান করি সে বহন
পার হয়ে এল পারে।
আজি এ রজনী তিমির আঁধার,
ভয় ভারাতুর হৃদয় আমার,
তবু দীপহাতে খুলি দিব দ্বার,
নমিয়া লইব তারে।
পূজিব তাহারে যোড়কর করি
ব্যাকুল নয়নজলে,
পূজিব তাহারে, পরাণের ধন
সঁপিয়া চরণতলে।
আদেশ পালন করিয়া তোমারি
যাবে সে আমার প্রভাত আঁধারি
শূন্য ভবনে বসি, তব পায়ে
অর্পিব আপনারে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# য়্যাণ্টিগণ।

পুরাকালে গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী থিব্‌স্ রাজ্যে ইডিপস্ নামক এক প্রাচীন নরপতি ছিলেন। ক্রিয়ন্ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইডিপসের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ পলিনিসেস্ ও কনিষ্ঠ ইটিয়ক্লিস। এতদ্ব্যতীত তাঁহার য়্যাণ্টিগণ ও ইস্‌মিন্ নামক দুই কন্যা ছিল। ইডিপস্ যৌবনকালে নানাপ্রকার পাপ-কার্য্যে রত ছিলেন। তাঁহাকে পরিণামে ইহার বিষময় ফলভোগ করিতে হইয়াছিল, বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার যন্ত্রণার একশেষ হইয়াছিল। তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া চক্ষুরত্ন হারাইলেন। সকলে তাঁহাকে অবজ্ঞা ও উপহাস করিতে লাগিল। তিনি অবশেষে সেই বৃদ্ধাবস্থায় আপন পুত্র ইটিয়ক্লিস্ কর্ত্তৃক স্বকীয় রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় অন্ধ পিতার এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া য়্যাণ্টিগণ ভ্রাতার রাজ্যে থাকিয়া সুখভোগ করিতে চাহিল না। য়্যাণ্টিগণ পিতার সহগামিনী হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিল। য়্যাণ্টিগণ দেখিল পিতা রাজ্যেশ্বর হইয়া বিপুল রাজপদ হইতে বিচ্যুত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় চক্ষুরত্ন হারাইয়াছেন। এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত বৃদ্ধ পিতাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করা নিতান্ত নীচপ্রকৃতির কর্ম্ম সুতরাং য়্যাণ্টিগণ পিতৃ-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মসুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভ্রাতার রাজ্য পরিত্যাগ করতঃ অন্ধপিতার সহগামিনী হইয়া তাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত হইল। য়্যাণ্টিগণ বৃদ্ধপিতার অন্ধের যষ্টি হইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা য়্যাটিকা নামক স্থানে এক সুন্দর উপবনে উপনীত হইলেন।

তৎকালে সমগ্র য়্যাটিকার মধ্যে এমন সুন্দর স্থান আর ছিল না। সেই বৃক্ষরাজি সুশোভিত উপবনে দিবানিশি কলকণ্ঠ বিহগকুলের কাকলীরব শুনা যাইত। সেখানে অসংখ্য দ্রাক্ষালতা ফলভরে অবনত মস্তকে উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিত। কথিত আছে গ্রিকজাতীয়দিগের দণ্ড বিধানের দেবতা ইউমিনাইডিস্ ঐ পরম রমণীয় উপবনে থাকিতেন। ঐ স্থান তৎ-

কালে য়্যাথেন্সরাজ থিসুসের অধিকার ভুক্ত ছিল। য়্যাথেন্সরাজ থিসুস অনুগ্রহপূর্ব্বক ইডিপস্‌কে ঐ স্থানে বাস করিবার অনুমতি দিলেন। ইডিপস্ তাঁহার অনুমতি পাইয়া স্থির করিলেন যে এ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই প্রবাসক্ষেত্রেই কন্যাসমভিব্যাহারে যাপন করিবেন। কয়েক দিবস পরে তাঁহার অন্যতমা কন্যা ইস্‌মিন্ তাঁহার নিকট আসিল।

এ দিকে ইটিয়ক্লিস্ রাজপদাভিষিক্ত হইয়াই আপন জ্যেষ্ঠ সহোদর পলিনিসেস্‌কে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পলিনিসেস্ এইরূপে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্যলাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনার ন্যায়াধিকার পুনঃ প্রাপ্তির অভিলাষ করিয়া সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় গ্রীস দেশের নানা-স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বহু সংখ্যক সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা স্থির করিলেন। কনিষ্ঠ সহোদরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি পিতার অনুমতি লইবার জন্য সেই য়্যাটিকার উপবনে গমন করিলেন। তিনি পিতার অনুমতি লইয়া উপবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সহোদরদ্বয়কে অনুনয় বচনে কহিলেন যে যদি আমি সমরে হত হইয়া যাই তাহা হইলে তোমরা আমার মৃতদেহ সমাহিত করিও। পুরাকালে গ্রীকজাতীয়দিগের এইরূপ সংস্কার ছিল যে পাতালপুরীতে য়্যাকিরণ নামক একটী নদী আছে। মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন না হইলে মৃত ব্যক্তির দেহ ঐ য়্যাকিরণ নদীর নিকট ইতস্ততঃ করিয়া বেড়াইতে থাকে, স্বর্গধামে যাইতে পারে না। য়্যাণ্টিগণ ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া স্থির গম্ভীর কণ্ঠে তাঁহাকে বলিল "ভ্রাতঃ আমি তোমার মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্য প্রতিশ্রুত রহিলাম।" পলিনিসেস্ প্রতিগমন করিলে কিছুদিন পরে এক দিবস ঐ উপবনে সহসা এক হৃদয়বিদারী বজ্রপাত হইল। ঐ বজ্রপাতে বৃদ্ধ ইডিপস্ প্রাণত্যাগ করিলেন। সুতরাং ভগ্নিদ্বয় নিঃসহায়া হইয়া তথা হইতে থিব্‌স্ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিল।

পলিনিসেস্ সৈন্য সামন্ত লইয়া ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইটিয়ক্লিসও আপন সৈন্য সামন্ত লইয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক রণসজ্জা করিয়া পলিনিসেসের সহিত প্রলয় সমরে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষের বলক্ষয় হইয়া সমরক্ষেত্র শোণিত স্রোতে প্লাবিত



হইতে লাগিল। অবশেষে, দুই সহোদরে রণক্ষেত্রে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ হারাইলেন।

ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইল। তাহাদিগের উভয়ের বিনাশে রাজ্য সিংহাসন শূন্য হইলে তাহাদিগের পিতৃব্য ক্রিয়ন রাজ সিংহাসনাধিরূঢ় হইলেন। ক্রিয়ন সর্ব্বক্ষণ ইটিয়ক্লিসের পরম সহায় ছিলেন। সুতরাং তিনি রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াই আদেশ করিলেন যে ইটিয়ক্লিসের যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে কিন্তু পলিনিসেসের মৃতদেহ সমরক্ষেত্রে শৃগাল কুক্কুরে ভক্ষণ করিবে এবং যে কেহ তাহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করিতে সাহস করিবে তাহাকে বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

য়্যাণ্টিগণ ভ্রাতার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এক্ষণে তাহা স্মৃতিপথারূঢ় হইল। ভীরুস্বভাবা ইস্‌মিল্ তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল কিন্তু য়্যাণ্টিগণ বলিল "ভগ্নী, যদি প্রিয় সহোদরের মৃত দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন করিতে গিয়া মৃত্যুদণ্ড মস্তকে লইতে হয় তাহা তো গৌরবের কথা; আমি সে মৃত্যু যাতনার ভ্রূকুটীতে দৃক্‌পাত করি না। আমি প্রাণান্তেও সে সত্য পালন করিতে বিরত হইব না।

শৃগাল শকুনি পরিবেষ্টিত অগণিত মৃতদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সমরক্ষেত্র ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল। য়্যাণ্টিগণ গভীর রজনীতে সেই ভীষণ সমরক্ষেত্রে গোপনে গমন পূর্ব্বক স্বয়ং পলিনিসেসের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিল। কিন্তু বর্ব্বর ক্রিয়ন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পলিনিসেসের মৃতদেহ সমাধি গহ্বর হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া পুনরায় প্রকাশ্যভাবে সমরক্ষেত্রেই ফেলিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন এবং কে এই অসমসাহসিক কার্য্য সাধন করিয়াছে অবগত হইবার জন্য সমর ভূমির কিয়দ্দূরে একজন প্রহরী রাখিয়া দিলেন।

সত্যবদ্ধা য়্যাণ্টিগণ এই সংবাদ শুনিয়া পুনরায় রজনীতে সেই শ্মশানভূমিতে গমন পূর্ব্বক ভ্রাতার মৃত দেহের এরূপ অবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে মৃতদেহ পুনরায় সমাধিস্থ করিল এবং তাহাতে স্বজাতীয়দিগের প্রথানুসারে মদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক তর্পণ করিতে লাগিল। প্রহরী দূর হইতে এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া য়্যাণ্টিগণকে ধৃত করতঃ ক্রিয়-

নের সমক্ষে আনয়ন করিল। য়্যাণ্টিগণ ক্রিয়নের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অকুতোভয়ে স্পষ্টতঃ সকল কার্য্য স্বীকার করিল।

এদিকে ইস্‌মিন্ পিতৃব্যের নিকট বিনীত বচনে ভগ্নীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। কিন্তু পাপমতি ক্রিয়নের প্রস্তর কঠিন প্রাণ বিচলিত হইল না। সেই মহতী কীর্ত্তির জন্য সাধুশীলা য়্যাণ্টিগণের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল। য়্যাণ্টিগণ বধ্য-ভূমিতে আনীত হইল। তখনও তাহার চিত্তের কোন প্রকার বিকৃতি দেখা গেল না। য়্যাণ্টিগণ বধ্য মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল "আজ আমার কি সুখের দিন। আজ আমার প্রিয় পিতামাতা ও ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট যাইবার জন্য প্রাণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে" এই বলিয়া প্রাণ হারাইল।

পাঠক, ভারতললনা অতুল স্নেহে ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় য়্যাণ্টিগণ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। য়্যাণ্টিগণের ইতিবৃত্ত মধ্যে কতটুকু সত্য নিহিত আছে বলিতে পারি না। কিন্তু পুরাকালের নানা আখ্যায়িকার মধ্যেও যে গৌরবময় স্বার্থ বিসর্জ্জনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই য়্যাণ্টিগণ-কাহিনী হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। য়্যাণ্টিগণ কাহিনীতে অনেক মিথ্যা জড়িত রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বীরোচিত কার্য্যের কথা, কহিতে বা চিন্তা করিতে পারিলে, ও বীরকীর্ত্তির সহিত সহানুভূতি দেখাইতে পারিলেও মানব এককালে বীরাসন প্রাপ্ত হইবার আশা করিতে পারে। আমরাও আজ সেই আশায় প্রণোদিত হইয়া গ্রীকজাতিদিগের সিদ্ধ প্রাচীনগ্রন্থ হইতে এই বিয়োগান্তক ধর্ম্মাখ্যানের দুই একটী কথার বর্ণনা করিলাম।

শ্রীকমলকৃষ্ণ সাহা।

---

# হিতৌষধ সংগ্রহ।

## রং সাফ করিবার উপায়।

পিপুল মাসকলাই মসিনা ও গম
ইহাদের বেঁটে ফেল যেন রে মাখম,
পরে দুই দিন ধরে মাখ গাত্রময়
কৃষ্ণবর্ণ দেহ এতে গৌরবর্ণ হয়।

## আমাশয়ের ঔষধ।

মুতোর পাঁচন বড় ভাল আমাশয়ে,
খেলে তাহা দূর করে আমাশয় ভয়ে ;
দেখিতে মদের মত মুতোর পাঁচন
আমাশয়ে মুতো পেলে ভারি গো বাঁচন ;
মুতো ঘাস হেথা সেথা জন্মায় বাগানে
টাট্‌কা পাঁচন তার বড় হিত পানে ;
অনেকে কিনিয়া লয় বেনের দোকানে,
মুতো তার ভাল, তুলে টাটকা যে আনে।

## আমাশয়ের ঔষধ।

( দ্বিতীয় প্রকার )

দাড়িমের কচিপাতা, কচিপাতা তেতুলের
ও জামের কচিপাতা, একতোলা প্রত্যেক্যের,
একটী দাড়িম ছাল, আর জিরা চারি আনা,
এই সব দ্রব্য ল'য়ে চাই ভাল পিষে আনা,
পরে আধপোয়া জলে রীতিমত মিশাইয়া
খাও, আমাশয় রোগ যাবে আরোগ্য হইয়া।

## কুমড়ার মেঠাই—পিত্তনাশকারী।

কুমড়ার মিঠাই সে করে পিত্তনাশ
কুমড়ার মিঠাই ঘরে ক'রে রেখো রাশ।
কুমড়া ত্রিদোষহর গুণ ঢের তার
মিঠাই করিও তাই ছাঁচি কুমড়ার।

## পক্ককেশ কৃষ্ণ করিবার উপায়।

আদা ও কলার এঁটে
রস্থন মনসাপত্র
ইহাদের রস ল'য়ে
মিশ্রিত করি একত্র,
আগুনে গরম করি
অকাল পক্ক কেশে
দিলে তিন চারি দিন
ধরিবে কৃষ্ণবেশে।

## ধাতুপুষ্টিকর ঔষধ।

তাল্মাখ্না, সমুদ্র সুখ, মুছলি সফেদ,
মুছলি সেহার দানা, গোক্ষুর সমেত
সব পরিষ্কার দেখে হইবে আনিতে
তারপরে সমভাগ হবে ক'রে নিতে
পাঁচটী দ্রব্যের, শেষে করিবে গো চূর্ণ,
সেই 'চূর্ণ' পরিমাণে মিশ্রি কর পূর্ণ;
পরে ছয়মাসা করি' পরিমাণ তার
খাও গাই দুদ দিয়ে, ভাল গো অজার
মিছরিপানা খাবে—ও খাবার সময়—
সেবন করিবে দুধ, ধাতুপুষ্টি হয়।



## হিক্কার ঔষধ।

গোলমরিচের ধূম হিক্কার ঔষধ
ও ধূমের নস্য নিলে হয় হিক্কাবধ।
হিক্কার ঔষধ এই, জানে অনেকেই
এর নস্য নেওয়া ভাল হিক্কা হবে যেই।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# সাংখ্যস্বরলিপি।

### জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

সংসারে তোমার মত কে আছে আপন
সবে চ'লে যাবে, তবে তুমি শুধু রবে
তাই তব কাজে কাল করিগো যাপন,
অন্তরে তোমার কথা শুনি যে নীরবে।

তালি। ২ : (স্থা, স্ত) । ৩ । ০ । ১ ॥<br>
মাত্রা। ২ । ৩ । ২ । ৩ ॥

(স্থা):—রে রে। গা½ মা½ পা। গ্মা। রে সা।<br>
(স্থা):—সং সা। রে — —। তো। মা —র্।

রে রে২। সা সা। রে½ গা½ মা মা। মা গা। রে<br>
ম ত। কে আ। ছে — — আ। প —। ন

২..............<br>
গা সা। স্মা রে। মা মা২। পা পা। সা সাঁ রে½<br>
— —। স বে। চ লে। যা বে। ত বে —

নি½ । ধা ধা । মা পা২ । মা গা রে গা সা II ।
— । তু মি । শু ধু । র — 'বে — — II ।

২.................................
(ন্ত) :— মা পা । নি২ নি । সা সা সা২ সা । সা
(ন্ত) :— তা ই । ত ব । কা জে কা ল । ক

............. ২.............. ..
সা । সা½ নি½ রে সা । স্রে নি । ধা পা২ । মা মা ।
রি । গো — — যা । প — । ন — । অ ন্ত ।

গ্মা রে মা । মা মা । পা পা২ । রে রে । রে২ নি ।
রে — তো । মা র । ক থা । শু নি । যে নি ।

সা২ । সা৩ । (স্থা) :— রে : ॥ ॥
র । বে । (স্থা) :— সং ॥ ॥

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# পুণ্য।

## পিতৃগণ অমূর্ত্ত ও সমূর্ত্ত।

(তর্পণতত্ত্ব)

প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি যে অগ্নির সহিত পিতৃগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অগ্নি বা অগ্ন্যুপাধিক ঋষিদিগের অধিকাংশই প্রায় পিতৃসম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। তাই তর্পণের প্রধান মন্ত্রে অগ্নি স্থাপনা পূর্ব্বক পিতৃগণের আবাহন করিবার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রটী এই—

উশন্তস্ত্বা নিধীম হ্যশন্তঃ সমিধীমহি
উশন্নশত আবহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে।

এই বেদ মন্ত্রের ঋষি শঙ্খ, পিতৃগণ দেবতা।

"হে অগ্নে ত্বা ত্বাং নিধীমহি নিদধ্মঃ আরোপয়াম ইত্যর্থঃ অর্থাৎ বয়মিত্যধ্যাহার্য্যম্। কিন্তু তা বয়ং উশন্তঃ ইচ্ছন্তঃ কিঞ্চ উশন্ত এব বয়ং ত্বাং সমিধীমহি শীলযামঃ ত্বামিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ত্বঞ্চ উশন্ ইচ্ছন্ সন্ পিতৃন্ আবহ প্রাপয় আনয়েতি যাবৎ। কিন্তু তান্ পিতৃন্ উশতঃ ইচ্ছতঃ। কিমর্থং পিতৃণামানয়নমিত্যপেক্ষায়ামাহ। হবিষে অত্তবে তর্পণে দেয়স্য হবিষো জলস্য আদানার্থমানয়েতি বাক্যার্থঃ। হে অগ্নে অস্মাভিরাধানজ্বালনাভ্যামারাধিতস্ত্বমস্মাকং পিতৃন্ তর্পণ দেয়স্য জলস্য পানার্থমানযেত্যগ্নৌ প্রার্থনম্।" ইত্যুশন্ত ইতি মন্ত্রব্যাখ্যা

ইহার অর্থ এই—

"হে অগ্নি তোমাকে আমরা স্থাপন করিলাম ও প্রজ্বলিত করিলাম

আমাদের বড় ইচ্ছা যে তুমি পিতৃগণকে (যাঁহারা আসিতে অভিলাষী এমন পিতৃগণকে) তর্পণে দেয় জলপানার্থ এখানে আনয়ন কর।"

অঙ্গিরা, অথর্ব্বা ও ভৃগু এই তিন ঋষির বংশধরেরা প্রধানতঃ পিতৃসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ঋগ্বেদে আছে—

অংগিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ। *

"অঙ্গিরা নামক, অথর্ব্বা নামক এবং ভৃগু নামক আমাদিগের পিতৃলোকগণ এইমাত্র আসিয়াছেন তাঁহারা সোমরস পাইবার অধিকারী।" এতদ্ভিন্ন বশিষ্ঠ প্রভৃতি অন্যান্য ঋষি মুনিদিগের বংশধরেরাও অনেকে পিতৃদলভুক্ত ছিলেন। ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি হইয়া ক্রমে দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মনু বলিয়াছেন—

য এতে তু গণা মুখ্যাঃ পিতৃণাং পারকীর্ত্তিতাঃ।
তেষামপীহ বিজ্ঞেয়ং পুত্রপৌত্রমনন্তকং॥

"প্রধান সপ্ত পিতৃগণের অনন্ত পুত্র পৌত্র হইয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।" এই পিতৃকুল সমূহ হইতে অনেকানেক অগ্ন্যুপাধিধারী উৎপন্ন হইয়া জগতে অগ্নির মাহাত্ম্য ও প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। ভৃগু ও অঙ্গিরাকুল যে অগ্নি ঋষিদিগের উৎপাদক তাহা আমরা পূর্ব্বে যজ্ঞ ও অগ্নি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। অথর্ব্বারও সম্বন্ধে ঋগ্বেদে আছে—"অথর্ব্বা নামক ঋষি অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন এই অগ্নি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞকার্য্য জানেন। ইনি যজ্ঞকর্ত্তার দূতস্বরূপ হইয়া দেবতাদিগকে সম্বাদ দেন। ইনি যমের প্রিয়পাত্র।" †

আমাদের শিবও পিতৃসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শিব যে হিমালয়কুলে বিবাহ করিয়াছেন সেই হিমালয়পত্নী মেনকা সোমপা নামক পিতৃগণেরকন্যা।

এষবৈ প্রথমঃসর্গ সোমপানাং মহাত্মনাং।
এতেষাং মানসী কন্যা মেনানাম মহাগিরেঃ।
পত্নী হিমবতঃ শ্রেষ্ঠা যস্যা মৈনাক উচ্যতে॥ ‡

* ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৪ সূক্ত।
† ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ২২ সূক্ত।
‡ হরিবংশ অষ্টাদশ অধ্যায়।



"এই মহাত্মা সোমপাদিগের মানসী কন্যাদিগকে আশ্রয় দাও; তোমাদের জন্য যাঁহার পুত্র মৈনাক নামে বিখ্যাত।" পিতা কর।"

অন্ন বিতরণে সিদ্ধহস্তা—অন্নপূর্ণা হইবেন পিতৃগণ অধিকাংশই দেবযুগের অর্থাৎ আমরা দেখিয়া আসিয়াছি অন্নবিতরণসাময়িক। এই পিতৃগণ অতি প্রাচীন প্রধান লক্ষণ। শ্মশানচারী শিবে বর্হিষদ, অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি তিনটী পিতৃগণ যোগবল, কি দাক্ষিণ্য গুণ, কি ওষধিতত্ত্বা উক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে পাঠক বুঝিভাবের এই সকল লক্ষণ শিবে বিদ্যমান রেরা পিতৃগণের তিনটী শাখাকে 'মূর্ত্তি-হইয়াছেন। কবি কালিদাস পার্ব্বতী 'দেবগণের পিতৃগণ' 'অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ দেবানাং' বলিয়াছেন— তি পিতৃগণ যে 'দেবগণের পিতৃগণ' বলা

"জগতঃ পিতরৌবন্দে য় যে তাঁহারা সেই ইন্দ্রাদি আদি দেবগণের

ইহাতে দেখিতেছি তিনি ঐতি অর্থ যে অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি পিতৃগণ দেবগণের লিখিয়াছেন। অনেকাংশে দেবভাবাপন্ন অর্থাৎ দেবপথের

পিতৃগণ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত-সপ্তগণে ও তর্পণের প্রধান মন্ত্রে স্পষ্টই দেখিতে

অমূর্ত্ত ও অপরগুলি সমূর্ত্ত। ক 'দেবপথের পথিক' বলা হইয়াছে।

অমূর্ত্তা মূর্ত্তিমন্তশ্চ পি াসো অগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দ্দেবযানৈঃ।

অমূর্ত্ত কাহারা অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ তৃগণ তোমরা দেবযান পথ দিয়া এখানে

সুভাস্বরা বর্হিষদ অ ক্তির দ্বারাও আমাদের কথা বিশেষরূপে সম-

ত্রয়োমূর্ত্তি বিহীনা

" ত পিতৃগণকে "দিব্য পিতৃগণ" নামে অভিহিত

ইহারা অমূর্ত্ত কেন না অ

তাঁহাদিগের মূর্ত্তি লোকের স্মৃতি

আদিম কালে সম্ভবতঃ দেবযু ং নলং সোমং যমমর্যমণং তথা

প্রভৃতি পিতৃগণকে দেবগণের ত্তাঃ সোমপাশ্চ তথা বর্হিষদঃ পিতৃন্॥

"াজ্জীবপিতৃক এতান্ দিব্যান্ পিতৃংস্তথা।

সোমপা, আজ্যপা ভ্যা বাপি পিতা দদ্যাৎ তেভ্যো বাপি প্রদাপয়েৎ॥

অভ্যুদয় দেবযুগের জীবিত থাকেন তাহা হইলে কব্যবাল, নল, সোম, যম,

লোকের স্মৃতিপথে গ্নিষ্বাত্ত, সোমপ ও বর্হিষদ এই সকল দিব্য পিতৃগণের উদ্দেশে

বৈশ্যাদি বর্ণ বিভাগ।"

ণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ
নাম শূদ্রাণান্ত সুকালিনঃ।

আমাদের বড় ইচ্ছা যে তুমি পিতৃগণ
পিতৃগণকে ) তর্পণে দেয় জলপানার্থ

ভৃতি পিতৃগণের উল্লেখ দেখা যায় বটে
ষ্ট বিভাগ দেখা যায় না। মনুসং-

অঙ্গিরা, অথর্ব্বা ও ভৃগু এই তিন
দায়ভুক্ত ছিলেন। ঋগ্বেদে আছে—

অংগিরসো নঃ পিতরো নবগ্ব

মন ভারতীয় আর্য্যজাতির মধ্যে বর্ণ ও
ইরূপ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিভাগ-

"অঙ্গিরা নামক, অথর্ব্বা নামক এবং
গণ এইমাত্র আসিয়াছেন তাঁহারা সোম
বশিষ্ঠ প্রভৃতি অন্যান্য ঋষি মুনিদিগের
ছিলেন। ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি হইয়া ক্র
ছিল। মনু বলিয়াছেন—

সুগতিপ্রাপ্ত ও দেবত্বপ্রাপ্ত পিতৃগণের
গ্রন্থসমূহে দেখা যায় ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র
বং বৈশ্যের ও শূদ্রের স্বতন্ত্র পিতৃগণ,
বামুন, সুবর্ণবণিকের স্বতন্ত্র বামুন

য এতে তু গণা মুখ্যাঃ
তেষামপীহ বিজ্ঞেয়ং প

ণের বিষয় এক স্থলে দৃষ্ট হয়, যথা—
সোনূহিরে সোমপীথং বশিষ্ঠাঃ।

"প্রধান সপ্ত পিতৃগণের অনন্ত পুত্র
এই পিতৃকুল সমূহ হইতে অনেকানে
অগ্নির মাহাত্ম্য ও প্রভাব বিস্তার করিয়া
অগ্নি ঋষিদিগের উৎপাদক তাহা আমর
করিয়া আসিয়াছি। অথর্ব্বারও সম্বন্ধে ঋ
অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন এই অগ্নি সর্ব্ব
যজ্ঞকর্ত্তার দূতস্বরূপ হইয়া দেবতাদিগে
প্রিয়পাত্র।" †

পিতৃগণ যথা নিয়মে সোমপান করিয়া-

ন্দ্রেণ রদবৈঃ সরথং দধানাঃ
ঃ পূর্বৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥

াদিগের সঙ্গে একত্র হোমের দ্রব্য
করথে আরোহণ করেন। হে
নুষ্ঠানকারী, প্রাচীন ও আধুনিক

আমাদের শিবও পিতৃসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত
বিবাহ করিয়াছেন সেই হিমালয়পত্নী মেনকা সোম

ঃ পিতর এহ গচ্ছত সদসদঃ

এষবৈ প্রথমঃসর্গ সোমপানাং মহা
এতেষাং মানসী কন্যা মেনানাম মহা
পত্নী হিমবতঃ শ্রেষ্ঠা যস্যা মৈনাক উচ

রা এইস্থানে আগমন কর,

জুষধ্বং।

* ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৪ সূক্ত।
† ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ২২ সূক্ত।
‡ হরিবংশ অষ্টাদশ অধ্যায়।



"হে বর্হিষদ পিতৃগণ! এক্ষণে আমাদিগকে আশ্রয় দাও; তোমাদের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি, ভোগ কর।"

ঋগ্বেদের উল্লিখিত অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ অধিকাংশই দেবযুগের অর্থাৎ বেদোক্ত ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রায় সমসাময়িক। এই পিতৃগণ অতি প্রাচীন কালে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া বর্হিষদ, অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি তিনটী পিতৃগণ অমূর্ত্ত এবং দেবগণের পিতৃগণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে পাঠক বুঝিলেন যে মনু প্রভৃতি সংহিতাকারেরা পিতৃগণের তিনটী শাখাকে 'মূর্ত্তিবিহীন' 'মূর্ত্তিহীনাস্ত্রয়শ্চৈষাং' এবং 'দেবগণের পিতৃগণ' 'অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ দেবানাং' কেন বলিয়াছেন। অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি পিতৃগণ যে 'দেবগণের পিতৃগণ' বলা হইয়াছে তাহার ইহা অর্থ নয় যে তাঁহারা সেই ইন্দ্রাদি আদি দেবগণের জনক। প্রত্যুত তাহার ইহাই অর্থ যে অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি পিতৃগণ দেবগণের প্রায় সমসাময়িক এবং তাঁহারা অনেকাংশে দেবভাবাপন্ন অর্থাৎ দেবপথের পথিক ছিলেন। তাই আমরা শ্রাদ্ধ ও তর্পণের প্রধান মন্ত্রে স্পষ্টই দেখিতে পাই যে অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি পিতৃগণকে 'দেবপথের পথিক' বলা হইয়াছে।

আয়ান্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসো অগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ।

"হে সোমপ অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ তোমরা দেবযান পথ দিয়া এখানে আইস।" যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির দ্বারাও আমাদের কথা বিশেষরূপে সমর্থিত হইয়াছে।

তিনি অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি পিতৃগণকে "দিব্য পিতৃগণ" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

কব্যবালং নলং সোমং যমমর্যমণং তথা
অগ্নিষ্বাত্তাঃ সোমপাশ্চ তথা বর্হিষদঃ পিতৃন্॥
যদি স্যাজ্জীবপিতৃক এতান্ দিব্যান্ পিতৃংস্তথা।
যেভ্যো বাপি পিতা দদ্যাৎ তেভ্যো বাপি প্রদাপয়েৎ॥

"যদি পিতা জীবিত থাকেন তাহা হইলে কব্যবাল, নল, সোম, যম, অর্যমা, এবং অগ্নিষ্বাত্ত, সোমপ ও বর্হিষদ এই সকল দিব্য পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিবে।"

আমরা এতক্ষণ দেখাইলাম ভারতের পিতৃগণ কাহারা ছিলেন। কিন্তু এই পিতৃগণের 'পিতা' উপাধি হওয়ায় প্রকৃত ইতিহাস ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। কালে গৃহের পিতৃপিতামহ ও পিতৃগণের একত্ব বিধান ঘটিয়াছে। যেখানে বেদে ও পুরাণে পিতৃগণের উল্লেখ আছে সেখানে ভারতবাসীরা গৃহের মৃত পিতৃগণের প্রেতাত্মার আরোপ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকেন।

গৃহের পিতার সঙ্গে বস্তুতঃ পিতৃগণের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য আছে এবং সেই কারণে এরূপ গোলোযোগ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। পূর্ব্বে যেমন দেখইয়া আসিলাম পিতৃগণ অমূর্ত্ত ও মূর্ত্তিমন্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত। গৃহের পিতৃপিতামহগণও সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত দুই ভাগে বিভক্ত।

নান্দীমুখাস্ত্বমূর্ত্তাস্তু মূর্ত্তিমন্তোঽথ পার্ব্বণাঃ।

(হেমাদ্রিধৃত ব্রহ্মপুরাণ)

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
ত্রয়োঽশ্রুমুখাহ্যেতে পিতরঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
তেভ্যঃ পূর্ব্বতরা যে চ প্রজাবন্তঃ সুখোচিতাঃ।
তেতুনান্দীমুখাঃ, নান্দী সমৃদ্ধিরিতি কথ্যতে।

(গোভিল গৃহ্যসূত্র ভাষ্যেধৃত ব্রহ্মপুরাণ)

"ইহার ভাবার্থ এই যে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ইহাঁরা 'অশ্রুমুখ' পিতা নামে পরিকীর্ত্তিত। ইহারা সমূর্ত্ত, কেননা পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ আমাদের সচরাচর স্মৃতির বিষয়ীভূত থাকেন, তাঁহাদের মূর্ত্তি আমাদের মনে সদা জাগরূক থাকে। তাঁহাদের কথা মনে পড়িলে সহজেই আমাদের নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হয় তাই ইহাদিগকে "অশ্রুমুখ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রপিতামহের পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহারা অমূর্ত্ত এবং নান্দীমুখ অর্থাৎ তাঁহাদিগের মূর্ত্তি স্মৃতির অবিষয়ীভূত এবং তাঁহাদিগের কথা মনে পড়িলে শোক দূরে থাক্ বরঞ্চ আনন্দ হয়। আনন্দ কিসে না তাঁহাদিগের বংশাবলী এখনও সংসারে বিচরণ করিয়া লোকোপকার করিতেছে। তাই বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি শুভকর্ম্মে আনন্দের জন্য হিন্দুদিগের নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই গৃহের পিতৃ পিতামহের সহিত পিতৃগণের কোন সম্বন্ধই নাই। কেবল উভয়ের মধ্যেই পিতৃভাব সাধারণভাবে বিরাজ করিতেছে বলিয়া উভয়েই পিতৃনামের অধিকারী হইয়াছেন। এই পিতৃভাবের কারণে গৃহের পিতা যেমন পুত্র পৌত্রাদির নিকট শ্রদ্ধার পাত্র সেইরূপ পিতৃগণও স্বদেশরূপ পিতৃগৃহে (home) সমগ্র জনসমাজের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র।



আমরা এতক্ষণ দেখাইয়া আসিলাম যে সোমপ অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি পিতৃগণ গৃহের মৃত পিতৃগণের প্রেতাত্মা মাত্র নহে। জগতের এবং ভারতের ইতিহাসে তাঁহাদিগের যথেষ্ট স্থান আছে। তাঁহারা এককালে এই ভারতে ঋষিবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া লোকপালনাদি নানা সৎকার্য্যের দ্বারা পিতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিজ্ঞানে আয়ুর্ব্বেদে ওষধিতত্ত্বে যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া শুদ্ধ ভারতবাসী কেন সমগ্র জগতবাসীকে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন। সে ঋণ হইতে ভারতবাসীরা কিসে মুক্ত হইবেন? ভারতবাসীরা যদি পিতৃগণের অনুসারী হইয়া বিজ্ঞানচর্চ্চা, অন্নবিতরণ, ঔষধদান প্রভৃতি দ্বারা প্রজাপালন করেন তবেই দেশের মঙ্গল ও জগতের মঙ্গল এবং তখনই স্বর্গবাসী পিতৃগণ তৃপ্ত হইবেন এবং সেই সঙ্গে ভারতবাসী পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবেন। এই মহামারী ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে এক্ষণে পিতৃআদর্শে চলিতে না পারিলে মঙ্গল নাই। সব জিনিষ যেমন কালক্রমে অপভ্রংশ আকার প্রাপ্ত হয়, পিতৃভাবও সেইরূপ অপভ্রংশাকারে ভারতে এক্ষণে বিদ্যমান নাই যে তাহা নহে। পিতৃভাবের অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধ শ্রমণেরা এককালে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা পিতৃভাব, পিতৃস্থান প্রভৃতি সকল বিষয়েই পিতৃগণেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। পিতৃতীর্থ গয়া বৌদ্ধতীর্থও বটে। পিতৃস্থান বিহার প্রদেশ বৌদ্ধ বিহারে পরিণত। এমন কি বৌদ্ধধর্ম্মে পিতৃভাবের বড়ই মেশামেশি দেখা যায়। পিতৃপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের একটী বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু পিতৃগণ বৌদ্ধগণের অপেক্ষা জ্ঞানে, গুণে ও নানা বিদ্যায় অনেকাংশে উন্নত ছিলেন। অধুনাকালে এই ভারতবর্ষে পিতৃগণের যে পদচিহ্ন আছে তাহা অতি যৎসামান্য। আজকাল যে সাধু সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দেখা যায় তাহাতে পিতৃভাবের সামান্য লক্ষণ মাত্র দৃষ্ট হয়। পিতৃপথানুযায়ী হইয়া সাধু সন্ন্যাসীরা লোকোপকারের জন্য একটু টুট্‌কা টাটকা ঔষধাদি জানিয়া রাখেন, কখনও কখনও অন্ন বিতরণ ও যাগযজ্ঞ করেন এবং কখন বা হঠযোগাদির অভ্যাসে নিরত থাকেন। তাই

সাধু সন্ন্যাসীদিগকে লোকে বাবা বা বাবাজী বলিয়া থাকে। যাহার নাম পিতা তাহারই নাম বাবা। কিন্তু প্রাচীনকালে পিতৃগণ যে পিতৃভাবে মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহার শতাংশের একাংশও আধুনিক প্রকৃত সাধুবৃন্দের মধ্যে বিরল। পিতৃগণের অনন্ত পুত্র পৌত্রক এককালে দেশ বিদেশে—আসিয়া ও য়ুরোপ প্রভৃতি ভূখণ্ডের নানাস্থানে পিতৃধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহাদিগের বংশধরেরা সেই সকল স্থানে পিতৃ নামের ও পিতৃভাবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জগতে অক্ষয়পদ লাভ করিতেছেন।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# সুরভি।

এত শীঘ্র, এত অকস্মাৎ!
ছোট হাসি ছোট প্রাণ হয়ে গেলি অবসান,
লয়ে গেলি তব সাথ সাথ,
বাপের সকল শান্তি মায়ের সকল সুখ
ভেঙ্গে দিয়ে গেলি স্বজনের স্নেহভরা বুক,
দৈবের একি অভিসম্পাৎ,
এত শীঘ্র, এত অকস্মাৎ!

ফুটিল না তব মধুভাষা,
মিটিল না কোন সুপ্ত আশা,
কোমল হৃদয় পুটে তব
জাগিল না তব ভালবাসা।
কেন খেলা না করিয়া শেষ
গেলে ছাড়ি জীবনের দেশ
না যদি লভিবে পরিণাম,
কেন হেন সুন্দর উন্মেষ!

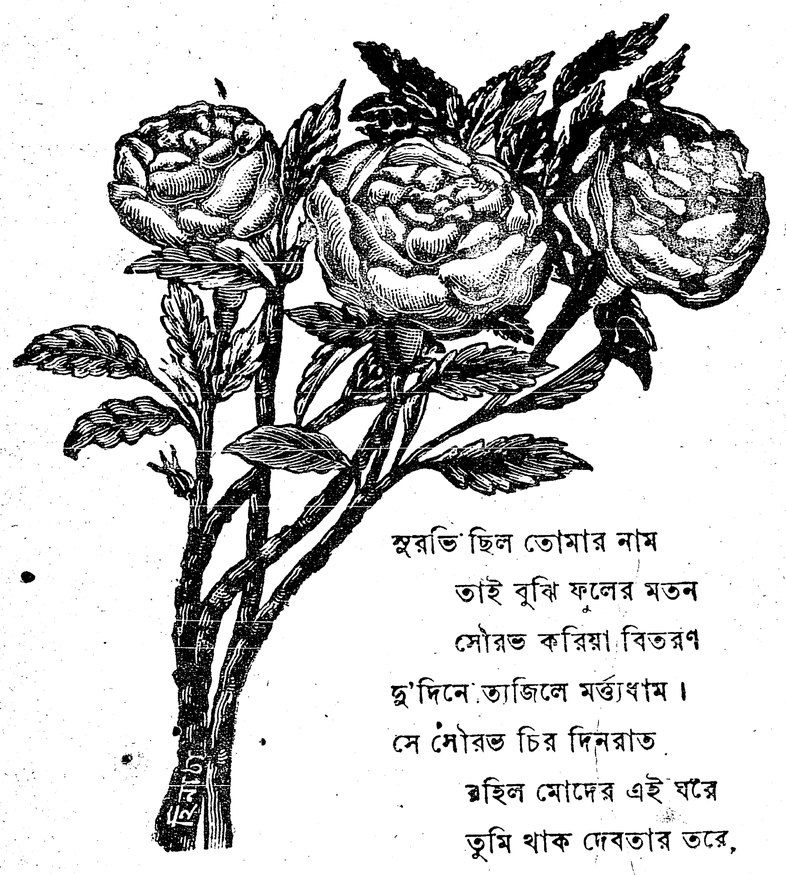

সুরভি ছিল তোমার নাম
তাই বুঝি ফুলের মতন
সৌরভ করিয়া বিতরণ
দু'দিনে ত্যজিলে মর্ত্ত্যধাম।
সে সৌরভ চির দিনরাত
রহিল মোদের এই ঘরে
তুমি থাক দেবতার তরে,
অমর অমল পারিজাত!

সুরভি ছিল তোমার নাম
তাই বুঝি ফুলের মতন
সৌরভ করিয়া বিতরণ
দু'দিনে ত্যজিলে মর্ত্ত্যধাম।
সে সৌরভ চির দিনরাত
রহিল মোদের এই ঘরে
তুমি থাক দেবতার তরে,
অমর অমল পারিজাত!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

---

# রঞ্জিৎ দীঘীর পুরাবৃত্ত।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী জাহানাবাদ বিভাগ মধ্যে নিজ জাহানাবাদের পূর্ব্ব দক্ষিণ দুই ক্রোশান্তরে যে একটী সুবিস্তীর্ণ দীঘী রহিয়াছে, সার্দ্ধ শতবর্ষের অধিক হইবে, রণজিৎ রায় কর্ত্তৃক ঐ দীঘীটী খাত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া তন্নামানুসারে ইহাকে রঞ্জিৎ দীঘী বলিয়া থাকে।

রঞ্জিৎ রায় জাতিতে সদ্গোপ ও অতি বলিষ্ঠকায় পুরুষ ছিলেন। জেলা মানভূমের অন্তর্গত ফুলকুসুমা গ্রামের নিকট 'বাঁধা' নামক গ্রামে তাঁহার পৈতৃক বাস ছিল। তাঁহার পিতার নাম,—নরনারায়ণ, এবং তাঁহার (রঞ্জিতের) আদি নাম রাজীব রায়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁ যখন—আপনার নামানুসারে মুরসিদাবাদ স্থাপন করিয়া এবং তৎস্থানে নবাবি পদে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে রাজীব পূর্ব্বোক্ত নবাব সাহেব কর্ত্তৃক সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী ভঞ্জভূম পরগণাস্থিত আওয়াশ গড়ের রাজ্য আয়ত্ত ও শাসন করিতে নিযুক্ত হয়েন।

ঐ নিয়োগানুসারে, রাজীব বিস্তর লোক লস্কর সমভিব্যহারে যুদ্ধ সজ্জায় আওয়াশে পৌঁছিয়া তত্রস্থ ভূয়্যাঁ রাজার গড় আক্রমণ ও ঐ রাজার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। এবং পরিশেষে যুদ্ধে জয়লাভ হইলে রাজাকে আবদ্ধ

এবং তাহার ধনাগার প্রভৃতি লুঠ করিয়া সেইস্থানে জয়পতাকা উড্ডীন পূর্ব্বক সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ পৌছিয়া নবাবসন্নিধানে উপস্থিত হয়েন।

আওয়াশ রাজ্য লুণ্ঠন করিবার সময় তত্রস্থ দেবালয় মধ্যে শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ ও শ্রীশ্রী৺ভগবতী এই দুই পাষাণ মূর্ত্তি দেবদেবী তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। ইঁহারা হিন্দুদিগের পূজ্য দেবতা বলিয়া রাজীব, সেগুলি নবাব সাহেবকে না দিয়া অন্যান্য যাবতীয় লুঠের সম্পত্তি নবাব সাহেবকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়া প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।

নবাব সাহেব, রাজীবকেও তেজস্বিতা ক্ষিপ্রকারিতা, বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ও অতি কার্য্যকুশল বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত সন্তোষের সহিত রাজীব নামের পরিবর্ত্তে তাঁহার নাম রণজিৎ রাখিয়া পুরস্কার স্বরূপ একটী বর্ষা ( বড়শা বা বল্লম ) প্রদান করিয়াছিলেন। এবং ঐ বড়শা প্রদানকালে, আদেশ কবিয়াছিলেন যে "রণজিৎ! তুমি এই বড়শা যেস্থানে স্থাপন করিবে, সেই স্থানের তিন ক্রোশ মধ্যে যতই গ্রাম ও যতই ভুমি থাকুক, জায়গীর স্বরূপ তোমার অধিকার ভুক্ত হইবে এবং উহা নিষ্কর হইবে।

রাজীব, নবাব সাহেব কর্ত্তৃক রণজিৎ নাম এবং বর্ষা প্রাপ্ত হইয়া জাহানা-বাদ প্রদেশ মধ্যে একটী নির্জ্জন স্থানে ঐ বর্ষা গাড়িয়া ছিলেন। রণজিৎ ঐ স্থানকে বায়ড়া পরগণা নাম দিয়া আপনার ভবনের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন ও ঐ পরিখার অভ্যন্তরে শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী নামে আর একটী দেবী মূর্ত্তি প্রকাশ ও স্থাপন করণানন্তর বহু অর্থ ব্যয়ে ঐ দীঘীর পত্তন, খনন ও স্থানে স্থানে জনপদ স্থাপন করিয়া ৩৬০ মৌজার স্বামী হইয়া ঐ প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রণজিতের একটী মাত্র কুমারী নামে কন্যা ও অচ্যুতানন্দ রায় নামে পুত্র ছিল।

প্রবাদ আছে যে, বিক্রমপুরের বিশালাক্ষী দেবী তাঁহার সেই কন্যার রূপ ধারণ করিয়া ডিহি বায়ড়ার কাছারিতে এক এক সময় রণজিতের নিকটে গিয়া নানা কৌতুক করিতেন, এবং বালস্বভাবে রণজিৎকে বলিতেন, "বাবা! আমি এখন তোমার ঘরে আছি, তুমি আমাকে যখন কোথাও যাইতে বলিবে আমি তখনই যাইব।" পরন্তু, বালিকা উক্তি বলিয়া রণজিৎ তৎসময়ে সে কথার ভাব সংগ্রহ করিতেন না।



একদা, রণজিতের ঐ কুমারীকন্যা, শ্বশুরালয়ে যাইবার জন্য সুসজ্জিত হইয়া অন্যান্য স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছে, এমন সময়ে ঐ অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁহার কন্যারূপ ধারণ করিয়া রণজিতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমীপে এই বলিয়া বিদায় প্রার্থনা করেন যে, 'বাবা! তবে আমি যাই' সুতরাং রণজিৎ কন্যাজ্ঞানে "যাও" এই বলিয়া উত্তর ও বিদায় দান করিয়াছিলেন।

দেবী রণজিতের নিকট এইরূপে বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই বেশে উক্ত দীঘীর ঘাটে গিয়া উপনীত হন। ঐ সময় জনৈক শঙ্খ বণিক শঙ্খ বিক্রয় হেতু অন্যত্র গমন করিতেছিল, দেবী তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যে "অহে! বণিক, আমি রণজিতের কন্যা, আমাকে শঙ্খ দাও, তোমার শঙ্খের মূল্য যত হইবে আমার পিতার দক্ষিণদ্বারি ঘরের কোলঙ্গায় টাকা আছে, পিতার নিকট চাহিবামাত্র পাইবে।"

বণিক, তদনুসারে অন্তঃকরণে অণুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, তাঁহার রূপলাবণ্য দৃষ্টে পুলকিত হইয়া শঙ্খের মূল্য ৫৲ টাকা অবধারণ পূর্ব্বক তাঁহার দুই হস্তে শঙ্খ পরাইয়া দিয়াছিলেন। দেবী, এইরূপে বণিকের নিকট হইতে শঙ্খ পরিধান করিয়া অবগাহনার্থে জলে নামিলে, বণিক সেই অবস্থা অবলোকন করিয়া রণজিতের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে প্রাগুক্ত ঘটনা বর্ণন করিয়া শঙ্খের মূল্যের নিমিত্ত প্রার্থী হয়। রণজিৎ তৎশ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গৃহে গমন করিয়া দেখেন, বাস্তবিক, কোলুঙ্গী মধ্যে টাকা আছে।

তদ্দৃষ্টে আরো বিস্মিত হইয়া সহসা সেই টাকা বণিককে না দিয়া বণি-ককে বলিয়াছিলেন যে, তুমি যে পর্য্যন্ত সেই কন্যাকে আমাকে না দেখাইবে, সে পর্য্যন্ত টাকা পাইবে না। যদি তাহাকে দেখাইতে না পার, প্রতারক বলিয়া তোমাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিব। সুতরাং রণজিতের এই উক্তিতে বণিক অত্যন্ত ভীত হইয়া ম্লান বদনে রণজিৎকে সঙ্গে লইয়া দীঘীর ঘাটে গিয়া উপনীত হয়।

বস্তুতঃ সেই কন্যাকে তথায় না দেখিয়া, দেবী, যে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া শঙ্খ পরিধান করিয়াছিলেন, কেবল সেই স্থানটী কিঞ্চিৎ নিম্ন হইয়াছে, এই মাত্র নিদর্শন দেখিয়া ও দেখাইয়া রণজিতের তাড়ণার ভয়ে বণিক কম্পান্বিত কলেবরে এবং উচ্চৈঃস্বরে, মা! মা! মা, কোথায় গো? বলিয়া রোদন

করাতে দেবী, ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দীঘীর মধ্যভাগে গভীর জল হইতে দুইটী হস্ত উত্তোলন করিয়া শঙ্খ দেখাইলে রণজিৎ তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ ও দেবী বিরহে সেইস্থানে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎকালে বণিকেরও জ্ঞানোদয় ও চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল।

সেই সময় হইতে প্রতি বৎসর চৈত্র, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, বারুণী উপলক্ষে ঐ দীঘীতে একদিন মাত্র মেলা ও ঐ মেলাতে নানা প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় ও বহু লোকের সমাগম হয়। ঐ দীঘীর উত্তরাংশে দেড় ক্রোশ অন্তরে "গড়বাড়ি" নামক স্থানে এ পর্য্যন্ত রণজিতের ভদ্রাসনের চতুর্দ্দিকে সামান্য পরিখা ও বাঁশ জঙ্গল, ও তন্মধ্যে তদ্বংশীয় দিগের বাস ও দুর্গা দীঘী ও দো সতিনের দীঘী প্রভৃতি রণজিতের আরো ৪।৫টী কীর্ত্তি প্রকাশ আছে।

পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে যে, তাঁহার বংশীয়গণ কেহই যত্ন করিয়া সেই রণজিতের কীর্ত্তি কলাপের বিষয় কিছুই লিখিয়া রাখেন নাই। রণজিতের মৃত্যুর পর মুরশিদাবাদের অন্যতম নবাবের জনৈক ক্রোক সাঁজওয়ালের সহিত অচ্যুতরায়ের বিশেষ মনান্তর হওয়ায় তৎকারণ বশতঃ অনেক ভূম্যাদি নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। যদুনাথ রায় নামে রণজিতের জনৈক বংশধর ঐ সাঁজওয়ালের মস্তক ছেদন করিয়া ও সেই অপরাধে পলাইয়া বর্গড়ি পরগণার কাদড়া গ্রামে বাস করে। গড়বাড়ীতে এক্ষণে যাঁহারা বাস করিতেছেন, আমি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের প্রমুখাৎ যে সকল কথা অবগত হইয়াছি, সে সকল কথার ভিতরে এমন কোন ঘটনা, ও এমন কোন কীর্ত্তি নাই, যদ্দ্বারা ভূতপূর্ব্ব কথা শুনিবার নিমিত্ত ব্যক্তিনিচয়ের স্পৃহা বলবতী হইতে পারে। তজ্জন্য বিশেষতঃ প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে, সে সকল বিষয় পরিহার করিতে হইল। তৎপ্রযুক্ত রণজিতের বিদ্যমান বংশজেরা ক্ষুব্ধ না হইয়া যেন আমার সেই দোষ পরিমার্জ্জনা করেন।

শ্রীহারাধন দত্ত।

---

# গান।

এই বিশাল জগতের অন্তরতম প্রদেশ হইতে যে সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হইয়া সমস্ত জগতের প্রাণের মধ্যে শান্তি ছড়াইতেছে—যে মহান্ ছন্দে গ্রথিত হইয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রেরা নীরবে নিঃশব্দে নিজের কার্য্য করিয়া চলিয়াছে, সেই শান্তিময়ী ছন্দোময়ী ধ্বনির নামই গান। জগতের প্রাণের রুদ্ধ উৎস টুটিয়া যে আনন্দ হিল্লোল তাহার মরমে আসিয়া আঘাত করে এবং মরমের সমস্ত তন্ত্রীগুলি সুরলয়তানে বাজিয়া উঠে, সেই আনন্দ হিল্লোলের ঘাত প্রতিঘাত ধ্বনিই আমাদের সুরলয় তান যুক্ত ছন্দ—আমাদের প্রাণের প্রাণ সঙ্গীত। এই মহান্ ঘাত প্রতিঘাতের প্রতিধ্বনি মানবের কণ্ঠে গিয়া আঘাত করে; এই জন্যই শুধু মনুষ্য সঙ্গীতের মর্ম্ম কতকটা বুঝিতে পারে—জগতের মহান্ সঙ্গীতের সামান্য অনুকরণ করিয়াও সুখী হয়।

মরমের লুকান প্রদেশ হইতে গানের উৎপত্তি, শ্মশানের গম্ভীর ছায়ায় তাহার কায়া, এবং চিরশান্তির অনন্ত আশ্রয়ে তাহার বৃদ্ধি। দূর স্বপনের মত প্রাণের পরে সে একবার যে পদচিহ্নগুলি ফেলিয়া যায় ইহজন্মে তাহা আর মুছে না—সে সুধামাখা রেখাগুলি চিরদিনের জন্য স্মৃতির জীবন্ত ছায়ার মধ্যে অন্ততঃ অস্ফুট আকারেও বিরাজ করিতে থাকে। চারিদিক হইতে শত সহস্র ছোট বড় বিস্মৃতি তাহাদের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে; কিন্তু স্তম্ভিত হৃদয়ের মত এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না।

আমরা সামান্য মনুষ্য—ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে আমরা সকল জিনিষকেই কতকটা বাঁধিয়া রাখিতে যাই। মহত্ত্বের বন্ধন নাই—আঁটা-আঁটি বাঁধাবাঁধি সীমার ভাবে মহত্ত্বের কায়া কলঙ্কিত নহে। অসীম ভাবের অসীম ক্ষেত্র। কিন্তু আমরা এমনি নির্ব্বোধ যে, এই অসীম ক্ষেত্রকে পর্য্যন্ত বদ্ধ করিতে পারিলে —একটা সীমানা দিয়া ঘর বাড়ী তুলিয়া প্রাচীর গাঁথিয়া এই অসীম ক্ষেত্রের মুক্ত বায়ুকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইলে, আপনাদিগকে পরম পণ্ডিত বলিয়া মনে করি। গান পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া—তারকাখচিত নীল নভোমণ্ডলের দিগন্তব্যাপী ক্ষেত্রকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া অনেক দূর উঠিয়াছে।

আমাদের পৃথিবীর দুই চারিটা 'সা-রে-গা-মা'র মধ্যে সে কখনই বদ্ধ নহে। কতকগুলা কটমট কথার মধ্যে তাহার ভাবকে কিছুতেই আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। গান স্বাভাবিক সরল জ্যোৎস্নাময়ী। তাহার অনন্ত উচ্ছাস অনন্ত প্রাণ। তর্কের দুয়ারে আজীবন হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিলেও তাহাকে আয়ত্ত করা যায় না। ভাবের দুয়ার, প্রাণের দুয়ার প্রশস্ত করা চাই খুলিয়া রাখা চাই তবে গান আমাদের প্রাণে পঁহুছাইবে। প্রাণেই গানের প্রতিধ্বনি শুনা যায়। হৃদয় সেই প্রতিধ্বনিকে ধরিয়া রাখিতে চায়।

গান এ জগতের সামগ্রী নহে—পার্থিব ধূলি কণায় তাহার দেহ মলিন নহে। সে কোন জ্যোৎস্নার দেশ হইতে আসিয়াছে। নয়ত তাহার প্রাণ জ্যোৎস্নাময়ী স্বপ্নময়ী হইল কেন? অনন্তত্বের ছায়াই গানের প্রাণ। সে শুষ্ক ধরণীতে শুধু শান্তি ছড়াইতেই আসিয়াছে—ধরণীর কঠিন বক্ষকে শ্যামল ভাবে গঠিত করিতে আসিয়াছে—জীর্ণ প্রাণের জীর্ণ কক্ষে এক ফোঁটা মৃত সঞ্জীবনী আনিয়া দিয়া মরণের প্রজাকে জমিদারের অত্যাচার হইতে মুক্তি দিতে আসিয়াছে।

কবিত্ব এই মহান্ গানের ছায়া। কবিত্বের জ্যোৎস্নালোকে এই মহান্ সঙ্গীত ফুটিয়া উঠে। স্তব্ধ জগতের নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া এই গানের হিল্লোল যখন প্রাণে আসিয়া আঘাত করে, তখন প্রাণের বেলাভূমি সেই তরঙ্গাঘাতে টুটিয়া গিয়া তাহার কোলে চিরজনমের তরে মিলাইয়া যায়—আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ লোভ মোহ তাহার গভীর অতলস্পর্শ জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়া চিরদিনের মত আমাদিগকে পরাধীনতার কঠোর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া যায়।

এ মহান্ গান শুনিতে হইলে সংসারের পরপারে যে এক বিস্তৃত "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা" ভূমি পড়িয়া আছে সেই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের এক প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইতে হয়। সেখানে দাঁড়াইলে জগতের মহান্ গীতধ্বনি আমাদের মরমের অভ্যন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়—আমাদের হৃদয়ের চিরশান্তিময় নিভৃত আবাসে গিয়া পঁহুছায় এবং ক্ষুদ্র প্রাণে মহত্ত্বের সঞ্চার করিয়া দেয়। পার্থিব কোলাহলের মধ্যে অন্যমনস্ক থাকিলে এ ধ্বনি শুনিব কিরূপে? পৃথিবীর ধূলায় প্রাণের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে সে প্রাণে পঁহুছিবে কিরূপে?

হৃদয়ের নীরব অশ্রুজলের মধ্যে জগতের মহান্ অশ্রুজলের যে শুভ্র হাসির



ছায়া পড়ে সেই ছায়ায় বিশ্বের এই অমর গান সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণে এই অশ্রুজলের মধ্য দিয়াই তাহার অনন্ত ভাব আসিয়া আঘাত করে। আমরা সে অনন্ত ভাব অনেক সময় ধরিতে না ধরিতেই তাহা মিলাইয়া যায়; কিন্তু তাহার শুভ্র পদচিহ্নগুলি ইহ জনমের মত আমাদের হৃদয়ের প্রশস্ত দুয়ারে বসিয়া যায়—আমাদের হৃদয়ের বদ্ধ বায়ুতে মলয়ানিল আনিয়া দিয়া আমাদিগকে মহত্ত্বের দিকে কতকটা আকৃষ্ট করে।

এই মহান্ গানের মহদ্ভাব অশ্রুজল ভিন্ন আর কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। আর কিছুই তাহার গভীর তলে ডুবিতে পারে না। এক ফোঁটা অশ্রুজল এতদূর গভীর যে তাহার মধ্যে জগতের এই মহান্ গানও প্রস্ফুটিত হয়। আমরা অশ্রুজলকে নিতান্ত 'কিছুই না' মনে করি—তাহার গভীরতা না বুঝিয়া তাহাকে এক ফোঁটা বলিয়া উপেক্ষা করি। কিন্তু ইহা আমাদের অতিশয় ভ্রম। এক ফোঁটা অশ্রুজলের মধ্যে শত শত বৃহৎ সাম্রাজ্যের চিরদিনের মত সমাধি হইতে পারে—এক বিন্দু অশ্রুবারির তোড়ে শত সহস্র যৌবনের দম্ভ অহঙ্কার অভিমান চূর্ণ চূর্ণ হইয়া যায়। বাঁধ বাঁধিয়া মনুষ্য কিছুতেই অশ্রুজলকে বাধা দিতে পারে না—সীমানা দিয়া আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে না। সে অসীম বলিয়াই তাহাতে অসীম গানের ছবি ফুটিয়া উঠে। গান সসীমের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইতে পারে না।

আমরা যখন ক্রমাগত সুখের সময় দুঃখের সময় সম্পদে বিপদে এই সুধাময় সঙ্গীত শুনিতে থাকিব তখনই জানিব আত্মার অনন্ত উচ্ছাস কোথায়। তখন আমাদের চারিদিকে শান্তি চারিদিকে শুধু অনন্ত আনন্দ। তখন,

"চারিদিকে সৌরভ, চারিদিকে গীতরব
চারিদিকে সুখ আর হাসি,
চারিদিকে শিশুগুলি মুখে আধ আধ বুলি
চারিদিকে স্নেহ প্রেম রাশি!"

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# বাল্য বিবাহের অশুভ ফল।

নিউ ইয়র্ক নগরের স্বাস্থ্যাধ্যক্ষ ডাক্তার সাইবস্ এড্‌সন এই বিষয়ের কতকগুলি গুরুতর তথ্য "নর্থ আমেরিকান্ রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, সন্তানের বিকৃতি-লক্ষণ সকল প্রায়ই মাতার দিক্ দিয়া আইসে। তিনি বলেন ;—"যদি সন্তান-প্রসবের সময় মাতা সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট কিম্বা তাহার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে গঠিত না হয়, তবে সম্ভবতঃ সন্তান কখনই সম্পূর্ণ পরিপুষ্টতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। নৈতিক হিসাবেই বল, আর দৈহিক হিসাবেই বল, সে চিরকাল ক্ষীণজীবী হইয়া থাকে। সাধারণের মধ্যে ইহা একটি জানা শুনা কথা যে, অল্প বয়স্ক পিতামাতা অপেক্ষা পূর্ণবয়স্ক পিতামাতাদিগের সন্তান বিজ্ঞতর ও উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে।

অধিকাংশ বালিকা ১৭ বৎসরের পর আর বাড়ে না, এই বয়সের পর হইতেই প্রসূতি-কষ্ট সহনোপযোগী বল তাহারা সঞ্চয় করিতে থাকে। সুতরাং, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই বল সঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই যদি বিবাহ হয়, তবে প্রসূতি-কষ্ট সহ্য করিবার সামর্থ্য আর থাকে না। সন্তান প্রসবের খাতিরে মাতাকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ে আমেরিকার স্ত্রীলোকদিগের অতিরিক্ত খাটুনি এবং আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে—সুতরাং খুব সম্ভব, উহারা আত্মরক্ষণ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বাল্যবিবাহে সহজে সম্মত হইবে না। লেখক ডাক্তার কোরোসিয় প্রকাশিত তথ্য-তালিকা উদ্ধৃত করিয়া এইরূপে বলেন ;—"ত্রিশ বৎসর বয়স্ক মাতাদিগের প্রসূত সন্তানের, দুর্ব্বলতা ঘটিত রোগে যে মৃত্যুর হার, ২০ বৎসর বয়স্ক মাতাদিগের প্রসূত সন্তানের দুর্ব্বলতা ঘটিত রোগে মৃত্যুর হার—প্রায় তাহার দ্বিগুণ। গবেষণার দ্বারা ইহাও নির্ণীত হইয়াছে যে, ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীলোক, ৩০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সহিত বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়া, যে সকল সন্তান প্রসব করে উহারা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ। যেস্থলে স্বামী কিম্বা স্ত্রীর বয়স ২০ বৎসরের কম, সেস্থলে সন্তান প্রায়ই দুর্ব্বল হইয়া থাকে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# উপহার।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ইহাই কি ভালবাসা, লোকে ভালবাসাকে সুখের করিয়াই বর্ণনা করে কিন্তু সুখ ত কিছুই দেখিতে পাই না। এতদিন ছিলাম ভাল, ভালবাসা, প্রেম ইত্যাদি কথাগুলিই জানিতাম। নভেলে পড়িতাম, কখন বা নায়ক নায়িকার বিরহের কাহিনী পাঠ করিয়া মন খারাপ হইত, অনেক সময় ট্রাজিডি গুলা পাঠ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতাম না। হয়ত দুই চারি দিবস কিছুই ভাল লাগিত না, কিন্তু এ যে বিষম জ্বালা। এখন লেখা পড়া গেল, সব গেল কেবল এক চিন্তা সেই মুখ খানি। কেন সেই মুখ খানি ভাবি, সুন্দরী ত অনেক দেখেছি, একি তাহাদের অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী? না, শৈবলিনীর সরলতায় আমায় মুগ্ধ করেছে? সে লিখেছে আমায় যদি পায় তাহা হইলে সে আর কিছুই চাহে না, তবে সেও ত আমাকে ভালবাসে? দুই তিনবার দেখায় এত ভালবাসা, ইহাও কি সম্ভব? জগৎ সিংহের সহিত বিমলার মন্দির মধ্যে সাক্ষাৎ আর সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা, এই বিষয় লইয়া কতদিন বন্ধুদিগের সহিত কত তর্ক করিয়াছি কিন্তু এখন আর তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পিতামাতা লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, আর আমি এই করিতেছি। কেন সুরেনের সহিত বন্ধুত্ব হইল, আর কেনইবা ফটো তুলিতে গেলাম। গোপনে সাক্ষাৎ করিতেই বা কেন ইচ্ছা হইল। আর পারিনা ভাগ্যে যাহা আছে হইবে। আমি সে চিন্তা ছাড়িতে পারিব না, সে বড় মধুর, আহা তেমন মিষ্ট কথা কখন শুনি নাই। সে রূপ, সে করুণ চাহনি, সে সহৃদয়তা আমি কখন ভুলিতে পারিব না। এই বয়সে অনেক বার কেঁদেছি, কিন্তু প্রকৃত বলিতে কি এ ক্রন্দনের ভিতর যেন কিছু সুখ আছে। যদি কাঁদিতে হয় তবে এই ক্রন্দনই ভাল। আজ হইতে আমার সকল সুখ সকল আশা তাহারি উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম।"

নরেশচন্দ্র যখন সিটি কলেজের এফ, এ, ক্লাসের দ্বিতীয় শ্রেণীর বেঞ্চোপরি সহপাঠিদের মধ্যে বসিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় কলেজের ঘড়িতে ২॥০টা বাজিল। কেমেষ্ট্রী পড়িবার জন্য সকলে ল্যাবরেটারিতে গমন করিল, কিন্তু নরেশ তথায় যাইল না, ক্ষণেক বসিয়া অবশেষে মেসে গমন করিল।

( ১ )

নরেশ এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া যখন কলিকাতায় পড়িতে যায়, তখন অন্যান্য সকল আবশ্যকীয় সামগ্রীর সহিত বড় আদরের ডায়্যারিখানি ও সখের ক্যামেরাটী সঙ্গে লইয়াছিল। প্রথম কলিকাতায় যাইয়া ডায়্যারিতে লেখা হইত কি? "অদ্য অনাথ বাবুর সহিত আলাপ হইল, তিনি বড়ই আমোদ প্রিয় ভদ্রলোক।" "অদ্য 'বেঙ্গলে' সীতার বনবাস প্লে দেখিলাম।" "অতৃপ্ত বাসনা' লেখা শেষ হইল ইচ্ছা রহিল এইবার একটী কবিতা লিখিব।" আর মধ্যে থাকিত "বাটির জন্য মন বড় খারাপ হইয়াছে; যতীন কি চিঠী লখিবে না?" পাঠাধিক্য বশতঃ ক্যামেরাটীর বিশেষ ব্যবহার হইত না। কখনও কোন বন্ধু অনুরোধ করিলে তাহার ফটো তুলিয়া দিত; আর সময়ে সময়ে কলিকাতার ভিতরেই কোন উৎসবাদি দেখিতে যাইলে ক্যামেরাটী সঙ্গে লইয়া যাইত, ইচ্ছা হইলে ছবি তুলিয়া লইত। বাস্তবিকই নরেশের সে সময়ে ডায়্যারি লেখা আর ফটো তোলাতেই আমোদ ছিল, আর সখের মধ্যেও কেবল ইহাই।

নরেশের দৈহিক গঠন যেরূপ সুন্দর, প্রকৃতিও তদ্রূপ মধুর ছিল। তাহার সহপাঠীগণ যেন তাহার সহিত সখ্যতা লাভ করিতে পারিলে আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করিত। আর নরেশও সেই সকল অযাচিত বন্ধুগণের সহিত আলাপ করিয়া বাটির কথা, দেশের বন্ধুবান্ধবের কথা ভুলিয়া সেই নাগরিক জীবনের দিনগুলি সুখে কাটাইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে কোন ছুটী হইলে যখন বাটী যাইত অন্তরে আর আহ্লাদ ধরিত না। বাটী গমন কালে রেলগাড়ীতে বসিয়া মনে করিত গাড়ী যেন অন্য দিবস অপেক্ষা মৃদু গতিতে গমন করিতেছে। কতক্ষণে বাটী যাইয়া পূজনীয় জননী দেবীর চরণে প্রণাম করিবে, কতক্ষণে ছোট ভাই ভগ্নীদিগকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিবে আর কতক্ষণে



যতীনের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে তাহার আশাপূর্ণ হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় পুলকে পূরিত হইত। সে আনন্দের বুঝি তুলনা নাই। গৃহত্যাগী বিদেশবাসী বঙ্গীয় যুবকের গৃহে প্রত্যাগমন এমনই সুখের বটে।

এইরূপে নরেশের কলিকাতা বাসের দুইটী বৎসর স্বপনের মত কাটিয়াছিল। বুঝি সেই আত্মজনহীন বিদেশে থাকিয়া তাহার জীবন যে সুখময় হইয়াছিল, সে সুখলাভ তাহার অদৃষ্টে আর কখন ঘটে নাই। তাহার বিষাদময় জীবনের এই সময়টীও সুখের।

পূজার অবকাশের জন্য কলেজ বন্ধ হইবার বড় অধিক বিলম্ব নাই। অনেকবার সুরেনের কথা কাটাইয়াছে, কিন্তু আর পারা যায় না। সুরেনের পিতা একজন হাইকোর্টের এটর্নী। পূজার বন্ধে তিনি সপরিবারে একবার পশ্চিম বেড়াইতে যাইবেন এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন। হাইকোর্ট বন্ধ হইতেও চারি পাঁচ দিবস বিলম্ব আছে। সুরেন নরেশকে তাহার পরিবারবর্গের সকলের অন্ততঃ স্ত্রীলোকদিগের ফটো তুলিয়া দিবার জন্য আর একবার অনুরোধ করিল। তাহাকে অনুরোধের বিশেষ কারণ, উভয়ের মধ্যে ক্রমে বিশেষরূপে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, আর তাহার নিকট স্ত্রীলোকেরা চেহারা তুলাইতে বিশেষ আপত্তি না করিবার সম্ভব। নরেশ ইচ্ছা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত সে অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই; তাহার কারণ লজ্জা। সে তাহাদের প্রতিবেসিনী অনেক রমণীর ফটো তুলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার এই বন্ধুর সামান্য অনুরোধটী রক্ষা করা তাহার পক্ষে কিছু কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। অপরিচিতা স্ত্রীলোকদিগের সম্মুখে বাহির হইয়া কিরূপ তাহাদের মুখের দিকে চাহিবে, প্রয়োজন হইলে কিরূপে কথা কহিবে, ইহাই তাহার লজ্জার কারণ। যাহা হউক অবশেষে সুরেনের সহিত ভবানিপুরে তাহাদের বাটীতে ফটো তুলিতে গমন করিল।

ইতিপূর্ব্বে নরেশ সুরেনদের বাটিতে কখন যায় নাই। দুই বন্ধুতে বৈঠকখানায় বসিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সুরেন তাহার বন্ধুবান্ধবগণের উপহার ইত্যাদি বিবিধ সুন্দর সুন্দর সামগ্রী দেখাইল; তাহার ভাবী পত্নীর সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল। তৎপরে সুরেন অন্তঃপুরে তাহার মাতা, ভগ্নী,

ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতৃকন্যাকে চেহারা তুলাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতে গমন করিল। নরেশ তখন একাকী সেই নির্জ্জনপুরে বসিয়া মনে করিতেছিল অদ্য ডায়্যারীতে লিখিবার অনেক হইল; হয়ত আজিকার দিনটী জীবনের একটি স্মরনীয় হইবে। এই সামান্য স্মৃতি টুকু স্মরণ করিয়া হয়ত সুরেনের সখ্য প্রেম আজীবন এই মতই থাকিবে। হায় বিচিত্র সংসার লীলানভিজ্ঞ সেই সরল যুবকের মনে তখন একবারও উদয় হয় নাই যে এই দিনটীই তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অশুভ দিন হইবে; এই স্মৃতিই তাহার ভবিষ্য জীবনে অশান্তিময় করিবার কারণ হইবে। কিছুপরে সুরেন নরেশকে যথাস্থানে লইয়া গেল। নরেশচন্দ্রের ইচ্ছা যাহাতে ছবিগুলি নিখুঁৎ হয়, কিন্তু বড়ই সঙ্কটে পড়িল। যেমন ভাবে বসিলে যেমন ভাবে চাহিলে ছবিগুলি ভাল দেখাইবে নরেশ বার বার তাহা বলিতে বড় লজ্জাবোধ করিতে লাগিল, বন্ধুদ্বারা যথাসম্ভব সব ঠিক করাইয়া একে একে তিনখানি ফটো তোলা হইল। যাঁহাদের প্রতিকৃতি গ্রহণ করা হইতেছে তাঁহারা কিরূপ তাহা দেখিবার বিশেষ সুবিধা ছিল না। শেষে যে আসিল সে একটী দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা। নরেশচন্দ্র বালিকাকে একবার অতি সাবধানে দেখিয়া লইল, সেই অস্পষ্ট দৃষ্টিতে সে বুঝিল বালিকা হাস্যময়ী সুন্দরী। ক্যামেরা ভিতর হইতে অনেকক্ষণ সেই মনোহারিণী মূর্ত্তিটিকে দেখিল চক্ষু আর ফিরাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না; কেবল পাছে কেহ কিছু মনে করেন এই ভাবিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই দৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যমনস্ক চিত্তে চিত্র গ্রহণ করিল। সেই চিত্রের সহিত বালিকার চিত্তটীও উভয়ের অলক্ষিতে নরেশচন্দ্রের হৃদয়ে গৃহীত হইল। উভয়ের মধ্যে তখন কেহ সে কথা না বুঝিলেও অজ্ঞাত ও অযাচিত ভাবে সেই অশুভ ক্ষণে উভয়ের হৃদয়ের বিনিময় হইয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ নরেশচন্দ্রকে জলযোগ না কয়াইয়া কোন মতে ছাড়িল না। উভয়ে অন্তঃপুর পার্শ্বস্থিত একটী বারাণ্ডায় যখন একত্রে আহার করিতেছিল, নরেশ অনতিদূরে এক বাতায়ন সমীপে সেই মুখখানি দেখিতে পাইল, সেই স্ফুটনোন্মুখ সরলতা পূর্ণ ভালবাসার ছবি, আর দেখিল যেন তাহার সেই তৃষিত নয়ন দুটী তাহারি প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। নরেশচন্দ্র সব ভুলিয়া



অনিমেষ লোচনে সেই প্রফুল্ল কমল সম মুখখানি দেখিতেছিল। সুরেন বন্ধুকে আহারে বিরত দেখিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিল, তখন সে যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া পুনরায় ভোজনে রত হইল, কিন্তু সে চক্ষু ফিরাইলেও চিন্তা ফিরাইতে পারিল না। ক্রমেই তাহার সেই প্রধূমিত প্রেমশিখা অধিক পরিমাণে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

ভোজনান্তে ক্ষণেক বিশ্রামের পর নরেশচন্দ্র মেসে ফিরিয়া আসিল। হায় হায় সরল যুবক বুঝিল না জানিল না হৃদয় মধ্যে একটী মহান বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিল।

ভালবাসা এমনই সামগ্রী বটে, নবীন বয়সে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলের হৃদয়ে তাহাদের জানিতই হউক আর অজানিত অবস্থাতেই হউক একটী নূতন ভাব নূতন চিন্তা আনিয়া দেয়। নরেশচন্দ্র তখন জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু সেই বালিকার মূর্ত্তিটী তাহার হৃদয় দর্পণে স্থায়িরূপে প্রতিবিম্ব অঙ্কিত করিয়া দিল। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে নরেশের ইচ্ছা ভালবাসা না মোহ? নরেশচন্দ্র ডায়ারিতে সকল কথা লিখিল, এবং সেই দিনই রাত্রে একাকী সেই গৃহীত প্রতিকৃতি গুলির আবশ্যকীয় কার্য্যাবলী সমাপন করিয়া দেখিল প্রায় সকলগুলিই সুন্দর হইয়াছে; তাহার সেই চিত্তহারী বালিকার ছবিখানি চিনিতে আর বাকি রহিল না। পর দিবস প্রাতে সূর্য্যোদয় হইলেই সেই সকল ফটো বিষয়ক অবশিষ্ট ক্রিয়া সমাপন করিল। এইবার নরেশ মরিল, বিষপাত্র আপন করে পান করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রাণ ভরিয়া পিপসাকুল নয়নে সেই মুখখানি দেখিতে লাগিল। বালিকার সেই বাস্তব চাহনির সহিত চিত্রের চাহনি মিলাইয়া দেখিল, সে ঠিক তেমনি। সুরেনকে ছবিগুলি দিবার জন্য এক একখানি সুদৃশ্য কাগজের ফ্রেমে ফটোগুলি আঁটিয়া কেবল সেই বালিকার ছবির পশ্চাৎদিকের কোন নিভৃত অংশে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে "——উপহার" "শ্রীমতী——," "নরেশ" এই কথা কয়টি লিখিল। যথা সময়ে কলেজে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবং অপরের অসাক্ষাতে ফটোগুলি তাহাকে প্রদান করিল।

(২)

প্রেমের তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হইলে অতি বলবান ব্যক্তিও একেবারে বলহীন

ও বিবেকহীন হইয়া পড়ে। নরেশ একজন সামান্য যুবক সে যে একেবারে বিবেক শূন্য হইয়া পড়িবে তাহা আর বিচিত্র কি? বালিকাকে দেখিয়া অবধি তাহার মনে আর অন্য চিন্তা ছিল না। নরেশচন্দ্রের ফটো তুলিতে যাইবার কয়েক দিবস পরে সুরেন এক দিবস তাহাকে নিমন্ত্রণ করে। কলেজের ছুটির পর ৪টার সময় দুই বন্ধুতে একত্রে ভবানীপুরে গমন করিল। সেই দিনও বালিকার সহিত নরেশের দুই তিনবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বড় ইচ্ছা ছিল তাহার সহিত একটি কথা কহিবে, কিন্তু সে সুবিধা পায় নাই এবং জানিনা সুবিধা হইলেও পারিত কিনা। যাহা হউক সেদিন নরেশচন্দ্র একটি নূতন আশা লইয়া ফিরিয়া আসিল, বুঝিল বালিকাও তাহাকে ভুলে নাই, আরো বুঝিল সে তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে।

করুণাময় বিধাতার লীলা বুঝা মানবের সাধ্যাতীত। যে আশার পরিণাম হৃদয় ভেদী নৈরাশ্য সে আশা মানব হৃদয়ে প্রদান করিয়া পরে অশেষ যন্ত্রণা দেওয়ায় যে তাঁহার কি করুণা প্রকাশ পায় আমরা সামান্য নর তাহা বুঝিতে পারি না। নরেশ সে রাত্রে অনেক ভাবিল, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পর দিবস যথা সময়ে কলেজে গমন করিল। যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা; সেই অপরিচিতা বালিকার একখানি পত্র পাইল। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল।

"—নরেশ বাবু, আমি আপনার অপরিচিতা, কি ব'লে সম্বোধন করিতে হয় তাহা আমি জানিনা। মনে ছিল কাল যখন আপনি আমাদের বাটিতে এসেছিলেন তখন মুখ ফুটে কয়েকটি কথা কহিব। অভাগিনী আমি তাহা পারিলাম না আপনি আমার লজ্জাহীনতার জন্য ক্ষমা করিবেন। আপনার ও মোহনরূপ কেন আমার সম্মুখে এনেছিলেন? পত্রে বেশী কি লিখিব, আর আমার সে অধিকারও নাই। একটি অনুরোধ শুনিবেন কি? অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে আপনার একখানি চেহারা দিবেন কি? যদি দিতে ইচ্ছা হয় তবে খামের মধ্যে আমার নামে পাঠিয়ে দিবেন। যদি ইচ্ছা হয় তবে কৃপা করে একখানি চিঠি দিবেন।

আপনাকে অধিক কি লিখিব, বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে লজ্জা ত্যাগ করে এত কথা লিখিলাম ইহাতেই বুঝিবেন আমার মনের ভাব কিরূপ।



আমরা আর দশ দিন পরে পশ্চিম যাইব জানিবেন। বলিতে পারি না, যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে স্কুলে—আমার সহিত দেখা হইতে পারে। অনেক কথা রহিল যদি দেখা হয় তবে লজ্জাত্যাগ করিয়া সব বলিব। এখন বিদায়।

আপনার—শৈবলিনী।"

শৈবলিনীর পত্র প্রাপ্তির পর নরেশচন্দ্র আর অধিক বিলম্ব করিল না, ছুটী হইবার পূর্ব্বেই কলেজ হইতে মেসে যাইয়া একটি পছন্দ মত কোট গায়ে দিল, এবং দর্পণ লইয়া মস্তকের টেড়ীটি ভাল করিয়া দিল। তৎপরে কোন সাহেব ফটোগ্রাফারের দোকানে গিয়া অতি ক্ষুদ্রাকারের একখানি ফটো তোলাইল। দুই দিবস পরে ফটোখানি পাইল। এবং কোন বিশ্বাসী লোকের দোকানে একটি স্বর্ণ অঙ্গুরীয় নির্ম্মাণ করিতে দিল, আর সেই ক্ষুদ্র ফটো খানি তাহাতে বসাইয়া দিতে আদেশ করিল।

নরেশচন্দ্র বড়ই সঙ্কটে পড়িল, একদিকে বালিকার মনোভাব বুঝিয়া যেমন আশা ও আমোদ; অপর দিকে তেমনি নৈরাশ্যের যন্ত্রণা, কারণ কয় দিবস পরেই তাহারা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইবেন। যাহা হউক সে শৈবলিনীকে একখানি পত্র লিখিল, উত্তরে একখানি পত্রও পাইল। সেই পত্রে বালিকার লেখামত সময়ে স্কুলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। বালিকা অবাধে অন্তরের অনেক কথা বলিয়া ফেলিল। নরেশ ক্ষণেক স্বর্গীয় সুখ-ভোগ করিয়া মেসে ফিরিয়া আসিল। সে বলিয়া আসিয়াছিল যে শীঘ্রই ডাক-যোগে তাহাকে ফটো পাঠাইয়া দিবে। কিন্তু অঙ্গুরীয়ের কথা কিছু বলে নাই।

নরেশচন্দ্র বালিকার সহিত কথোপকথনে যতদূর বুঝিয়াছিল এবং কথার ভাবে যে আশার আভাস পাইয়াছিল, তাহাতে সে যে একদিন তাহাকে লাভ করিতে পারে এরূপ আশা করা তাহার অন্যায় হয় নাই, কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর ভবিতব্য। কলেজ বন্ধ হইতে পাঁচদিন মাত্র বিলম্ব আছে, নরেশচন্দ্র অঙ্গুরীয়টি রেজেষ্টরী পার্শেলে পাঠাইবার উপযুক্ত প্যাক করিল, ইচ্ছা কলেজ যাইবার কালে পোষ্ট অফিসে দিয়া যাইবে। যখন পার্শেল ও পুস্তকাদি লইয়া ঘরের চাবি বন্ধ করিতেছে, এমন সময় মেসের ক্ষুদ্র সিঁড়িতে

কাহার কঠিন জুতাধ্বনি শুনিতে পাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইল। সে ব্যক্তি পোষ্ট পিয়ন, নরেশকে জানিত কাজেই পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাহার হস্তে তাহার চিঠিখানি দিয়া গেল। নরেশ পত্রখানি পাঠ করিয়াই যেন জগৎ শূন্যময় দেখিল, ঘরের চাবি খুলিয়া তাহার চেয়ায়ে বসিল, বার বার পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। সে পত্র লিখিয়াছিল শৈবলিনী। নরেশচন্দ্রের কাতর হওয়া আশ্চর্য্য নয়। হইতে পারে শারদীয় জলদমালা ক্ষণকাল স্থায়ী তথাপি উদয়োন্মুখ চন্দ্রকে ঢাকিলে কেনা বিরক্ত হয়। কিন্তু নরেশচন্দ্রের এ মেঘমালা যে চিরস্থায়ী। পত্রের একস্থানে শৈবলিনী লিখিয়াছে "আপনার মোহনরূপ ও তাহারি উপযুক্ত গুণরাশি দেখে আমি আপনাকে মনে মনে আমায় সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছি। আমার অদৃষ্টে নাই তাই আপনার সেই মোহনরূপের ফটো পাইলাম না। মনে করেছিলাম, আর দু এক দিন আপনার শ্রীচরণ দেখিতে পাইব, কিন্তু তাহা উপস্থিত আর হ'ল না, আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমরা যাইব। যদি ভাগ্যে থাকে তাহা হইলে আবার দেখা হবে, জানবেন যদি আপনাকে পাই তাহা হইলে আমি কোন কার্য্য করিতেই ভীত নই। নরেশ তাহার বাক্স খুলিল এবং চিঠিখানি ও সেই প্যাক করা অঙ্গুরীয়টি রাখিয়া দিলেন; একটি দীর্ঘ নিশ্বাস হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উঠিয়া বাতাসে মিশিয়া গেল। একাকী শূন্য হৃদয়ে মেসে আর ভাল লাগিল না, তখন কলেজে গমন করিল।

শৈবলিনীর সহিত নরেশচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হইতে আজি পর্য্যন্ত প্রায় দশদিন হইল। এই অল্পদিনের মধ্যে তাহার মনের সহিত হৃদয়েরও বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কলিকাতার কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে নিতান্ত পরিচিত ভিন্ন কেহ কাহারও বড় খবর রাখে না। যদ্যপি লক্ষ করিত তবে ক্লাসের সকল ছাত্রগণই নরেশের চিন্তাময় ভাব ও দ্রুত পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিত। অদ্য নরেশ ক্লাসে বসিয়া অনেক ভাবিল, প্রথম দর্শন হইতে আজি পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিল সবই একে একে ভাবিতে লাগিল। তিন চারি ঘণ্টা কাল একাক্রমে চিন্তা করিয়া বিশেষ ক্লেশ বোধ করাতে অবশেষে ২॥০ টার সময় মেসে প্রত্যাগমন করিল।

এই পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে আমরা নরেশের সেই চিন্তার কিছু অংশ তুলিয়া



দিয়াছি। বলা বাহুল্য সে দিনও নরেশচন্দ্র যথাযথ মনের অবস্থা ডায়ারীতে লিখিল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনন্ত প্রবাহমান সময় স্রোত পৃথিবীর প্রায় সকল সামগ্রীকেই কোন এক অজ্ঞাত প্রদেশে চিরদিনের জন্য ভাসাইয়া লইয়া যায়। যায় সকলি, কেহ অগ্রে কেহ পশ্চাতে। যাহার অভাবে আমরা দুঃখ পাই তাহাই অগ্রে যায়। আমার সেই প্রথম যৌবনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা গিয়াছে, সে উৎসাহ, সে বল, সে রূপ, সে প্রতিজ্ঞা সকলই কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই সহস্র বৃশ্চিকদংশন যন্ত্রণা তুল্য স্মৃতিটুকু মরুভূমি সম হৃদয় মধ্যে সময়ে সময়ে ফুটিয়া উঠে কেন? পিতার আদরের পুত্র ছিলাম, যখন যাহা বলিয়াছি তাহাই হইয়াছে। হায় সেইদিন সে বড় সুখের দিন ছিল,—যখন সেই স্নেহ মমতার জীবন্ত মূর্ত্তিসম জননী দেবী ইহ সংসারে জীবিত ছিলেন; যখন সেই বিরহদুঃখক্লিষ্ট জীবনের অবসানে লক্ষ্মীসম পত্নী পাইয়া পুনরায় সংসারে সুখের মরীচিকা দেখিয়াছিলাম; যখন শত আশা বুকে বেঁধে, কত উৎসাহে, কল্পনা সহায়ে শত সুখের ছবি দেখিয়া সারাদিন অকাতরে পরিশ্রম করিতাম। কিন্তু হায়, সে কয়দিন দেখিতে দেখিতে সব গেল। পুণ্যময়ী জননী স্বর্গে চলিয়া গেলেন, পিতাঠাকুরও সেই পথে গমন করিলেন, অবশেষে সেই প্রফুল্ল কমল সম প্রিয়া পত্নী যার মুখ চাহিয়া সকল সহিতে পারিয়াছিলাম, সেও আজ আর নাই। যে শৈবলিনীর জ্বালাময়ী স্মৃতি যৌবনের প্রথম কয়েক বৎসর আমায় পাগল করিয়াছিল, তাহাও কালে অনেক পরিমাণ বিস্মৃত হইতে সমর্থ হইয়াছিলাম, শৈবলিনী লাভের আশা যেমন আপনি মনোমধ্যে আসিয়াছিল, তেমনি আপনিই উহা অন্তর্হিত হইল। বিবাহ করিব না বলিয়া মনে মনে যৌবনসুলভ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম সময়ে তাহাও ভাসিয়া গেল, বিবাহ করিলাম, মনোমত পত্নীও ভাগ্যে ঘটিল। পাপিষ্ঠ আমি, সহিবে কেন, সেও আমায় ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল। একে একে যখন সব গেল, তাহাও ক্রমে এ পোড়া প্রাণে সহ্য করিতে পারিলাম। অবলম্বন শূন্য হইয়া এ বয়সে এক রকমে দিনপাত হইতেছিল।

কিন্তু আজি এ নূতন উপসর্গ কেন? আবার সেই শৈবলিনী, আবার তার চিন্তা। বহুদিবস তার কথা মনে করিনি, আজ কতদিন হ'ল তার কোন সন্ধান রাখতেও চেষ্টা করিনি। কিন্তু আশ্চর্য্য বিধি লীলা, এ বয়সেও তার কথা স্মরণ করে', তার অশুভ সংবাদে এ শুষ্ক চক্ষে জল পড়িল।"

সুখাভিলাষী মানব! সংসারের ইহাই নিয়ম,ইহাকে সুখের বলিয়া যদি মনে করিতে তবেই তুমি সুখী। যে বহু জনপূর্ণ সুসজ্জিত নয়ন-মন তৃপ্তিকর রঙ্গ-ভূমে কালি শত শত আনন্দ অভিনয়ে সহস্র সহস্র দর্শক বৃন্দের চক্ষে স্বর্গীয় ছবিসম প্রতীয়মান হইয়াছিল, আজি সেই স্থান জনমানবহীন, সে অভিনয় নাই, সে দৃশ্য নাই, সে আনন্দ উৎসাহের চিহ্নমাত্র আজি নাই। প্রকৃতির দুর্ভেদ্য যবনিকা চিরদিনের জন্য সে সকল দৃশ্য মানব দৃষ্টির অন্তরালে রহি-য়াছে। হায় সংসারে ইহাই যুগান্তব্যাপী নিষ্ঠুর নিয়ম। যে কানন আজি অসংখ্য ফল পুষ্প শোভিত রম্য স্থান, কালি যে তাহাই দাবানল দগ্ধ মরু-ভূমিতে পরিণত না হইবে তাহা কে বলিতে পারে? পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

(১)

ইংরাজী ১৮৯৮ সালে কলিকাতায় যখন প্লেগের প্রকোপ বৃদ্ধি হইল, অথবা প্লেগ যত বৃদ্ধি হউক বা না হউক প্লেগ সংক্রান্ত আইন সকল প্রচারিত হইল, তখন অনেক ধনী ব্যক্তি হইতে দরিদ্র পর্য্যন্ত কেহ মারী ভয়ে কেহ মান ও কেহ ধর্ম্মভয়ে সহর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মফঃস্বল গমন করিতে লাগিল। কলিকাতার সন্নিকটে স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কারণে ও অন্যান্য সুবিধার কারণে চন্দননগরের ন্যায় দ্বিতীয় সহর আর নাই বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। এতদ্ভিন্ন এই সহরে আর একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, এখানে ইংরাজ রাজের কোন আইন চলে না, কারণ ইহা প্রজাবৎসল ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধিকার ভুক্ত। এই সকল নানা সুবিধার জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অধিকাংশ লোকই এই রম্য নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

সে সময় গ্রীষ্মকাল, নিদাঘের দারুণ গ্রীষ্মের পর দিবাবসানে প্লেগ ভীত চন্দননগর প্রবাসী ভদ্রলোকগণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ ও শান্তিলাভা-শায় সর্ব্বসন্তাপহারিণী ভাগীরথী পার্শ্বস্থিত রমণীয় রাজপথে প্রায় সকলেই সমাগত হইতেন। চন্দননগর সহর হইলেও কলিকাতার ন্যায় সহর নহে,



এখানে অসংখ্য নরনারীর দিবস যামিনী ব্যাপী কলতান নাই, প্রাসাদ সম শত শত উচ্চ অট্টালিকার আকাশস্পর্শী চূড়া নাই, অসংখ্য বিপণীর ব্যস্ততা নাই, সে ঐশ্বর্য্যও নাই, আর বলিতে কি সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যথিতের নৈরাশ্যময় হৃদয়ের দারুণ মর্ম্মভেদী ক্রন্দনোচ্ছাসও এখানে নাই। জীবন সংগ্রামের তীব্র কোলাহল এখানে নাই, নীচতা কপটতার মূর্ত্তিময় ছবিও এখানে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে আছে কি? শান্তিময়ী প্রকৃতির কোমল ক্রোড়। এখানে অপরিচিতকে আপন করিতে জানে এবং পরের বিপদে নিজের আন্তরিক সহানুভূতি দেখাইতে জানে। তাই সেই প্রবাসী ভদ্রলোকেরা এখানকার লোকদিগের যত্নে আপ্যায়িত ও মুগ্ধ হইয়া-ছিলেন। তাই তাঁহারা এতন্নগরবাসী লোক দিগের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছিলেন।

চন্দননগরে জাহ্নবী তীরের যে পথটীর কথা উল্লেখ করিলাম উহার নাম "ষ্ট্রাণ্ড"। ঐ স্থানটি সহরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। এমন অনেক লোক আছেন যাহারা প্রতিদিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্যও ঐ স্থানে বেড়াইতে যান। কলিকাতা হইতে আগত একটি বাবু প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটি বালিকাকে লইয়া বেড়াইতে আসিতেন; বালিকার নাম মৃণালিনী। নিত্য সাক্ষাতে আলাপ অনেক লোকের সহিত হইতে পারে কিন্তু সৌহার্দ্য সকলের সহিত জন্মে না। উক্ত বাবুটির প্রতিদিন সাক্ষাৎ দ্বারা একটি স্থানীয় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল এবং শীঘ্রই সেই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হইতে লাগিল। ভদ্রলোকটি বালিকাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, দুই একটি খেলনাও তাহাকে আনিয়া দিতেন। বালিকাটিও ক্রমে তাহার সহিত কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিত না। অকপটে সকল কথা তাহাকে কহিত, সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের সকল কথাই তাহাকে বলিত। কে তাহাকে অধিক ভালবাসে, কে তাহাকে খেলনা আনিয়া দেয়, দ্বিতীয় ভাগের কতদূর পড়া হইল, কে পড়া বলিয়া দেয় ইত্যাদি অনেক কথা তাহাকে বলিত।

আষাঢ় মাস সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে এক দিবস হঠাৎ অত্যন্ত মেঘ করিয়া আসিল এবং বৃষ্টি পড়িবার উপক্রম হইল। সেই বালিকা অনেকদিন ভদ্র-

লোকটিকে তাহাদের বাসায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল কিন্তু বেড়াইতে বেড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া যায়, আর তথায় যাইবার সুবিধা একদিনও হয় নাই। অদ্য শীঘ্র বৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা দেখিয়া কলিকাতার বাবুটির ও বালিকাটির অনুরোধে প্রাবৃটের জলধারা হইতে শরীর রক্ষার্থে সেই ভদ্রলোকটি গঙ্গা-তীরের অদূরবর্ত্তী তাহাদের ভাড়াটিয়া বাড়িতে দ্রুতপদে গমন করিলেন। কোন ভদ্রলোক বিদেশে যাইয়া তথাকার স্থানীয় কোন ভদ্রলোককে নিজ বাসায় আসিতে দেখিলে, তাহার অভ্যর্থনাদির জন্য কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়ে। অদ্য সেই নবাগত ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যেও কিছু ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

বালিকা মৃণালিনী আজি সে আগন্তুককে তাহাদের বাটীতে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাহার নানাবিধ খেলনা, ছবির বই, পুতুল ইত্যাদি দেখাইতে লাগিল। তিনিও আহ্লাদের সহিত বালিকার আদরের দ্রব্যগুলি দেখিতে লাগিল। এই সকল দেখিতে দেখিতে মৃণালিনী হঠাৎ একবার বাটির মধ্যে দৌড়াইয়া গিয়া একখানি অতি মূল্যবান্ কারুকার্য্য সম্পন্ন চর্ম্মাচ্ছাদিত বৃহদায়াতনের পুস্তক হস্তে ফিরিয়া আসিল। পুস্তকখানি দেখিলে বোধ হয় যে উহা এক সময় অতি সুন্দর ছিল, পুরাতন হইয়া এবং যত্নাভাবে এক্ষণে কিছু জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেখানি একখানি প্রতিকৃতিপূর্ণ ফটো এ্যালবাম; বালিকা তাহার ছোট ছোট হাতগুলির সাহায্যে এক একখানি করিয়া চেহারাগুলি দেখাইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কাহার প্রতিকৃতি তাহাও বলিয়া দিতে লাগিল। একে একে তাহার পিতামাতা পিতৃব্যকন্যা ইত্যাদি অনেকের ছবি দেখাইল। মৃণালিনীর ছবি দেখান শেষ হইলে পর আগন্তুক স্বহস্তে এ্যালবামখানি গ্রহণ করিয়া একখানি চিত্র বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলেন এবং অবশেষে উহা এ্যালবাম হইতে অসংলগ্ন করিয়া দ্রষ্টব্য বিষয় নিরীক্ষণ পূর্ব্বক এদিক ওদিক দেখিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। কেহ দেখিতে পাইল না। প্রৌঢ়ের নয়ন প্রান্ত হইতে ধীরে এক বিন্দু অশ্রু গণ্ড বহিয়া ফটোপরি পতিত হইয়াছিল।

পাঠক পাঠিকাগণ, বলিতে হইবে কি এ ব্যক্তি কে, ইনি সেই নরেশচন্দ্র। অদ্য এই ঘটনার পর বাটি আসিয়া নরেশচন্দ্র একাকী তাহার শূন্যগৃহে বসিয়া মনে মনে যে চিন্তা করিতেছিল এই পরিচ্ছদের প্রথমেই তাহার কিয়-



দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। নরেশচন্দ্র বালিকার মুখে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল যে সে মাতৃহীনা, অদ্য জানিল যে তাহার প্রথম যৌবনের একমাত্র আরাধ্যা রমণী আর ইহ সংসারে নাই। অনেক দিনের একটী অস্ফুট ছায়াময় স্মৃতি আজি তাহার মানসপটে পূর্ণাকারে উদিত হইয়া তাহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিল। পরিবর্ত্তনশীল সময়ের সহিত তাহার জীবনেও বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যদিও তাহাকে একদিনের জন্যও জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই, কিন্তু অদৃষ্টের সহিত ঘোর সংগ্রামে তাহার সকল দিনগুলি অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার শোক তাপময় জীবনের সকল কথা বলিয়া এ ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার কলেবর বিস্তৃত করিব না। অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথামাত্র বলিব।

অতৃপ্ত বাসনার দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অবশেষে নরেশচন্দ্র বিবাহ করিয়া সংসার সুখের দেখিয়াছিল। কিন্তু সে অতি অল্প দিনের জন্য। বড় সুখেই তাহার কয় বৎসর কাটিয়াছিল। শীত ঋতুর কুজ্ঝটিকাপূর্ণ ঘোর অন্ধকারময় যামিনী প্রভাত হইলে ঊষাকালের প্রথম আলোকের ন্যায়, তাহার শত ঝঞ্ঝাবাতক্লিষ্ট জীবনের অন্তে সে প্রথম শান্তিসুধা সেই সময়ে লাভ করিয়াছিল। যথাসময়ে একটি পুত্র সন্তান লাভ করিল, কিন্তু কয়েকদিন পরেই সেটি মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যাহা হউক তাহাকে বড় অধিক কাতর করিতে পারে নাই। পিতার বয়োধিক্য বশতঃ তখন সে নিজেই তাহাদের ব্যবসায়ের সকল ভার গ্রহণ করিয়াছিল। কর্ম্মময় জীবনে প্রবেশ করিয়া সে ব্যবসায়ে বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিল এবং নিজ পরিশ্রমে অনেক উন্নতি সাধনও করিয়াছিল। যখন এইরূপ পূর্ণ উৎসাহের সহিত জীবন পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন অকস্মাৎ তাহার জননীর মৃত্যু হইল, আর যেন সেই পুণ্যবতীর সহিত সংসারের সকল সুখ শান্তি চলিয়া গেল। আবার অদৃষ্টাকাশে কৃষ্ণ মেঘ দেখা দিল, অল্প দিনের মধ্যে পিতারও মৃত্যু হইল। সংসারের সকল ভারই তাহার মস্তকে পড়িল। সে সময়েও তাহার সেই সুহাসিনী স্ত্রীর বিমল মুখখানি দেখিয়া সে সকল ভুলিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু অবশেষে সেও চলিয়া গেল। নরেশ সকল কাজকর্ম্ম ব্যবসা ইত্যাদি তুলিয়া দিল। পিতার সঞ্চিত ও যৌবনের উপার্জ্জিত অর্থরাশি নানা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে লাগিল। এবং সেই সময় হইতে একাকী সেই শূন্য ভবনে বাস করিতে লাগিল।

নরেশচন্দ্রের আশা ও আকাঙ্ক্ষাহীন জীবন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। অকস্মাৎ ডাকযোগে এক পত্র আসিল। নরেশচন্দ্র তৎপাঠে অবগত হইল যে কলিকাতা হইতে যোগেশ বাবু মৃণালিনীর বিবাহের কারণ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তখন পত্রখানি হস্তে করিয়া নরেশ কিঞ্চিৎ কি চিন্তা করিল তৎপাঠে যেন কিছু হর্ষান্বিত হইল। বিবাহের আর তিন দিন মাত্র বিলম্ব আছে।

নরেশ সেই দিবসই কলিকাতায় গমন করিল এবং কোন জোহরীর দোকান হইতে বহুমূল্য একখণ্ড হীরক ক্রয় করিয়া আনিল। অনেক দিন পরে নরেশচন্দ্র আজি সেই প্রথম ভালবাসার স্মরণার্থে প্রণয়োপহারের জন্য সংগৃহীত ফটোযুক্ত কনকাঙ্গুরীয়টি যাহা এতাবৎ সযত্নে রক্ষিত ছিল তাহা বাহির করিল। আর বাহির করিল সেই স্বহস্তে গৃহীত শৈবলিনীর কিশোর বয়সের চিত্রখানি। ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয় সংযুক্ত আপনার যৌবনের ছবিখানি একবার দেখিল, আর একবার সেই এলাইত কেশা মনমোহিনী ছবিখানি দেখিল, নয়ন দুটি আজও তেমনি। ধীরে ধীরে অঙ্গুরী হইতে আপনার ফটোখানি উৎপাটিত করিল এবং ধীরে সম্মুখস্থিত জ্বলন্ত পাবক শিখায় তাহা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। কিন্তু সেই মোহিনী ছবিখানি পোড়াইতে পারিল না। পুনরায় স্বযত্নে পূর্ব্বস্থানে রাখিয়াদিল। পরদিন প্রাতে কোন স্বর্ণকারের সাহায্যে ক্রীত হীরকখণ্ড সেই অঙ্গুরীয়ে বসাইয়া লইল।

নিমন্ত্রণের দিন উপস্থিত হইল। নরেশচন্দ্র যথাসময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ যোগেশ বাবুর বাটীতে গমন করিল। সন্ধ্যার পর ক্রমে ক্রমে বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল এবং মহা ধূমধামের সহিত বর আসিল। সভাস্থলে কন্যা সম্প্রদান করা হইয়া গেল। তৎপরে নরেশচন্দ্রের অনুরোধেই সেই রাত্রে তাহাকে বাসর ঘরে মৃণালিনীর নিকট লইয়া যাওয়া হইল। নরেশচন্দ্র বর কনেকে আশীর্ব্বাদ করিল, সেই অঙ্গুরীয়টি মৃণালিনীর চম্পক কলি সদৃশ কোমল অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিল। সেই প্রথম যৌবনের একমাত্র ভালবাসার লোককে প্রণয়োপহার দিবার জন্য যে অঙ্গুরীয় প্রস্তুত হইয়াছিল, আজি তাহাই তাহারি কন্যাকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ প্রদত্ত হইল।

মানব আশা করিবারই অধিকারী, সফল হওয়া না হওয়ায় তাহার কোন ক্ষমতা নাই। সে কল্পনা সাহায্যে ভবিষ্যতের কত সুখের দৃশ্য অবলোকন



করে এবং সেই সুখের সম্পূর্ণতা সাধনাশায় কতই প্রস্তুত হয়, কিন্তু হায় অধিকাংশ সময়েই সেই কল্পনাদৃষ্ট ছবিখানি সময়ের সহিত অদৃশ্য হইয়া যায়। একরূপ ভাবিয়া লোকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। পরে তাহা অন্যরূপ হইয়া যায়। নরেশচন্দ্র কাহার জন্য অঙ্গুরীয়টি সংগ্রহ করিয়াছিল, আর আজি তাহা কাহাকে প্রদান করিল।

যাহা হউক নরেশচন্দ্র অনেক দিনের পর অদ্য যেন কিছু তৃপ্ত বোধ করিল। কিন্তু সেই শুভ সময়ে অঙ্গুরীয় প্রদান কালে আজিও একবিন্দু অশ্রু তাহার নয়ন প্রান্ত হইতে পতিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় আজিও তাহা কেহ দেখিতে পান নাই।

শ্রীহরিহর শেঠ।

---

# জপজী।

## শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ।

শৈশব হইতেই যদিও গুরু নানক ধ্যান ধ্যারণা ও ভজন সাধনে রত ছিলেন কিন্তু তথাপি ২৮ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দিতে বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হন নাই। এই সময়ে তিনি সুলতানপুরে ছিলেন। প্রত্যহ 'বেই' নদীতে স্নান করিতে যাইতেন। স্নানকালে একদিন তাঁহার অন্তরে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ পরমাত্মা দেখা দিয়া তাঁহাকে যেন বলিলেন—"সংসারী জীবের কল্যাণের জন্য, তাহাদিগকে নাম জপ শিক্ষা দিবার জন্য তুমি প্রেরিত হইয়াছ; তুমি সংসারে আসক্ত হইলে কেন? যে জন্য তুমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই এখনো আরম্ভ কর নাই।" শ্রীগুরু নানক এই পরমবাণী শ্রবণান্তর যোড়করে বলিলেন, "আমার কথা কেহই শুনে না, নানা পন্থ হইয়াছে; আমার কথা কে মানিবে? হে পরমাত্মন্! তোমার সমান গুরু কে আছে? মর্য্যাদানুকুল

গুরুশিষ্য রীতি অনুসারে আমাকে তুমি যাহা উপদেশ করিবে আমি ঐ উপদেশ ঐ রীতি অনুসারে সংসারী জীবের উদ্ধার নিমিত্তে প্রবৃত্ত করিব।" ইহাতে "মহাবিষ্ণু ভগবান" পরমেশ্বর গুরু নানককে এই মূল মন্ত্র উপদেশ দিলেন।

"এক্ ওঁ সৎনাম কর্ত্তাপুরুখ্ নির্ভও নির্বৈর্
অকালমূরৎ অজুনি সৈভং গুরুপ্রসাদ্ জপ।"

সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তাঁহাকে যেন বলিলেন "হামনে যো মূল মন্ত্রকা উপদেশ কিয়া হৈ ইসকো আপনেসে অভেদ জান জাপ করো" অর্থাৎ এই যে আমি তোমাকে মূলমন্ত্র উপদেশ দিলাম ইহাকে প্রাণের বস্তু জ্ঞান করিয়া জপ করিবে। ঈশ্বরের আজ্ঞা অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীগুরু দেবজী নানক প্রায় একঘণ্টাকাল নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থিতি করিলেন। যখন সমাধি হইতে উঠিলেন তখন পরমাত্মা তাঁহাকে যেন জিজ্ঞাসা করিলেন "যে উপদেশ তোমাকে দিলাম তাহা তুমি কি প্রকার ধারণ করিলে? "যব সমাধি সে উঠে তব পরমাত্মানে পুছা যো উপদেশ নে কিয়া ও উপদেশ কিস্ প্রকার আপ্নে ধারণ কিয়া?" গুরু সাহেব নে উত্তর দিয়া, গুরু সাহেব উত্তর দিলেন "আদ সচ্ যুগাদ্ সচ্ হেভি সচ্ নানক হোসিভি সচ্।" ইহা যেন দৈববাণীর মত তাঁহার মুখারবিন্দ হইতে নির্গত হইয়াছিল। তাই জপজীর প্রথমেই ইহা স্থান না পাইয়া যায় নাই। ইহার পর "সোচে সোচ্ ন হোবই" হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় জপজী গ্রন্থ কথিত আছে প্রথমে গুরু নানক হিমালয়ের উত্তরে সুমেরু পর্ব্বতে সিদ্ধমণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহাদের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর হিসাবে বলিয়াছিলেন। পরে সেখান থেকে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার প্রিয় শিষ্য দ্বিতায় গুরু গুরু অঙ্গদ সাহেব, তাঁহাকে সিদ্ধ মণ্ডলীর সঙ্গে যে সব কথোপকথন হইয়াছিল, সেই সব জিজ্ঞাসা করিলে গুরু নানক সেই সকলের সার সংক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে শ্লোকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই "জপজী" গ্রন্থ।

হিন্দুর নিকট বেদ সংহিতা যেমন পবিত্র ও পূজার সামগ্রী, শিখের নিকট "গ্রন্থ সাহেব" তেমনি পূজার সামগ্রী। গ্রন্থ সাহেবে প্রধানতঃ গুরুনানকের



ধর্ম্মবিষয়ক ভজনাদি ও পদাবলী এবং গুরুনানকের মতের অনুকূল কবীরাদি ভক্তেরও পদাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রায় দশ সহস্রেরও অধিক পদাবলী ইহাতে আছে। গ্রন্থসাহেবের সর্ব্বপ্রথম আসন "জপজী" অধিকার করিয়াছে। গ্রন্থসাহেবের আদিতেই জপজী। ইহা সম্পূর্ণ গুরু নানকের মুখারবিন্দ হইতে নির্গত। হিন্দুর গীতা যেমন, শিখের নিকট তেমনি জপজী। আবার গায়ত্রী যেমন বেদের সারভূতা সেইরূপ "এক্ ওঁ সৎ নাম কর্ত্তা পুরুখ" হইতে "নানক হোসিভি সচ্" পর্য্যন্ত জপজীর প্রথমাংশটুকু শিখসমাজে সার ঈশ্বরের পরমবাণী রূপে গণ্য হয়।

গুরুনানক বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি অবতারগণকে মহাপুরুষ বলিয়া মানিতেন বটে কিন্তু কদাচ ঈশ্বর বলিয়া মানিতেন না। গুরু নানক যখন কালকা পর্ব্বতে গিয়াছিলেন সেই কালে তাঁহার ভক্ত শিষ্য মর্দ্দানার সঙ্গে তাঁহার যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল তাহাতে তিনি বলিতেছেন— "এ ত্রে সৃষ্টিকো কর্ত্তা আখিদে হেঁ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ। সোভি অন্ত ভাল থক্‌গে। অন্ত কিসে নু হথ্ ন আয়া। অতে কমলা সংসার অবতারানু পরমেশ্বর করকে জানতা হৈ। অত্তে উনাভি ভোরি অন্ত ন পায়া। আপনে কুদ্‌রৎ আপেহিঁ জানতা হেয়। হোর কোহি নেহি জানতা। এক জন্ত তো কীতা হোয়া হেয় জিসতাঁই করতার কা ক্রোপ হোয়েগা সোই আপতাঁই ব্রহ্ম জ্বানে গা অত্তে জিসদে উপর কৃপা হোয়েগে সো আপনুকীতা জানে গা।" অর্থাৎ "এই সংসারের সৃজন লয় পালনকর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহারাও পরমেশ্বরের অন্ত না পাইয়া হার মানিয়াছেন। সংসারে ক্ষিপ্ত লোকেরাই অবতারগণকে পরমেশ্বর বলিয়া জানে কিন্তু অবতারগণও পরমেশ্বরের এক রতিভর অন্ত পায় নাই। তিনি আপনার লীলা আপনিই জানিতেছেন। আর কেহই তাহা জানে না। যে লোক আপনাকে ব্রহ্ম বলে তাহার উপর ঈশ্বরের কোপ দৃষ্টি পড়িয়াছে জানিবে আর যে আপনাকে ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া জানে তাহার উপর পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টি আছে জানিবে।" শিখদিগের "দশমী পাতশা" গুরু গোবিন্দ সিংহও মনুষ্যকে ঈশ্বর বলার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাই পাছে তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে ভবিষ্যতে ঈশ্বরের স্থানে অধিষ্ঠিত করে সেই ভয়ে তীব্র শাসন করিয়া গিয়াছেন।

"যো হমকো পরমেসর উচরে হেঁ।
তে সব নরক কুণ্ডমে পর হেঁ॥"

( গুরু গোবিন্দ সিংহ )

"যে আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া উচ্চারণ করিবে তাহারা সকলেই নরক কুণ্ডে পড়িবে।"

"আমিই ব্রহ্ম বা অবতারগণ ব্রহ্ম" এইরূপ ভ্রমাত্মক সংস্কারের বিরুদ্ধে এমন শাণিত তরবারির আঘাত শিখ ভিন্ন কে করিতে সমর্থ হইয়াছে? গুরুনানক ভক্তগৃহী ছিলেন। তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি আধুনিক সাধু সন্ন্যাসীর ন্যায় "অহং ব্রহ্ম" বলিয়া প্রচার করেন নাই। সংসারে থাকিয়াও কঠোর সাধক হইয়া যে, জনসমাজের প্রভূত উপকার করা যায় বর্ত্তমান যুগে এবিষয়ে পথপ্রদর্শক গুরুনানক। *

গুরু নানক স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"আওরৎ ইমান্
লড়কা নিসান্
দৌলৎ গুজরান্"

অর্থাৎ "স্ত্রী ধর্ম্মস্বরূপা, পুত্র সংসারে নিশান স্বরূপ এবং ধন গুজরানের জন্য।" গুরু নানকের সরল ও বিশুদ্ধ ভাবে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত পঞ্জাব তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। হিন্দু মুসলমান সকলেরই তিনি শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। শিখেরা যে বলবীর্য্যে ও সাহসে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া জগতে বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে তাহা কিসের বলে? গুরু নানকের ধর্ম্ম বলে। তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া শিখ জাতি সমুচ্চ শিখরে উঠিয়াছে।

গুরুনানক যে ভাষায় শ্লোক সমূহ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাই গুরুমুখ ভাষা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। গুরুমুখ ভাষার এমনটা জোর এমনটা প্রাণ বাঙ্গলা ত দূরের কথা পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় মিলে কিনা সন্দেহ। পশ্চিমী ভাষার 'কদম' বাঙ্গলা ভাষায় মোটেই নাই। বাঙ্গলার মাটী যেমন কর্দ্দমাক্ত নরম, বাঙ্গলার ভাব ও ভাষা তেমনি কোমলকান্ত। পশ্চিমী মাটীর

* এখনও তাঁহার বংশধরেরা শিখদিগের অধিনায়কপদে অধিষ্ঠিত।



মত পশ্চিমী ভাব ও ভাষা এঁটেল। গুরুনানকের জপজী যখন পাঠ করি তখন আমার ক্ষীণ প্রাণেও এক অভূতপূর্ব্ব শক্তি জাগ্রত হয়।—প্রাণে বীর্য্য আসে —ব্রহ্মতেজের সঞ্চার হয়। ইহার "স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষ" শ্লোকগুলি পড়িলে আপনা হইতেই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়।

এই জপজী গ্রন্থে ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্বশুদ্ধ চল্লিশ পৌড়ী বা শ্লোক মাত্র আছে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ এমন কবিত্বপূর্ণ এমন সরল ও এমন জলন্ত ভাবে আর কোন ভাষায় দেখা যায় না। গুরু নানকের পথানুসারী যত সম্প্রদায় আছে সকল সম্প্রদায়ই এই জপজী ভক্তি সহকারে কণ্ঠস্থ করে ও নিত্য পাঠ করে। যে, সমস্ত পুস্তক কণ্ঠস্থ করিতে না পারে তাহার পক্ষে অন্ততঃ পাঁচ পৌড়ী অর্থাৎ পাঁচটা শ্লোকও মুখস্থ করিবার বিধি। সিংহ, নিহঙ্গ, সাহেবজাদে, নির্ম্মলে, কুকা, নাম ধারিয়ে, উদাসী, সুসড়া, প্রভৃতি বিভিন্ন শিখসম্প্রদায়ের সকলেরই গুরুমন্ত্র এই জপজী। যে নিতান্ত অবহেলা করিবে সে অন্ততঃ গুরুমন্ত্র "ওঁ সৎ নাম" অবধি "হোসেভি সচ" পর্য্যন্ত জপজীর এই আদি অংশটুকু অভ্যাস করিবে। এখনও কত লক্ষ কোটী শিখ বঙ্গে, পঞ্জাবে, ও নানা দেশ দেশান্তে সিদ্ধ গুরু নানকের এই মহাবাক্য পাঠ করিয়া আপনাকে সত্য পথে পরিচালন করিতেছে।

আগামী বার হইতে 'জপজী'র সটীক বঙ্গানুবাদ পুণ্যের পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# গীতি-কুঞ্জ।

## তোমারেই চাই।

রাগিণী মুলতান—তাল মধ্যমান।

তোমারে যে নাহি পায়
সে যে নিরুপায় ;
তোমারে যে ছেড়ে হায়
সে যে অসহায়।
তব নাম যে না বলে
ধিক্ তার বলে ;
তুমি যাহারে বিমুখ
তার ম্লানমুখ ;
তাই তোমা পানে চাই
তোমারেই চাই।

---

## হৃদয়ের প্রত্যুষে।

রাগিণী ভৈরব—তাল আড়াঠেকা।

আমার এ হৃদয়ের মায়া
যেন প্রত্যুষের আলোছায়া ;—
স্নিগ্ধ সুমধুর আশাময়
নব প্রাণে হইছে উদয় ;
গেয়ে ওঠে অন্তরের পাখী
সাধ্য নাহি তারে ধ'রে রাখি
আনন্দে নাচিয়া উড়ে যায়
কাছে ডাকি তারে আয় আয়।



## প্রকৃত শক্তি।

রাগিণী ধনাশ্রী—তাল জলদ তেতালা।

তুচ্ছ মনে হয় মান অপমান
ভাবি যবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান,
অহমিকা অহঙ্কার মম এই
হায় হায় ইহাতে পদার্থ নেই ;
ইহারা ফাঁপিয়া ওঠে নিজ বলে
জানিও নাহিক সার তার তলে ;
তাঁর শক্তি তাহাই প্রকৃত শক্তি
তাতেই আছে মোর বিশ্বাস ভক্তি।

---

## কে কোথায়।

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল তেওট।

দু'দিনের তরে
এই চরাচরে
তারপর কে কোথায় ;
মিলিয়া গো দোঁহে
সুমধুর মোহে!
শেষে হায় কে কোথায়!
হায় এ প্রণয়
এই পরিণয়
যেন মিছে ;—কে কোথায়
কে কাহার তরে
এই চরাচরে
কে কোথায় কে কোথায়!

## ভারত জননীর প্রতি।

রাগিণী দেশ—তাল পটতাল।

হায় ভারত জননীরে
আজি ভাসিছে অশ্রুনীরে ;
হায় হ'য়েছে কি দুঃখিনী
হেন দশা কভু দেখিনি,
মিলিয়া সকল সন্তান
এস করি সান্ত্বনাদান।

## হাসি।

রাগিণী সিন্ধু—তাল যৎ।

হাসিটি তব সুধা
বশ করে বসুধা ;—
ধারা তার ব'হে যায় ধীরে যেন ফুলবায়
ও হাসি মধুহাসি
বিরাজে প্রাণে আসি।
যেন রে পরিমল
সুন্দর নিরমল,
মেঘ মাঝে শশী সম শোভে কিবা অনুপম,
হইলেই উদয়
আকুল এ হৃদয়।

## তিনি।

রাগিণী হিণ্ডোল—তাল একতালা।

নীরবে নদীর তীরে বসিয়া একেলা,
ভাবিয়া দেখিছি এই জগতের খেলা ;
খেলার বিরাম নাই চলিয়াছে স্রোত
তার মাঝে র'য়েছেন তিনি ওতপ্রোত।



## সেই কথা।

রাগিণী সুরট—তাল ঝাঁপতাল।

সেই কথা সেই কথা
স্মরিলেই পাই ব্যথা ;
হৃদি জরজর করে
প্রাণ বেঁচে থেকে মরে ;
ভুলে যাইলেই ভালো
তাহা অন্ধকার কালো ;—
তবু ভুলে যেতে ভুলি
ভুলে সেই কথা তুলি।

## বোঝা দায়।

বেহাগ—সুরফাঁকতাল।

কেহ ঘৃণা করে মোরে কেহ উপহাসে
কেহবা প্রাণের সঙ্গে মোরে ভালবাসে ;
কতরূপ লোক আছে কতরূপ মন !—
হায় হায় বোঝা দায় লোকেরা কেমন।

## সুন্দরি।

ইমনকল্যাণ।

তোমার হাসিতে আমি চাইনা দিইতে বাধা
সুন্দরি !
মধুর হাসিতে তব পরাণটী মম বাঁধা
সুন্দরি।
তোমার হাসিটী আহা ভাবিলে প্রাণের মাঝে
সুন্দরি !
ঝঙ্কারিয়া চারিধারে যেন শত বীণা বাজে।
সুন্দরি।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# অভিব্যক্তিবাদের আপত্তি খণ্ডন।

মঙ্গলময় ভগবান এক, তাঁহার শক্তি অনেক। তাই উপনিষদ্‌কার ঋষি বলিয়াছেন "য একো বর্ণো বহুধা শক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি" যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্যবস্তুসকল বিধান করিতেছেন। তাঁহারই ইচ্ছাতে এই সকল কাম্যবস্তু বিধানের উপায়স্বরূপে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত নিয়মদ্বয়, জীবনসংগ্রাম ও পরিবৃত্তি প্রাণরাজ্যে কার্য্য করিতেছে। পাছে এই সকল অপ্রতিহত প্রভাব স্বীকার করিলে ঈশ্বর অস্বীকৃত হইয়া পড়েন, এই ভয়ে অনেক ধর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তি উক্ত নিয়মমূল অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন। মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছাতেই এই সকল নিয়ম স্ব স্ব কার্য্যে ধাবমান হইতেছে, এই ভাবটী দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিলে তাঁহাদের এই ভয় থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া একটী নিয়মও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; একটী ঘটনাও ঘটিতে পারে না। তিনি যে কি উপায়ে জগৎসংসার নিয়মিত করিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা সেই উপায় সমূহেরই বিষয় আলোচনা করিয়া, তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া অনুধাবন করিয়া নিজেরাই জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হই এবং আনন্দ লাভ করি।

জীবাদি (প্রাণপঙ্ক) হইতে উন্নতি হইতে হইতে বানরের অভিব্যক্তি হইয়াছে এবং বানর হইতে মানবের অভিব্যক্তি সম্ভব, এই কথাটী এত নূতন ও বিস্ময়োৎপাদক যে উপরোক্ত ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত জনসাধারণেও ইহা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক এবং অনেক বৈজ্ঞানিকও ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি দর্শাইয়া অনেকাংশে অস্বীকার করিতে প্রস্তুত। পৃথিবীতে যখন এমন অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি দৃষ্ট হয়েন, যাঁহারা ভগবানের অস্তিত্বও অস্বীকার করেন, তখন তাঁহার একটি নিয়মের মর্ম্মানভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি যে দৃষ্ট হইবে তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে "সাধারণের বাণী ঈশ্বরের বাণী।" বিজ্ঞানরাজ্যে সকল সময়ে একথা খাটে না। সাধারণের কথা হইল যে সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; দেখিতে বলিতে ইহা অতি



সহজ কথা, সহজেই জনসাধারণের বিশ্বাস হইবার কথা। বিজ্ঞানে সপ্রমাণ হইল যে সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে না, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সপ্রমাণ হইলেও ইহা প্রথম আবিষ্কারকালে জনসাধারণ এবং অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কর্ত্তৃক ভ্রান্তবোধে অস্বীকৃত হইয়াছিল। এই যেমন সাধারণের বাণীকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না, অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধেও সেইরূপ সাধারণ মতামত ঈশ্বরের বাণী বা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা অপারগ। এই সকল বিষয় বহির্বিষয় সম্বন্ধীয়, সুতরাং বাহিরের পরীক্ষা সাপেক্ষ—অন্তর্বিষয় সম্বন্ধীয় নহে যে অন্তর্গ্রাহ্য মতামতের উপর সত্যতা নির্ভর করিবে।

অভিব্যক্তিবাদের প্রসার আজকাল বড়ই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। জগতে আদি সৃষ্টি অবধি মানবের সৃষ্টি পর্য্যন্ত সকলই আজকাল অভিব্যক্তিবাদের অবলম্বনীয় বিষয় বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। এক সময়ে এই পৃথিবী সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাষ্পাকারে অবস্থিত ছিল, ক্রমে তৃণাচ্ছাদিত এই শ্যামলসুন্দর আকার ধারণ করিয়াছে—ইহাও অভিব্যক্তিবাদের অন্তর্গত; ইহা বিজ্ঞানে স্থিরসিদ্ধান্ত হইলেও সাধারণ লোকে কি সহজে বিশ্বাস করিবে? বিশ্বাস করিবে না। জীবাদি হইতে মানবের অভিব্যক্তিকেই বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষভাবে অভিব্যক্তিবাদের বিষয় বলিয়া ধরিয়াছেন, আমরাও তাহাই স্বীকার করিয়াছি এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে অভিব্যক্তিবাদ বলিলেই জীবের এবং মানবের অভিব্যক্তিবিষয়ক আলোচনাই বুঝিতে হইবে। ডার্বিন, ওয়ালেস প্রভৃতি মনীষীগণ এই অভিব্যক্তিবাদকে একপ্রকার সিদ্ধান্তরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। একটি আপত্তি উঠিবে না, পৃথিবীতে এমন কোনো কিছু মত আছে কি? সুতরাং অভিব্যক্তিবাদেরও বিরুদ্ধে যে একটিও আপত্তি উত্থাপিত হইবে না, তাহা বিবেচনা করা ভ্রান্তি। মানবের অভিব্যক্তি জনসাধারণের নিকট উপহাসের কথা; কিন্তু যাঁহারা এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেও কতকগুলি আপত্তি উঠিতে দেখা যায়। আমাদিগের দেখিতে হইবে যে সেই সকল আপত্তি দ্বারা অভিব্যক্তিবাদকে নিরাস করা যায় কি না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সকলগুলি আলোচিত হওয়া অসম্ভব, কেবল প্রধান প্রধান আপত্তিগুলিরই আলোচনা হইবে।

অভিব্যক্তিবাদীরা বলেন যে যদি বা বানর হইতে মানবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহা একেবারে সম্পন্ন হয় নাই—মধ্যে ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত অনেক প্রাণী বানরের পরে হইয়াছে, সর্ব্বশেষ পরিবর্ত্তিত জীব মানবের আদি এবং সেই আদিম মানব ক্রমশ পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান উন্নত আকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিরোধী পক্ষ বলেন যে তাহাই যদি হইবে, তবে আমরা আজ পর্য্যন্ত সেই সকল মধ্যবর্ত্তী জীব, কি জীবিত, কি ভূগর্ভে প্রোথিত, কোন অবস্থায়ই দৃষ্টিগোচর করিনা কেন? জীবনসংগ্রামকে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের একটী প্রধান উপকরণ স্বীকার করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে মধ্যবর্ত্তী জীবনকাল জীবিতাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হওয়া দুরূহ। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এবং অযোগ্যের বিনাশসাধন পরস্পরের অনুবর্ত্তী। মধ্যবর্ত্তী জীবগণ ভূগর্ভে প্রোথিত অবস্থায়ও দৃষ্টিগোচর না হইবার কারণ এই যে ভূগর্ভস্থ সাক্ষ্যসমূহ এখনও ভালরূপে সংগৃহীত হইতে পারে নাই, অনেকস্থলে সংগ্রহ করাও অসম্ভব। বর্ত্তমানের অনেক দ্বীপ বহুপূর্ব্বে মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল এবং পূর্ব্বে যে সকল স্থান মহাদেশের সহিত বিচ্ছিন্ন ছিল, বর্ত্তমানে সেগুলি মিলিত হইয়াছে, কত স্থান সমুদ্রের গর্ভরূপে পরিণত হইয়াছে, কতস্থান সমুদ্রের গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তী জীবের কত কঙ্কাল রাসায়নিক কারণে পঞ্চভূতে মিশাইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় সমস্ত মধ্যবর্ত্তী যোগগুলি সম্পূর্ণ সংগৃহীত হওয়া কি অসম্ভব নহে? সমুদ্রের গর্ভে যেগুলি প্রোথিত আছে, সেগুলি বর্ত্তমানে কি নিঃশেষে পাওয়া যাইতে পারে? আমরা বাল্যকাল অবধি দেখিয়া আসিতেছি যে, তখনও আমাদের বাগানের নারিকেল গাছে যতগুলি চিলকাক বসিত, আজও প্রায় সেই সংখ্যকই চিলকাক বসিয়া থাকে। এই বিশত্রিশ বৎসর যে চিলকাকদিগের শাবক হয় নাই তাহা নহে—তবে সেই সকলের কি অবস্থা হইল? অভিব্যক্তিবাদীরা বলেন যে প্রত্যেক বৎসরেই রাশি রাশি পক্ষী সমুদ্রের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তথায় প্রাণত্যাগ করে। এইরূপে মধ্যবর্ত্তী কত পশু পক্ষী যে সমুদ্রগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? এই সকল সাক্ষ্য সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে হইলে সমগ্র মহাসাগর ছেঁচিয়া ফেলিতে হয়, তাহা হইলেও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।



যাই হৌক, ভূগর্ভে অভিব্যক্তিবাদের যে সকল সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

এখন কথা এই যে, ইহাও যদিবা স্বীকার করা যায় যে উন্নত জীবের অভিব্যক্তি ফলে নিম্নবর্ত্তী জীবের বিনাশসাধন হওয়াতে তাহাদের চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না, তথাপি সেই মধ্যবর্ত্তী জীব শৃঙ্খলস্বরূপে যে দুই উন্নত ও অনুন্নত জীবের সংযোগ সাধন করিয়াছিল, তন্মধ্যে অনুন্নত জীবেরও অস্তিত্ব দেখিতে পাই কিরূপে—অনুন্নত জীবের বিলোপসাধন কি উচিত ছিল না? দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাউক। বানর হইতে যদি মানব অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, প্রশ্ন এই যে উহাদের মধ্যবর্ত্তী জীবগুলির অস্তিত্ব দেখি না কেন? যদি বল যে তাহাদের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, তবে তাহাদেরও নিম্নস্থ জীব বানরের বিলোপসাধন না হইল কেন? বানর হয়তো অনুকূল অবস্থা পাইয়া অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের কতক অংশ হয়তো দেশকালের গুণে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে মানবাকারে উপস্থিত হইয়াছিল। মধ্যবর্ত্তী জীবগণ স্বভাবতই অল্পসংখ্যক হইয়া থাকে। মানবাকৃতি আদিম মানবও হয়তো অনুকূল দেশকাল পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন সীমাবর্ত্তী বানর ও মানবের আধিক্যবশত অল্পসংখ্যক জীবদিগের বিনাশ সাধনই অধিকতর সম্ভব। এখানেও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। মনে কর, একস্থানে ঘাসতৃণ যথেষ্ট আছে, চারহাত লম্বা বৃক্ষাদি যথেষ্ট আছে, আবার দশবারো হাত লম্বা বৃক্ষাদিও বহুল আছে। আরও মনে কর যে এইস্থানে তৃণভক্ষণের উপযুক্ত ছাগল, ১২ হাত উচ্চ বৃক্ষ খাইবার উপযুক্ত জিরাফ এবং ৪ হাত উচ্চ বৃক্ষের উপযুক্ত গরু আছে। তৃণ ঘাস খুবই পাওয়া যায়, ছাগলগুলি তাহাই খাইয়া বাড়িয়া যাইবে; জিরাফের আহার্য্যেও অপর দুই প্রাণী দন্তস্পর্শ করিতে অক্ষম, সুতরাং তাহাদেরও বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা। এইরূপে উভয় সীমাবর্ত্তী জীবদিগের বংশবৃদ্ধিবশত আহার বিষয়ক কষ্ট হইলেই, মধ্যবর্ত্তী জীবের আহার্য্যের প্রতিই সকলে আকৃষ্ট হইবে। সুতরাং মরিতে গেলে মধ্যবর্ত্তী জীবদিগেরই মরণের সম্ভাবনা অধিক। তবে, তাহারা যদি সীমাবর্ত্তী জীব অপেক্ষা যোগ্যতর হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারাই বাঁচিয়া যাইবে এবং যে প্রান্তবর্ত্তী জীবের বিনাশে তাহারা বাঁচিবে, তাহা-

দিগকে সেই প্রান্তবর্ত্তী জীব বলিয়াই পরিগণিত করা হইবে। মোটের উপর কথা এই যে, অযোগ্যতানিবন্ধন বানর মানবের এবং অন্যান্য বর্ত্তমানে বিচরণশীল প্রাণীগণের মধ্যবর্ত্তী জীবদিগের বিনাশ সাধন ঘটিয়াছে।

মধ্যবর্ত্তী প্রাণীদিগের উৎপত্তির সম্ভাবনাই আছে কিনা? অবশ্যই আছে। কপোত পালকেরা এক গোলা পায়রা হইতেই কত রকমের পায়রা প্রস্তুত করে। কুকুর পালকেরা এক জোড়া কুকুর হইতে কত প্রকারই কুকুর প্রস্তুত করে। আমরা দেখিয়াছি যে দুই তিন পুরুষ চাষের ফলে ভূম্যবলুণ্ঠিতকর্ণ ছাগল প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল গৃহপালিত পশুদিগের পরিবর্ত্তন মনুষ্যকর্ত্তৃক বিশেষ বিশেষ অংশে সাধিত হয়। কিন্তু প্রকৃতি সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, এই কারণে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে যখন কোন প্রাণী প্রস্তুত হয়, তখন তাহাকে তাহার আদি পুরুষ হইতে পৃথক বলিয়া সহজেই উপলব্ধ করা যায়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের বিষয় পরিবৃত্তি প্রবন্ধে বিস্তারিতরূপে বলিয়া আসিয়াছি, সুতরাং এখানে তদ্বিষয়ে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এইবারে দ্বিতীয় আপত্তির বিষয় আলোচনা করিব। সেই আপত্তি যদিও বিশেষ গুরুতর নহে, তথাপি তাহা অবান্তরভাবে সুপ্রসিদ্ধ হার্বার্ট স্পেন্সারের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া তদ্বিষয়ে দুইচারি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। আপত্তিটী এই যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে যেন স্বীকার করা গেল যে পশ্চিমে ছাগলগুলি লম্বা হইয়াছে, বঙ্গদেশের ঘোড়াগুলি খর্ব্বকায় হইয়াছে, কিন্তু সেই নির্ব্বাচনের ফলে কি চক্ষুর ন্যায় জটিল ও স্পর্শাসহ বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে? ডার্বিনের সম্প্রদায় বলেন, নিশ্চয়ই পারে। চক্ষুর সর্ব্ব আদিম অবস্থা ছাড়িয়া দিলেও আমরা তারামাছে ( starfish ) চক্ষের উৎপত্তির আদিম অবস্থা অনুভব করিতে পারি। অপেক্ষাকৃত উন্নত চক্ষে যে স্তরে বর্ণপুটিকা ( pigment cell ) থাকে তারামাছের সেই স্তরে জিলেটিনের ন্যায় তরল পদার্থে পূর্ণ কতকগুলি গর্ত্ত প্রধান শিরাকে ঘিরিয়া অবস্থিত, আর সম্মুখে একখানি ন্যুব্জ lens। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ইহা দ্বারা উক্ত মাছ কেবল সম্মুখস্থ জিনিষের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে, আকার প্রকার জানিতে পারে না। এই আদিম চক্ষু হইতে ক্রমে যে এই জটিল চক্ষুর



অভিব্যক্তি হইতে পারে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ কেণ্টকি গুহাস্থিত হ্রদের মৎস্য প্রভৃতি জীবগুলির চক্ষুর ঠাট বজায় আছে মাত্র, কিন্তু তাহাতে চক্ষুর কার্য্য হয় না——ঘন অন্ধকার বশতঃ কারণের অভাবে অব্যবহার হেতু চক্ষের বিলোপসাধনের সূত্রপাত হইয়াছে। ঊর্দ্ধচক্ষু নামে একপ্রকার মৎস্য আছে, তাহার দুইটী চক্ষুই ঊর্দ্ধগতি। এই মৎস্য একপেশে হইয়া কাদায় বিচরণ করে, কাজেই কাদার দিকের চক্ষু অব্যবহৃত থাকিয়া যায়। দেখা গিয়াছে যে, এই মৎস্যের ছানাদের প্রথম অবস্থায় দুই দিকেই চক্ষু থাকে, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই নিম্নদিকের চক্ষু আবর্ত্তন সহকারে ঊর্দ্ধদিকে আনীত হয়। মাছের ফুসফুস প্রথমে ভাসিবার জন্য চর্ম্মপুটিক মাত্র আকারে বর্ত্তমান ছিল, এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য "কানকা" ছিল; ক্রমে ব্যবহারের বলে সেই চর্ম্মপুটিকাই ফুসফুসের স্থান গ্রহণ করিয়া নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে লাগিল এবং "কানকা" ক্রমে কর্ণে পরিণত হইল। স্তনেরও আদি অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে একপ্রকার আদিম জীবের স্তনের পরিবর্ত্তে বক্ষের নিম্নে একপ্রকার থলী আছে, তাহাতে দুগ্ধের ন্যায় তরলপদার্থ বিদ্যমান থাকে, প্রয়োজন হইলেই শাবকগণ তাহা হইতে অন্য আকারে স্তন্যপানই করিয়া থাকে। এই প্রকারে যখন দেখিতেছি যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গের বিকাশ, বিলোপ, গতিপরিবর্ত্তনাদি সাধিত হইতেছে, তখন চক্ষুর ন্যায় স্পর্শাসহ বস্তুরও উন্নত আকার ও জটিলসাধনও যে হওয়া সম্ভব, তাহা অস্বীকার করিব কি প্রকারে?

এইখানে হার্বার্ট স্পেন্সের বলেন যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অপেক্ষা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার এবং পরিপার্শ্বের ( environment ) উপর এই সকল পরিবর্ত্তন অধিক পরিমাণে নির্ভর করে এবং এবিষয়ে নাকি ডার্বিন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। কথাটা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। এ বিষয়ে যতটুকু বলিবার প্রয়োজন, ডার্বিন তাহা বলিয়াছেন। ডার্বিন তাঁহার "জীবশ্রেণীর মূল" ( Origin of species ) গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে লিখিতেছেন—"যে সকল ঘটনা ও বিতর্কের ফলে সুদীর্ঘ অবরোহকালে প্রাণীগণের পরিবর্ত্তনের বিষয়ে আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, সেই সকল পুনরুল্লেখ করিলাম। উপর্য্যুপরি নানা স্বল্প, অনুকূল ও বংশানুগত পরিবর্ত্তন প্রাকৃতিক

নির্ব্বাচনদ্বারা সংগৃহীত হইয়া (এই অভিব্যক্তি) সংসাধিত হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে প্রত্যঙ্গ সমূহের ব্যবহার ও অব্যবহার গুরুতর সহায়তা করিয়াছে এবং পরিপার্শ্ব শারীরিক গঠনাদির উপযোগিতা সম্পর্কে সহায়তা করিলেও তত বিশেষভাবে করে না। * স্পেন্সরের বুঝিবার ভুল যে ডার্বিন অঙ্গ সমূহের ব্যবহারও অব্যবহারের উপর ঝোঁক দেন নাই। ব্যবহার অব্যবহার এবং অন্যান্য নানা কারণের সমবায়ে যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, সেই সকল পরিবর্ত্তনরূপ উপকরণ না পাইলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কি করিতে পারে? শূন্যে শূন্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্য চলিতে পারে না। আবার, প্রকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে গেলে এই সকল পরিবর্ত্তন এক পুরুষে হইলে চলিবে না, পরিবর্ত্তন বংশানুগত হওয়া আবশ্যক। অধ্যাপক বেইসম্যান (Prof. Weisman) বলেন যে নবার্জিত অভ্যাসগুলি বংশানুক্রমিত হয় না, যে সকল অভ্যাসের ফলে শরীরের আভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্ত্তিত হয়, সেই গুলিই বংশগত হয়। চীনবাসীগণ পা ছোট করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু তাহাদের সন্তানেরা ছোট পা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। যদি এইরূপ ক্ষুদ্রপদ হওয়ায় কোন বিশেষ উপকার হইত, তাহা হইলে হয়তো প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে চীনবাসীগণ ক্ষুদ্রপদ হইয়া জন্মাইতে পারিত। এই অবস্থায় ডার্বিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারের উপর এবং পরিপার্শ্বের উপর যতটুকু ঝোঁক দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে, স্পেন্সর ততটা দিতে চাহেন, ততটা সঙ্গত কিনা বলা সুকঠিন।

* "I have now re-capitulated the facts and considerations which have thoroughly convinced me that species have been modified during a long course of descent. This has been effected cheifly through the natural selection of numerous successive, slight, favouraeble variations; aided in an important manner by the inherited effects of the use and disuse of parts; and in an unimportant manner—that is, in relation to adaptive structures whether past or present, by the direct action of external conditions and by variations which seem to us, in our ignorance, to arise spontaneously."



অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় আপত্তি এই যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে নিম্নজীব সমূহের স্বাভাবিক সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেন, পারে। আমরা যাহাকে সহজ সংস্কার বলিয়া মনে করি, তাহা যে অর্জিত সংস্কার নহে কে বলিতে পারে? আমরা উপর উপর দেখিয়া মনে করি বটে যে মধুমক্ষিকারা নিখুঁত ভাবে তাহাদের চাক নির্ম্মাণ করে—অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে যে মধুমক্ষিকারা সমানভাবে আবাসগর্ত্ত সমূহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। * আমরা মনে করি বটে যে পাখীরা স্বাভাবিক সংস্কার বশে নিখুঁত বাসা প্রস্তুত করে—ইহা ভ্রান্তি। সুপ্রসিদ্ধ বিহগতত্ত্ববিৎ উইলসন এবং লেরয় (Wilson and Leroy) বলেন যে অল্প বয়স্ক পক্ষীগণ অধিক বয়স্ক পক্ষী অপেক্ষা বাসা মন্দ প্রস্তুত করে। পিঞ্জরাবদ্ধ গৃহপালিত পক্ষীগণ বাসার উপকরণ পাইলেও নীড় নির্ম্মাণ করিতে পারে না, তাহার কারণ তাহারা বাসা প্রস্তুত করিবার প্রণালী দেখে নাই, সুতরাং অবগত নহে। আমরা দেখি কাক পক্ষী যখন আহার চুরি করিতে উদ্যত হয়, তখন স্বাভাবিক সংস্কার অপেক্ষা বুদ্ধিপ্রয়োগ কি অধিক দৃষ্ট হয় না? অনেক কাক টিনের লম্বা ফালি সংগ্রহ করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে দেখা গিয়াছে, কিন্তু যদি ইহা স্বাভাবিক সংস্কার বশে হইত, তাহা হইলে তাহারা চকচকে জিনিস দেখিলেই তাহা লইয়া গিয়া টিনের ফালির সহিত ভেজাল দিবার চেষ্টা করে কেন? এমনও দেখা গিয়াছে যে তাহারা বাসা নির্ম্মাণের জন্য একটা ডাল লইয়া গিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারে না; কিম্বা একটা কোন পদার্থ লইয়া গিয়াছে, তাহা অনুপযোগী হওয়াতে অন্য পদার্থ লইয়া গিয়াছে। এ সকল অভ্রান্ত সহজ সংস্কারের ফল বলিয়া স্বীকার করা বড়ই কঠিন। আমরা ভাবিতাম বটে যে প্রব্রজনশীল পক্ষীগণ স্বীয় অভ্রান্ত সংস্কারবলে দেশদেশান্তরে গমন করে। এখন সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে তাহারা দৃষ্টিবলেই এইরূপ গমন করে, এই কারণে চাঁদিনী যামিনীতে তাহারা খুব উচ্চে উঠিয়া গমন করে, মেঘলা রাত্রে অনেক নীচে উড়িয়া থাকে। সহস্র সহস্র পক্ষী যে সমুদ্রে উড়িয়া গিয়া দেশান্তর পাইবার

* Darwin's Origin of species দেখ।

পরিবর্ত্তে প্রাণত্যাগ করে, সংস্কারের অভ্রান্ততার বিরুদ্ধে তাহাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নহে? যাহাদের সংস্কার তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিপ্রয়োগে দৃঢ় দাঁড়াইয়াছে, তাহারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে বাঁচিয়া যায় এবং এইরূপে সংস্কারের ও উন্নত আকারে অভিব্যক্তি কি কিছু আশ্চর্য্য? আবার, শারীরিক পরিবর্ত্তন, সংস্কার এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন পরস্পর সাপেক্ষ। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে বুদ্ধিপ্রয়োগ হেতু মস্তিষ্ক যতই আবর্ত্তিত হইবে, সংস্কারেরও যে ততই পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে তাহা অতি সহজেই অনুমিত হইতে পারে। অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে এইরূপ নানা আপত্তি উত্থাপন করা সহজ, এবং আমরা প্রত্যেক জীবের অবস্থা, বাসপ্রণালী, খাদ্যসংগ্রহপ্রণালী সম্যক্ জানিতে পারি নাই বলিয়া অনেকস্থলে সেই সকল আপত্তি খণ্ডন করা কঠিন হইয়া পড়ে, কিন্তু সচরাচর যেরূপ প্রমাণ অবলম্বনে অপরাপর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস করি, আমাদের বিশ্বাস যে অভিব্যক্তিবাদের সত্যতা বিষয়ে ততটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আর একটী আপত্তির বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আপত্তিটী এই—একই জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর (species) প্রাণীদ্বয়ের সঙ্গমে হয় শাবক হয় না, অথবা শাবক হইলেও তাহারা ঊষর হয়, কিন্তু একই জাতির বিভিন্ন বর্ণের (variety) সঙ্গমে এরূপ ঊষরতা উপস্থিত হইতে দৃষ্ট হয় না। কেন? এই আপত্তিটী সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না যে ইহা দ্বারা অভিব্যক্তিবাদ সম্পূর্ণ নিরাস হইতেছে কি প্রকারে? যাই হৌক্, আপত্তিও যুক্তিতে দাঁড়ায় না। শ্রেণীর সংযোগে ঊষরতা সার্ব্বভৌমিক নহে। আসল কথা এই যে খুব কাছাকাছি অথচ গভীর বিভিন্নতার সংযোগেই ঊষরতা আইসে। আবার দেখা গিয়াছে যে বন্য অবস্থায় যাহারা ঊষর ছিল, তাহাদের পোষ মানাইলে ঊষরতা চলিয়া যায়। কেবল বিভিন্ন শ্রেণীর সংযোগে কেন—এমনও দেখা গিয়াছে যে গরম দেশের হাঁস শীতপ্রধান দেশে আনীত হওয়ায় ঊষর হইয়া গিয়াছে। আরও দেখা গিয়াছে, যে সকল শ্রেণীর প্রাণীগণের পরস্পরের শারীরিক গঠন ও অবস্থায় সাদৃশ্য আছে, সেই সকল প্রাণী সহজে সঙ্গত হয় এবং অনুর্ব্বর হয় না। কিন্তু যে সকল শ্রেণীর পরস্পরের



গঠন ও অবস্থা অনেকটা বিসদৃশ, তাহারা দূর সম্পর্কীয় হইলেও সহজে সঙ্গত হয় না এবং হইলেও ঊষর হইবার সম্ভাবনা আছে। ডার্বিন বলেন যে উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সহিত ঊষরতার কোনই সম্পর্ক নাই। নানা কারণে যখন উর্ব্বরতা রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা, তখন উর্ব্বরতা বা অনুর্ব্বরতার কারণে বিবেচনা করিবার কোনই হেতু দেখিতেছি না যে বর্ণবিভাগ হইতে ক্রমশ শ্রেণীবিভাগ আসিতে পারেই না। ঊষরতার আপত্তি যুক্তিযুক্ত হউক বা না হউক, এখন দেখিতেছি যে তাহা অভিব্যক্তিবাদকে নিরাস করিতে পারে না।

পরিশেষে আর একবার বলি যে অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে রাশীকৃত আপত্তি প্রদর্শনের কোনই প্রয়োজন নাই, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকৃত হইলেও ভগবানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না অস্বীকৃত হইলেও তাঁহার অস্তিত্ব দৃঢ়-প্রমাণিত হইবে না। অভিব্যক্তি একটী প্রণালীমাত্র—মূলে সেই ভগবানের ইচ্ছা। কেন জীবনসংগ্রাম কার্য্য করিতেছে, কেন পরিবৃত্তি কার্য্য করিয়া প্রাণরাজ্যে বিচিত্রতা আনয়ন করিতেছে? এ সকলই সেই ভগবানের ইচ্ছার বিকাশ ব্যতীত আর কি বলিব? একটী ঘটনা, একটী রেণু যখন তাঁহার অগোচরে উঠিতে পড়িতে পারে না, তখন আমরা এত ভয় পাইব কেন? যে প্রকার প্রণালী সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হউক না কেন, সর্ব্বোপরি তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা। আমি দর্শকমাত্র—দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি যে কি অভিব্যক্তিবাদী, কি সংসৃষ্টিবাদী, সকলেই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কেবল সেই ভগবানেরই বিজয় ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

পরিবর্ত্তে প্রাণত্যাগ করে, সংস্কারের অভ্রান্ততার বিরুদ্ধে তাহাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নহে? যাহাদের সংস্কার তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিপ্রয়োগে দৃঢ় দাঁড়াইয়াছে, তাহারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে বাঁচিয়া যায় এবং এইরূপে সংস্কারের ও উন্নত আকারে অভিব্যক্তি কি কিছু আশ্চর্য্য? আবার, শারীরিক পরিবর্ত্তন, সংস্কার এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন পরস্পর সাপেক্ষ। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে বুদ্ধিপ্রয়োগ হেতু মস্তিষ্ক যতই আবর্ত্তিত হইবে, সংস্কারেরও যে ততই পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে তাহা অতি সহজেই অনুমিত হইতে পারে। অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে এইরূপ নানা আপত্তি উত্থাপন করা সহজ, এবং আমরা প্রত্যেক জীবের অবস্থা, বাসপ্রণালী, খাদ্যসংগ্রহপ্রণালী সম্যক্ জানিতে পারি নাই বলিয়া অনেকস্থলে সেই সকল আপত্তি খণ্ডন করা কঠিন হইয়া পড়ে, কিন্তু সচরাচর যেরূপ প্রমাণ অবলম্বনে অপরাপর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস করি, আমাদের বিশ্বাস যে অভিব্যক্তিবাদের সত্যতা বিষয়ে ততটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আর একটী আপত্তির বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আপত্তিটী এই—একই জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর (species) প্রাণীদ্বয়ের সঙ্গমে হয় শাবক হয় না, অথবা শাবক হইলেও তাহারা ঊষর হয়, কিন্তু একই জাতির বিভিন্ন বর্ণের (variety) সঙ্গমে এরূপ ঊষরতা উপস্থিত হইতে দৃষ্ট হয় না। কেন? এই আপত্তিটী সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না যে ইহা দ্বারা অভিব্যক্তিবাদ সম্পূর্ণ নিরাস হইতেছে কি প্রকারে? যাই হৌক্, আপত্তিও যুক্তিতে দাঁড়ায় না। শ্রেণীর সংযোগে ঊষরতা সার্ব্বভৌমিক নহে। আসল কথা এই যে খুব কাছাকাছি অথচ গভীর বিভিন্নতার সংযোগেই ঊষরতা আইসে। আবার দেখা গিয়াছে যে বন্য অবস্থায় যাহারা ঊষর ছিল, তাহাদের পোষ মানাইলে ঊষরতা চলিয়া যায়। কেবল বিভিন্ন শ্রেণীর সংযোগে কেন—এমনও দেখা গিয়াছে যে গরম দেশের হাঁস শীতপ্রধান দেশে আনীত হওয়ায় ঊষর হইয়া গিয়াছে। আরও দেখা গিয়াছে, যে সকল শ্রেণীর প্রাণীগণের পরস্পরের শারীরিক গঠন ও অবস্থায় সাদৃশ্য আছে, সেই সকল প্রাণী সহজে সঙ্গত হয় এবং অনুর্ব্বর হয় না। কিন্তু যে সকল শ্রেণীর পরস্পরের



গঠন ও অবস্থা অনেকটা বিসদৃশ, তাহারা দূর সম্পর্কীয় হইলেও সহজে সঙ্গত হয় না এবং হইলেও ঊষর হইবার সম্ভাবনা আছে। ডার্বিন বলেন যে উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সহিত ঊষরতার কোনই সম্পর্ক নাই। নানা কারণে যখন উর্ব্বরতা রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা, তখন উর্ব্বরতা বা অনুর্ব্বরতার কারণে বিবেচনা করিবার কোনই হেতু দেখিতেছি না যে বর্ণবিভাগ হইতে ক্রমশ শ্রেণীবিভাগ আসিতে পারেই না। ঊষরতার আপত্তি যুক্তিযুক্ত হউক বা না হউক, এখন দেখিতেছি যে তাহা অভিব্যক্তিবাদকে নিরাস করিতে পারে না।

পরিশেষে আর একবার বলি যে অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে রাশীকৃত আপত্তি প্রদর্শনের কোনই প্রয়োজন নাই, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকৃত হইলেও ভগবানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না অস্বীকৃত হইলেও তাঁহার অস্তিত্ব দৃঢ়-প্রমাণিত হইবে না। অভিব্যক্তি একটী প্রণালীমাত্র—মূলে সেই ভগবানের ইচ্ছা। কেন জীবনসংগ্রাম কার্য্য করিতেছে, কেন পরিবৃত্তি কার্য্য করিয়া প্রাণরাজ্যে বিচিত্রতা আনয়ন করিতেছে? এ সকলই সেই ভগবানের ইচ্ছার বিকাশ ব্যতীত আর কি বলিব? একটী ঘটনা, একটী রেণু যখন তাঁহার অগোচরে উঠিতে পড়িতে পারে না, তখন আমরা এত ভয় পাইব কেন? যে প্রকার প্রণালী সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হউক না কেন, সর্ব্বোপরি তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা। আমি দর্শকমাত্র—দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি যে কি অভিব্যক্তিবাদী, কি সংসৃষ্টিবাদী, সকলেই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কেবল সেই ভগবানেরই বিজয় ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# ছেঁড়া কাগজের ডোমলা।

## জয়পুরী শিল্প।

আমরা যে কত ছেঁড়া কাগজ ফেলে দিই তার ঠিকানা নাই। এই ছেঁড়া কাগজকে যে কত কাজে লাগান যাইতে পারে ও ইহা হইতে যে কত জিনিষ তৈয়ারি হইতে পারে তাহা আমাদের জানা নাই। আমরা আজ পুণ্যের পাঠক পাঠিকাগণকে এই ছেঁড়া কাগজ হইতে এমন এক জিনিষ প্রস্তুত করিবার উপায় বলিব যাহা তাঁহাদের গৃহে অনেক কাজে লাগিতে পারে। যে দেশে ধামা চুপ্‌ড়ি ইত্যাদি কিছু পাওয়া যায় না, যেখানে পাথরের বা ধাতু নির্ম্মিত থালা বাটী পাওয়া যায় না সেখানে এই ছেঁড়া কাগজের ধামা চুপড়ি ও থালা বাটী প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে পারিলে জিনিষ রাখিবার জন্য পাত্রের অভাব পূরণ হইতে পারে। ইহাতে খরচ খুবই কম। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে বলা যাইতেছে। প্রথমে ছেঁড়া কাগজ গুলা একটা কলসীতে ভিজাইয়া রাখিবে। কাগজগুলা কলসীতে ভিজিয়া একেবারে পচিয়া গেলে হামালদিস্তাতে কুটিতে হইবে। খুব মোলায়েম করিয়া কুটিয়া উহাতে মেথি গুঁড়া, খোল ভিজানো এবং মুলতানী মাটী ভিজানো মাখাইয়া লইবে। একসের ছেঁড়া কাগজ হইলে তাহাতে এক ছটাক মেথি গুঁড়া, আধসের খোল ও আধসের মুলতানী মাটী এই হিসাবে মিলাইতে হইবে। মুলতানী মাটী অনুসন্ধান করিলে কলিকাতার বড়বাজারে পাওয়া যায়। সব এক সঙ্গে মাখান হইলে একটা পিতলের কিম্বা মাটির কলসী উপুড় করিয়া তাহাতে একটা গামছার মতন কাপড় ঢাকা দিবে। এইবারে মসলা মাখান কাগজ তাল করিয়া এই কলসীর পিছনে গামছার উপরে থাব্‌ড়াতে থাকিবে যতক্ষণ না পাতলা হয়—যেমন ঘুঁটে দিবার সময় গোময় দেয়ালের গায়ে থাবড়ায় ইহাও তেমনি করিয়া থাবড়াইবে। থাবড়াতে থাবড়াতে ঠিক যখন কলসীর অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত কাগজটা নামিয়া



আসিবে তখন কলসীটা রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। আধ শুখান হইলে সেই কাগজ সমেত গামছাটা কলসীর গা থেকে উঠাইয়া লইয়া আলাদা রাখিবে। এইবারে ধারগুলো তৈয়ারী করিবার জন্য ওই মসলা মাখান কাগজ-কুটা নোড়ার মতন গোল করিয়া লইয়া কিনারাতে লাগাইয়া দিবে। তাহার পর মুলতানী মাটী দিয়া লেপিয়া দিবে তাহা হইলে খুব শক্ত হইয়া যাইবে। ইহাতে জয়পুর অঞ্চলে দেড়মণ দু'মণ জিনিষ, যেমন চাল, ডাল, গম, ছোলা ইত্যাদি রাখে। দেখিতে ঠিক পাথরের মতন হয়। এমনি শক্ত হয় যে ইহার উপর দাঁড়াইলে ভাঙ্গে না। দেখিতে ভাল হইবে বলিয়া উহার উপর যে কোন রং মাখাইতে পার। এই জিনিষ আবার নানাবিধ ছাঁচে ঢালিয়া ছোট ছোট বাটী ও ঘোড়া গরু প্রভৃতি নানাবিধ খেলনা প্রস্তুত করা যায়। আমরা নিজে এইরূপে অনেক প্রস্তুত করিয়াছি।

শ্রীশোভনা সুন্দরী দেবী।

---

# হেমকণা পায়স।

উপকরণ—মেওয়া ( ডেলাক্ষীর ) এক ছটাক, বাদাম এক কাঁচ্চা, সফেদা আধ ছটাক, জাফ্রান দু এক চুটকি, দুধ তিন পোয়া, চিনি আধ পোয়া।

প্রণালী।—প্রথমে বাদামের খোলা ছাড়াইয়া বেশ করিয়া বাঁট। তারপরে ডেলাক্ষীরটা বাদাম বাঁটায় বেশ করিয়া মাখ। উহাতে সফেদা ( চালের মিহি গুঁড়া ) মিশাও যে পর্য্যন্ত না শক্ত ময়দা মাখার মত হয়। উহাতে আধ কাঁচ্চাটাক চিনি বেশ করিয়া মিশাইয়া লও। তারপর কড়াই শুটির বা বোঁদের মত ইহার থেকে গুলি পাকাইয়া রাখ। অনেকগুলি গুলি হইবে।

এইবারে তিন পোয়া দুধে আধপোয়াটাক চিনি দিয়া তাহা বেশ করিয়া মিশাইয়া লও। আগুনে চড়াও। একফুট ফুটিলে জাফরানটুকু ছাড়িবে। দুধটা একটু ঘন পায়সের মত হইলেই তাহাতে পূর্ব্বপ্রস্তুত ছোট ছোট গুলি

ছাড়িবে। দুধটা ঘনমত হইতে প্রায় মিনিট দশ লাগিবে। গুলি ছাড়িবার পর প্রায় মিনিট পাঁচ ফুটিলে নামাইবে।

ভোজন বিধি।—সচরাচর সকল নিরামিষ আহারে ইহার দ্বারা মধুরেণ সমাপন হইতে পারে। পৌষ মাসে "পিঠে পার্ব্বণে"র দিনে "হেমকণা পায়সে"র ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি। দেখিবেন অন্যান্য পিষ্টক ও পায়সাদি অপেক্ষা ইহা অনেক পরিমাণে সুস্বাদু। বিশেষ বিশেষ পার্ব্বণ উৎসবেও ইহার প্রচলন করিলে সুন্দর হয়। যাঁহারা বিলাতী "ওট্ মিলের পরিজ্" আদি খাইয়া থাকেন তাঁহারাও উহার পরিবর্ত্তে এই কবিভোগ্য "হেমকণা পায়স" খাইতে পারেন। ইহা যেমন মুখরোচক, তেমনি পুষ্টিকর খাদ্য ও সুগন্ধযুক্ত।

ব্যয়।—ডেলাক্ষীর এক আনা, বাদাম দুপয়সা, সফেদা আড়াই পয়সা, জাফ্রান আড়াই পয়সা, দুধ দুআনা, চিনি দুপয়সা। সর্ব্বশুদ্ধ আনা পাঁচ খরচ হইবে।

---

# কুচাচিংড়ীর বারাহু।

উপকরণ—শুক্না লঙ্কা চারিটা, সরিষা এক কাঁচ্চা, নুন আধ কাঁচ্চাটাক, পেঁয়াজ বারটা, রসুন একটা, আদা এক গিরা, চিংড়ী মাছ আধ পোয়া, কাসুন্দি দেড় ছটাক, ঘি আধ ছটাক, কলাপাতা দুটা।

প্রণালী।—লঙ্কা, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, চিংড়ীমাছ, কাসুন্দি এই দ্রব্যগুলি সব আলাদা আলাদা করিয়া শিলে বাঁটিয়া লও। বাঁটা হইলে সব এক সঙ্গে মাখ। উহাতে নুনটুকু ও ঘি টুকু বেশ করিয়া মাখিয়া সবটা একটা কলাপাতে রাখ। এইবারে উহার উপর আর একটুকরা কলাপাতা চাপা দিয়া দড়ি দিয়া বেশ করিয়া বাঁধ।

এইবারে একটা তৈ বা তাওয়াতে একটু ঘি মাখাইয়া তাহাতে কলাপাতা মোড়া মাছটা ছাড়। তাওয়ার উপরে একটা চেপটা পাত্র চাপা দাও। উনানের মধ্যম আঁচ থাকিলেই ভাল হয়, যেন একেবারে মন্দা আঁচ না হয়।



পাঁচ মিনিট পরে চাপা দেওয়া পাত্রটা খুলে উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া নাড়িয়া দাও। মধ্যে মধ্যে এইরূপ নাড়িয়া দিতে হইবে। সর্ব্বশুদ্ধ পনের মিনিট উনানের উপরে থাকিবে। কলাপাতাটা পোড়া পোড়া হইলে উনান হইতে নামাইয়া রাখিবে। এখন দড়ি বাঁধা কলাপাতা খুলিয়া মাছটা একটা পাত্রে ঢালিয়া রাখ।

ভোজন বিধি।—ইহা ডালভাতের সঙ্গে খাও। মাখন ও পাঁউরুটীর সঙ্গে খাও বেশ লাগিবে। লুচিতেও খাওয়া চলে।

ব্যয়।—লঙ্কা, সরিষা, নুন, পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও কলাপাতা সব মিলিয়া এক আনা ধর। মাছ এক আনা ও ঘি দু পয়সা। সর্ব্বশুদ্ধ দশ পয়সা খরচ।

---

# চিড়ের পিটে।

উপকরণ।—চিড়ে একসের, গুড় আধসের, নারিকেল তিনটা, ডেলাক্ষীর একপোয়া, চিনি দেড়সের, ঘি আধসের, জল একসের, গরমজল একপোয়া।

প্রণালী।—প্রথমে চিড়েগুলিকে ধুইয়া ভিজাইতে দাও। যখন চিড়েগুলি বেশ সাদা সাদা ও ফুলো ফুলো হইয়া উঠিবে তখন একটী পাত্রে চিড়েগুলি ছাঁকিয়া উঠাইয়া রাখ। এইবারে চিড়েগুলি বাঁট। এই সঙ্গে ডেলাক্ষীরটাও মিশাইয়া বাঁট। এখন ঐ সবটাকে, ময়দা যেমন করে ঠেশে সেই রকম ঠেশ। বেশ করে ঠেশা হ'লে তাহার উপর একটা পাতলা কাপড় ভিজিয়ে সেটা নিংড়িয়া ঢাকিয়া রাখ।

এইবারে পিঠের 'পূর' করিতে হইবে। তিনটা নারিকেল কুরিয়া তার সঙ্গে গুড় মাখাইয়া সেগুলা একটা কড়াতে রাখিয়া উনানে চড়াও। উনানের বরাবর সমান আঁচ হওয়া চাই। হাতার দ্বারা ক্রমাগত নাড়িতে থাক। মিনিট কুড়ি পরে নাবাও। নারিকেলটা গুড়ের সঙ্গে মিশিয়া আটা আটা হইবে। ইহাকে নারিকেলের ছাঁই বলে।

এইবারে রস প্রস্তুত করিতে হইবে। একটী কড়ায় একসের চিনি ও আধসের জল দিয়া উনানে চড়াও। যতক্ষণ না চিনিটা গলে ততক্ষণ কাষ্ঠ হাতার দ্বারা নাড়িতে থাক। নাড়িতে নাড়িতে যখন রসটা একতার বাঁধিবে অর্থাৎ পান্তোয়ার রসের মত পাতলা রস হইবে তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া একটা পাত্রে ঢালিয়া রাখিবে।

এইবারে পিটে গড়। যে চিড়েটা ময়দার মত ঠেশিয়া রাখিয়াছ তাহার থেকে আধ ছটাক আন্দাজ হাতে লইয়া লেচি কাটিয়া রাখ। উহার মধ্যে গর্ত্ত করিয়া আধকাঁচ্চাটাক নারিকেলের ছাঁইএর পূর ভরিয়া দাও। একটু গরমজল কাছে রাখিয়া দাও। সেই জল একটু আঙ্গুলে লইয়া পিটের মুখ বুজাইয়া দাও। নারিকেল কুলের মত অনেকটা পিটের গড়ন করা হয়। এইরূপে দশ বারটী পিটে করা হইলেই ঐ গুলি ঘিয়ে ভাজিতে হইবে। একেবারে অনেকগুলি পিটে গড়িতে গেলে শুকাইয়া ফাটিয়া যাইতে পারে। যখন পিটের খয়েরী রং হবে তখন ঝাঁজরী দ্বারা ছাঁকিয়া তুলিয়া পূর্ব্ব প্রস্তুত রসে ফেলিবে। খাইবার সময় রস হইতে তুলিয়া খাও।

ভোজন বিধি।—পৌষ মাসে "পিঠে পার্ব্বণে"র দিনে ইহার বিশেষ ব্যবস্থা। ইচ্ছামত 'জলপানে'ও খাওয়া চলে।

ব্যয়।—চিড়ে দু আনা, গুড় এক আনা, ডেলাক্ষীর তিন আনা, চিনি ছয় আনা, ঘি আট আনা, নারিকেল ছয় পয়সা। সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচসিকা খরচ।

---

# দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা।

এ সংসারে অকিছুর থেকে কোন কিছু আসিতে পারে না। এই বিশ্ব-সংসারে এক পরম নিত্য কিছু বর্ত্তমান আছেন; যাঁহার হইতে এই যত কিছু হইয়াছে। আগে কিছু ছিল না অথচ বিশ্বের এই ভাব আসিল এ কখনই হইতে পারে না। গীতায় আছে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে-হসতঃ।" প্রসিদ্ধ চিত্রকবি স্যর জোষুয়া রেনল্ড তাঁহার চিত্রবিষয়ক গ্রন্থে বলিয়াছেন "Nothing can come of nothing" অর্থাৎ "কোন অকিছু হইতে কোন কিছু আসিতে পারে না। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মা থাকাতেই এই বিশ্ব রচিত হইতে পারিয়াছে। সেই বিশ্বকর্ম্মা আমাদের হৃদয়ে রচনা-শক্তি ও বুদ্ধি আদি প্রেরণ করিতেছেন, সেইজন্য আমাদের কল্পনা খেলিতে পাইতেছে, আমরা নানারূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেছি। সংসারে কৃতিত্ব লাভ করিতে গেলে আমাদের সেই বিশ্বকর্ম্মাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া করিতে হইবে, যেহেতু এই প্রকৃতি বিশ্বকর্ম্মারই সৃষ্টি, আমরা তাঁহার প্রকৃতিরই অনুকরণ করিয়া এক মহাকর্ম্মী হইয়া উঠি। মহা শিল্পীর কৃতিত্ব লাভ করিয়া জগতে ধন্য হই। আমাদের এ কৃতিত্ব সেই বিশ্বকর্ম্মার প্রকৃতির (প্রকৃষ্ট কৃতির) ছায়ার ছায়ামাত্র। আমাদের কারু কৌশল লাভ করিতে গেলে, তাঁহাকে অন্তরে রাখিয়া তাঁহার প্রকৃতির পানে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রাচীনকালে দেব ও দানবদিগের মধ্যে দেবতারা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে বিশ্বকর্ম্মা জগদীশ্বরেরই ভাব অনুসারে নামকরণ করিয়াছিলেন—বিশ্বকর্ম্মা। দানবদিগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম ছিল—ময়দানব। প্রাচীনকালের ইতিহাসাদির দ্বারা জানিতে পারা যায়, অধুনাকালেও যেমন আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতিই শিল্পে কৃতিত্বলাভ করিয়াছে, সেইরূপ প্রাচীনকালেও দেবতারা অর্থাৎ আর্য্যভাবাপন্ন সুন্দর শ্রীসম্পন্ন মহামনুষ্যেরা আর দেবেতর অন্যান্য অসুন্দর অনার্য্য জাতিরাও শিল্পে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণও পাওয়া যায়। রামায়ণে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার শিল্প কৌশলকে শিল্পীশ্রেষ্ঠ ময়দানবের সাক্ষাৎ নির্ম্মাণ কার্য্যের সহিত, তুলনা করা হইয়াছে।

সুন্দরকাণ্ডে একস্থলে আছে ;—"উহা দেবশিল্পীর শিল্প কৌশলে নির্ম্মিত হওয়ায় যেন শিল্পিশ্রেষ্ঠ ময়দানবের সাক্ষাৎ নির্ম্মাণ কার্য্যের ন্যায়, গুণগ্রামে মহীতলে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিল।"

শিল্পবিদ্যা দেবতাদের ন্যায় দানবেরাও জানিত অর্থাৎ আর্য্যদের ন্যায় অনার্য্যেরাও জানিত, ইহা ভারতীয় আর্য্যেরা বিশেষরূপে বুঝিতেন এবং বুঝিয়া দেবশিল্পের দানবশিল্পের সহিত, আর্য্যশিল্পের, অনার্য্যজাতির শিল্পের সহিত তুলনা দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতীয় আর্য্যেরা অত্যন্ত উদার ও গুণগ্রাহী ছিলেন। ইংরাজীতে যে একটা কথা আছে "Give the devil his due" অর্থাৎ devilকেও তাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহা দেওয়া উচিত। অনার্য্যজাতি হইলেই বা তাহাতে কি আসে যায়, যদি তাহাদের কিছু গুণ থাকে তাহা অকাতরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহার অনাদর করা উচিত নহে। কারণ কি আর্য্যজাতি কি অনার্য্যজাতি সকলেই সেই প্রকৃত বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বরের নিকট হইতে শিল্পের মূল জ্ঞান লাভ করিয়াছে। সেই হেতু যদি আমরা অনার্য্য জাতিরই নিকট যদি কিছু বিশেষ শিল্পজ্ঞান পাই তাহা অনার্য্যজাতির বলিয়া কেন অবজ্ঞা করিব? প্রাচীনকালে দেবতারা অর্থাৎ জ্ঞানে ধর্ম্মে দ্যুতিশীল মনুষ্যেরা উদার ভাবে শিল্পের আলোচনা করিতেন। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে বিশ্বকর্ম্মার প্রকৃতি আলোচনা করিতেন—প্রকৃতির ছায়া শিল্পে ফুটাইবার চেষ্টা করিতেন। অনার্য্যজাতি অপেক্ষা দ্যুতিশীল আর্য্যেরা শিল্পে বিশ্বকর্ম্মা ঈশ্বরের স্বভাব অনুসরণে সমধিক যত্ন করিতেন। তাই মনে হয় প্রাচীনকালে দেবতারা তাঁহাদের শিল্পীরাজের নাম বিশ্বকর্ম্মা রাখিয়াছিলেন। আমরা যেমন এখন বুঝিতে পারিতেছি যে আর্টএর দ্বারা হৃদয়ে আঘাত করিতে হয়; হৃদয়েই যথার্থ শিল্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; হৃদয়ের সহিত সুকুমার শিল্পের একটী বিশেষ সম্বন্ধ আছে; প্রাচীন আর্য্যেরাও বিশেষরূপে তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তাই দেখিতে পাই তাঁহারা বিশ্বকর্ম্মার স্তবে "বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা জনসমূহের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট" বলিয়া গিয়াছেন "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" পূর্ব্বকালের দেব আর্য্য শিল্পীরা প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়ের সঙ্গে মিলাইয়া শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে চেষ্টা করিতেন, তাই তাঁহারা শিল্পরাজ্যে যথার্থ সৌকুমার্য্য



লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন অর্থাৎ সুকুমারশিল্পটী যে কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যেই প্রাচীনকালের দেবশিল্পের ভাব হইতেই বর্ত্তমানকালের ইউরোপের সুকুমার শিল্পের জন্ম। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাই এক সময়ে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শিল্পশিক্ষকরূপে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিল্পের জন্য আর্য্য অনার্য্য সকল জাতিরই তাঁহাকে আবশ্যক হইত। রামায়ণে সুন্দরকাণ্ডে আছে—লঙ্কানগরী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। রাবণ তাঁহার প্রাসাদ উদ্যান রথ প্রভৃতি সমুদয় বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাবণের গৃহ সকল চিত্রপট সুশোভিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং ক্রীড়ার্থ প্রাকৃতিক পর্ব্বতের অনুকরণে কাষ্ঠনির্ম্মিত কৃত্রিম পর্ব্বত সকল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শিল্পে রাবণের বড় সখ ছিল; তিনি তাঁহার রুচি মিটাইবার জন্য তাঁহার যতদূর সাধ্য করিয়াছিলেন।

এই পৃথিবীতে দুই প্রকার শিল্পী বিদ্যমান ছিল। এক আর্য্য জাতীয় শিল্পী আর অপর অনার্য্য জাতীয় শিল্পী। এই আর্য্য জাতীয় শিল্পীরাই দেবশিল্পী ছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ইঁহাদিগের অগ্রণী। ইঁহারাই বিশ্বকর্ম্মার দলভুক্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পাচার্য্য ছিলেন। জগতে অনার্য্য শিল্পী ময়দানবেরও নাম অল্প ধ্বনিত হয় নাই। তিনি দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই ভারতীয় আর্য্যেরা তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাহার সহিত দেবশিল্পীর তুলনা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। তাই রামায়ণে লিখিত আছে ;—"উহা দেবশিল্পীর শিল্পকৌশলে নির্ম্মিত হওয়ায় যেন শিল্পিশ্রেষ্ঠ ময়দানবের সাক্ষাৎ নির্ম্মাণ কার্য্যের ন্যায় গুণগ্রামে মহীতলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল।" ভারতীয় আর্য্যেরা কি আর্য্য অথবা আর্য্যেতর জাতি সকল জাতিরই মধ্যে যদি শিল্পগুণী দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে তাহাকে সমাদর করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ভারতীয় আর্য্যেরা গুণগ্রাহী ছিলেন। আর্য্য কি অনার্য্য যেখানে গুণ দেখিতেন সেখানেই তাঁহারা পূজা করিতেন।

প্রাচীনকালে আর্য্যজাতির প্রধান শিল্পী ছিলেন বিশ্বকর্ম্মা, আর অনার্য্যজাতির প্রধান শিল্পী ছিলেন ময়দানব। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সেই পরমশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বরের প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া যথার্থ সূক্ষ্মশিল্প সুকুমার শিল্পের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মা যে পরমেশ্বর তাঁর অনু-

করণ করিয়া প্রকৃতির ঠিক অনুকরণে চিত্র বিদ্যাদি শিল্পের প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আর ময়দানব কেবল যেন ornamental অর্থাৎ অলঙ্কার অংশে যেন কেবল শিল্পের বাহ্যিক আড়ম্বরে কারুকৌশলের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তাই এখনও আসুরিক জাতির শিল্পরাজ্যে ঐ ভাবই—অলঙ্কার প্রিয়তাই দেখিতে পাই। কিন্তু আর্য্যজাতি শিল্পরাজ্যে বরাবর দেখিয়াছি যেন ঈশ্বরের প্রকৃতিপূজা করিয়া গিয়াছেন। যতদূর সাধ্য প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। *

আর্য্যজাতির শিল্পকে আমরা মুখ্যতঃ এককথায় আর্য্যশিল্প বা সুকুমার শিল্প অথবা এককথায় দেবশিল্প বলিতে পারি। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাই সর্ব্বপ্রথমে এই দেবশিল্প জগতে শিক্ষা দেন। তাহারই প্রভাব গ্রীস রোম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে যাইয়া জগৎ সুরভিত করিয়া তুলিয়াছে। এই দেবশিল্প বিস্তারের ফলেই ইটালী শিল্পক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সেই ইটালী যে শিল্পীরত্নসমূহের জন্মদান করিয়াছে রাফেল তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। র‍্যাফেলকে ইউরোপ শিল্পীরাজপুত্র বলিয়া থাকে। এই দেবশিল্পী রাফেলের নাম ইউরোপীয় শিল্পীমহলে প্রতিধ্বনিত। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা, যে শিল্প সূর্য্যালোকে ভারত আলোকিত করিয়াছিলেন তাহারই প্রতিবিম্ব য়ুরোপে পড়িয়া আজি শিল্পচ্ছটায় য়ুরোপকে বিভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই বিশ্বকর্ম্মার স্মরণার্থে শিল্পীগণের বিশেষ সম্মিলনী ও শিল্পপ্রদর্শনী হওয়া আবশ্যক। ইহা কোন দিন হইবে যদি পাঠকেরা

* বড়ই ক্ষোভ হয় যখন ভাবি যে আজকাল গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল হইতে কর্ত্তৃপক্ষ দিগের চেষ্টায় ক্রমশই দেবশিল্প অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে যেন আসুরিক শিল্পের প্রভাব স্থান পাইতেছে। অর্থাৎ সুকুমার শিল্পের প্রভাব হ্রাস পাইতেছে এবং তাহার স্থলে যত ornamental art অলঙ্কার শিল্পের আড়ম্বরতার উন্নতির জন্য চেষ্টা হইতেছে। প্রকৃত শিল্প যে প্রকৃতির অনুগত তাহার দিকে যত্ন কমাইয়া শিল্পাড়ম্বর ও অলঙ্কার প্রিয়তাকে একটা মহাশিক্ষার বিষয় করিয়া তোলা হইতেছে। Fneart অর্থাৎ যাহা প্রকৃত দেবশিল্প তাহার দিকে শিল্প বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা কেন অবহেলা করিতেছেন বলিতে পারি না।



জিজ্ঞাসা করেন তো আমার মতে ভাদ্রমাসে বিশ্বকর্ম্মার পূজার দিনে। সেই বিশ্বকর্ম্মার পূজার দিনে সমুদয় শিল্পীদের একটী সম্মিলনী ও শিল্পপ্রদর্শনী খোলা উচিত। এবং সেই সম্মিলনীর দিনে সকলে সমস্বরে জগৎ শিল্প রচয়িতা সেই আদি বিশ্বকর্ম্মার নামে গাহিয়া উঠিব।

"এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লপ্তোয় এতদ্বিদুরমুতাস্তে ভবন্তি॥"

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা; ইনি লোকদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি হৃদগত সংশয় রহিত বুদ্ধিদ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইহাকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# গৃহমুখীভাব।

জীব যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানেই সে প্রধানতঃ তাহার গৃহরচনা করিতে অভিলাষী হয়। প্রত্যেকেই স্বীয় জন্মস্থানে পুনরায় স্বীয় গৃহ, ধর্ম্মপালনার্থ গ্রহণ করিতে চাহে। "গৃহ্যতে ধর্ম্মাচরণায় ইতি গৃহ।" জীবের স্বীয় ধর্ম্মাচরণের জন্য এই গৃহ। এই গৃহমুখী ভাবই সমুদয় জাতীয় ভাবের প্রাণস্বরূপ। যাহার জন্মস্থানের দিকে অর্থাৎ স্বীয় গৃহের দিকে টান নাই তাহার জাতীয় ভাব কখনও জাগ্রত হইতে পারে না। গৃহমুখী ভাব হইতেই ক্রমশঃ জাতীয় ভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যাহার গৃহমুখীভাব নাই বুঝিতে হইবে তাহার প্রকৃত জাতীয় ভাবে বিকৃতি ঘটিয়াছে। গৃহমুখীভাব ইহা জীবজাতি মাত্রেরই স্বাভাবিক। জীবমাত্রেই জন্মমাত্রে স্ব স্ব ভাবমূলের দ্বারা রসাকর্ষণ করতঃ স্বীয় পোষনার্থে উন্মুখ হয়। এই মূল ধর্ম্ম গ্রহণের নামই গৃহ। তাই দেখা যায় ভূতমাত্রেই গৃহস্থ হইবার জন্য অর্থাৎ গৃহে থাকিবার জন্য লালায়িত। যাহারই একটু না একটু জীবনকণিকা অন্তরে বিদ্যমান, সেই কোন না কোনরূপে গৃহমুখী ভাবাপন্ন। এই স্বাভাবিক

ভাবের অনুগমন করিয়াই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সকলকে গৃহস্থ হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, বলিয়া গিয়াছেন যে সকল আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ প্রকৃতির মধ্যে গৃহমুখী ভাবই প্রধান দেখিয়া গৃহস্থাশ্রমের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন ;—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ।"

প্রাচীনকালে ভারতের মুনি ঋষিগণ সর্ব্বদা প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহারই অনুসারে মানবসমাজে ধর্ম্মস্থাপন করিতেন। আমি দেখিয়াছি যে আর্য্য ঋষিদের ভাব সমুদয় প্রকৃতির সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া সংসারে চলা। প্রকৃতির মধ্যে গৃহে থাকিবার ভাব অর্থাৎ গৃহস্থ ভাব মুখ্য বুঝিয়া ঋষিরা এই গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিলেন।

বাস্তবিক জীবমাত্র যেন নিজ নিজ গৃহের দিকে গমনোন্মুখ। যাহার যতটা গতিশীলতা আছে সে ততটা গৃহের দিকে গমন করিবেই করিবে। নানাবিধ অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও জীব নিজ গৃহ একেবারে ভোলে না। গৃহীর ভাবের মধ্যে জীবের জন্ম হইয়াছে, সেই গৃহীর ভাব জীবের মধ্যে জাগ্রত হইলেই সে গৃহপানে ধাবিত হইতে চায়। তাহাকে কোন অবস্থায় তুষ্ট করিয়া রাখিতে পারা যায় না। জীবতত্ত্ববিদেরা ইহা বিশেষিরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ; একবার এক সময়ে এসেন্সন দ্বীপের নিকটে একটী সমুদ্রকচ্ছপ ধৃত হয় এবং তাহাকে নাবিকেরা জাহাজে লইয়া আসে ; জাহাজে আনিয়া তাহারা কচ্ছপটীর অন্তরস্থিত আবরণের উপর কতকগুলি অক্ষর ও শূন্য চিহ্নিত করিয়া দেয়;—নাবিকদিগের ইচ্ছা ছিল, কচ্ছপটীকে ধরিয়া বরাবর ইউরোপে লইয়া যায় ; কিন্তু তাহা পারিল না, সেই সাগরকূর্ম্ম মাঝপথে জাহাজে কেমন রুগ্ন—মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। সেই কারণে নাবিকেরা তাহাকে ছাড়িয়া দিল—ব্রিটিশ চ্যানেলে যাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া ছিল। দুই বৎসর পরে নাবিকেরা পুনরায় সেই সিন্ধু কচ্ছপটীকে এসেন্সন দ্বীপের নিকটে ধরে। উক্ত কচ্ছপটী গৃহব্যাকুলতার পূর্ব্বসংস্কারের দ্বারা চালিত হইয়া জলের মধ্যে ৮০০ আটশত জর্ম্মণ মাইল চলিয়া ছিল। পশুদিগেরও যেমন গৃহমুখী ভাব দেখা যায়, সেইরূপ পক্ষীদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। যেখানে তাহারা স্নেহ প্রেমের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই



স্থানে, তাহাদের যেখানেই কেন ছাড়িয়া দেওয়া হউক না, অন্তরে তাহাদের স্নেহ প্রেম যখনি ফুটিয়া উঠে, অমনি তাহারা তাহাদের সেই পূর্ব্ব স্নেহ প্রেমের স্থানের জন্য লালায়িত হয়। জীবের এই জন্মকাহিনীর স্নেহ প্রেমপূর্ণ স্থান গ্রহণ লালসাই গৃহমুখীভাব। সত্যই বটে

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

এই জননী কথাটীর সঙ্গে যে জন্মভূমিকেও "স্বর্গাদপি গরীয়সী" কারণ জননী না বলিলে জন্মভূমির সার্থকতা কি। জননী সন্তান প্রসব যে ভূমিতে করেন সেই ভূমি সেই দেশই জন্মভূমি হয়। "মাতা গুরুতরা ভূমেঃ।" শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই মাতাকে লইয়াই সেই হেতু আমাদের শাস্ত্রে এত অধিক পূজা। এই মাতাই তাই আমাদের দেশে শক্তিরূপিনী হইয়া সমাদৃতা হইয়া থাকেন। যেন মাতা লইয়াই গৃহ। এই মাতা গৃহিণীরূপে থাকেন বলিয়াই গৃহ। নচেৎ গৃহ গৃহই নহে। যে গৃহে গৃহিণী নাই সে গৃহ গৃহই নহে। "ন গৃহং গৃহমিত্যাহু র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" গৃহকে গৃহ বলা যায় না, গৃহিণীই গৃহ বলিয়া কথিত হয়েন। অন্যান্য দেশে জন্মভূমিকে পিতৃভূমিরূপেও কথিত হয়। মূল কথা জন্মভূমি পিতামাতা উভয়কেই স্মরণ করাইয়া দেয়। মুখ্যত পিতামাতা লইয়াই সন্তানের গৃহস্মৃতি মনে জাগে। সন্তান দূরে থাকিলেও তাহার পিতামাতা যথায় তাহাকে জন্মদান করিয়াছে ঋতু বিশেষে কোন না কোন সময়ে তথায় যাইবার জন্য, সেই স্থান লাভ করিবার নিমিত্ত তাহার প্রাণ স্বতঃই কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিবেই উঠিবে।

দেখা যাইতেছে যে জীবমাত্রেই তাহার জাত স্থানকে প্রথম স্নেহ প্রেমের আদিস্থান বলিয়া বড়ই ভালবাসে। এবং যে স্থানে সে সৃষ্ট হইয়াছে সে সেই স্থানে নিজের সৃষ্টি রচনা করিতে চাহে। অর্থাৎ সে তাহার নিজের জন্মস্থানে জন্মপ্রবাহ রক্ষা করিতে ভালবাসে। অর্থাৎ ভূতমাত্রেই যেখান থেকে আসিয়াছে সেইখানেই ফের যাইতে চায়। এ ভাব মিলনের ভাব হইতে জন্মায়। ভূত সকল যে উদ্বাহ মিলনের বলে উৎপন্ন হইয়াছে সেই মিলনকাল আসিলেই তাহাদের পূর্ব্ব জন্মস্থানে ফিরিয়া যাইতে চায়। তা শত সহস্র ক্রোশ ব্যবধান হউক না কেন কোন বাধা বিঘ্ন মানিবে না। সময় হইলেই সময় বিশেষে তাহারা তাহাদের জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্য সুখ

উপভোগ করিবে—তাহাদের গৃহরচনা করিবে। "Over as great or not inferior distances the journies of the bird of passage extend; and yet, at the time of pairing, they all return whither they themselves were born, and in the vicinity of the nest, in wbich they emerged from the egg, build their nest for their young."

এযে শুধু স্বদেশ সম্বন্ধে বলা যায় তা নহে। স্ব উপাদানয়ের সম্বন্ধেও এক কথা। অর্থাৎ মূলকথা জীব যাহা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে জন্মদান কালেও তাহার কাছে থাকিতে চায়। ভৌতিক জগতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়; "Not merely from quite different lands and climes, but also from quite different elements, the out-running circle of animal life returns to its starting point. কেন সকলে গৃহস্থাশ্রমের দিকে উন্মুখ? কারণ সকল আশ্রমই 'গৃহস্থ প্রভব'—গৃহস্থ আশ্রম হইতে সকল আশ্রম জন্মলাভ করিয়াছে;—গৃহস্থ আশ্রমই সকল আশ্রমের Starting point অর্থাৎ যাত্রাবিন্দু বা গমন কেন্দ্র। মনুতেও আছে

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্থপ্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ॥"

জীবমাত্রেই গৃহস্থ হইতে চাহে অর্থাৎ সে যে আশ্রমেই থাকুক না কেন গৃহের তুল্য যথার্থ টান তাহার কোন আশ্রমেই নাই।—গৃহ জন্মস্থানের মায়া অন্তরে জাগ্রত করিয়া দেয়, সে মায়া কে ছাড়াইবে? ডাঁশ মশা প্রভৃতি ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত জন্মস্থানের মাহাত্ম্য কিছুতেই ভুলে না। যতক্ষণ তাহারা উড়ো উড়ো হইয়া উড়িয়া বেড়ায় ততক্ষণ তাহারা কোন রকমে ভুলিয়া থাকে, কিন্তু সে বিস্মৃতি অধিককাল স্থায়ী নয়। তাহাদের নিজ গৃহরচনা করিবার সময় আসিলেই তাহাদের পূর্ব্ব জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়া গৃহরচনা করে। "The horse-fly and the gnat come forth from the maternal egg in water, and in water the first period of life is spent. Afterwards they become dwellers of the air, and enjoy the



pleasure and freedom of a winged condition. Nevertheless, when she is to lay her eggs, the mother returns to the water; and so the female may-beetle forsakes the top of the high oak for the ground; and even the treerfog leaves her green house in order to poroduce her young in the same place where she first saw the light—in the water. On the other hand, the helpless sea-tortoise, at the fit time, ventures out upon the land to lay its eggs in the sunny sand-bed, in which itself was born. The butterfly who hovers, in its beautiful day from flower to flower, and sucks their honey, seeks nevertheless, when its time comes, the unsightly nettle in order to lay its eggs on the leaves, from which it first drew its own nourishment."

এই সকল প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ভূতমাত্রেই আদি-স্থানে ফিরিয়া যাইতে চায় অর্থাৎ তাহাদের আদি ভাবের উপর সৃষ্টি স্থিতি লয় লাভ করিতে ইচ্ছা করে। এইভাব যখন স্বাভাবিক তখন মনুষ্যের হওয়া কিছু বিচিত্র নহে কারণ মনুষ্যও জীব। মনুষ্য ইতস্ততঃ নানা কার্য্য-বশতঃ চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিলেও তাহার মন কিন্তু গৃহ ভোলে না। এক-বার একজন গ্রীনলণ্ডবাসীকে কেপকলনির পার্থিব সম্পদসুখের মাঝে ফেলিয়া দেওয়া হয়—স্থাপন করা হয়। কিন্তু কিছুতেই সে সম্পদসুখ তাহার ভাল লাগিত না, তাহার গ্রীনলণ্ডের জন্য প্রাণ কাঁদিত—সেখানে তাহার গৃহিণী আছে, স্নেহপ্রেমময় ছবি আছে, সে ছবি সে বিস্মৃত হইয়া কেপকলনির পার্থিব সুখসম্পদ সুবিধা ভোগ করিতে চাহিল না। মেঘদূতে যক্ষের যে বিরহ ব্যথা তাহা গৃহেরই বিরহ ব্যথা। তাহার গৃহের সেই প্রেমছবি মনে উদয় হওয়াতেই সে প্রবাসে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল—প্রবাসগৃহ তাহার ভাল লাগিত না।

"ন গৃহ গৃহমিত্যাহু র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

গৃহের প্রেমছবি—স্নেহছবি কে ভুলিতে পারে? মনুষ্য জাতির এই

Home sweet Home.

"Mid pleasures and palaces
though we may roam,
Be it ever so humble,
there is no place like home!
A charm from the skies
seems to hallow us there,
Which, seek the world,
is ne'er met with elsewhere.
Home, Home, sweet Home!
There is no place like Home!
An exile frome home;
splendour dazzles in vain;
Oh, give me my lowly thatched cottage again;
The birds siuging gaily,
that came at my call.
Give me them, with the peace of
mind dearer than all.
Home, Home, sweet Home!
There's no place like Home.

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# কল্যাণ প্রার্থনা।

৺মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগত আত্মার নিমিত্ত কল্যাণ প্রার্থনা গীতি।

## রাগ কল্যাণ—রূপক।

ত্যজিয়া এ সংসারের সুখ দুঃখ শোকে,
একেলা চলিয়া গেলে কোন্ পরলোকে !—
সঙ্গে কেহ নাহি গেল গেল শুধু ধর্ম্ম ;—
হেথায় রহিল প'ড়ে তব কীর্ত্তিকর্ম্ম।
দেখে শুনে প্রাণ এই হয়রে উদাস,
সকলেই ভবমাঝে নিয়তির দাস ;—
এ নিয়তি তাঁর বিধি নিয়ম আদেশ
শাসিত শাসনে যাঁর দেশ মহাদেশ,
এই সারা বিশ্বরাজ্যে তিনি মহাপ্রভু !
তাঁরে যেন এ জীবনে নাহি ভুলি কভু ;
কে আছে অন্তরতম তাঁহার সমান,
তাঁরি কোলে গেছ তুমি ত্যজি রাজ্যমান ;
আত্মার কল্যাণ তব চাহি তাঁর কাছে,
তাঁর মত হিতকারী জগতে কে আছে।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# "সৎ সৈ"

বা

দ্বিজ বিহারী দাস বিরচিত

## "সৎ শ্লোকাবলী।"

সুপ্রসিদ্ধ অম্বর-কবি বিহারী দাস (বা লাল) জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অম্বরেশ্বর মির্জ্জা রাজা বা প্রথম জয়সিংহের সমসাময়িক ছিলেন। মির্জ্জা রাজা ১৬৭৮—১৭২৪ সম্বৎ যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি মির্জ্জা রাজার সভাকবি ছিলেন এবং তাঁহারই আজ্ঞানুসারে এই স্বনাম খ্যাত "বিহারী সৎ সৈ" কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। হিন্দিভাষায় এই গ্রন্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। এই গ্রন্থে শব্দ চাতুর্য্য ও ভাষা মাধুর্য্য প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ভাষা সরল হইলেও অর্থ অতীব গভীর ও আয়াসসাধ্য অর্থাৎ সুবোধগম্য নহে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি মৈথিলী কবিদিগের ভাষার ন্যায় রাজপুত কবি বিহারীলালের ভাষার সহিতও বঙ্গভাষার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহার দুইটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। প্রথমতঃ। "সৎ সৈ" কিঞ্চিৎ ন্যূন ৩০০ বৎসর হইল রচিত হইয়াছে। যতই পশ্চাতে যাওরা যায়, ততই ভাষার সাদৃশ্য লক্ষণ গুলি স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। ভাষা যত বয়োবৃদ্ধ হইতে থাকে ততই তাহাতে দেশজ শব্দ উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয় এবং ভাষা বিশেষত্ব ও বৈলক্ষণ প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ। হিন্দি ও বঙ্গভাষা এক সংস্কৃত ভাষা হইতে সম্ভূত। সেই কারণে এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

জয়দেবের সুললিত "গীত গোবিন্দ" গ্রন্থের ন্যায় "সৎ সৈ" গ্রন্থের বর্ণন বিষয় রাধাকৃষ্ণ।

---

শ্রীগণেশায় নমঃ।

মঙ্গলাচরণ।

মূল। ১। মেরী ভববাধা হরৌ রাধা নাগরি সোই।
জা তনকী ঝাঁঈ পরৈ স্যাম হরিত দুতি হোই॥

"ভব বাধা হর রাধা নাগরি সুন্দরী।
শ্যামাঙ্গ পীতাঙ্গ যাঁর অঙ্গ রঙ্গ পড়ি॥"

অর্থ। ১। রাধা পীত অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণা। শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণ পীতাম্বরধারী ও তন্নামে প্রখ্যাত। কবি কাব্যালঙ্কারে বলিতেছেন যে, পীতবর্ণা শ্রীরাধার দেহের প্রতিবিম্ব পড়িয়া শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে পীতাম্বররূপ ধারণ করাইয়াছে।

দ্বিতীয় চরণের গৌণার্থ।

(১) যে রাধার তনু ধ্যান করিলে শ্যামত্ব বা তমোগুণের পরিবর্ত্তে সত্বগুণ উদ্ভূত হয়। (২) যে রাধার শরীরের প্রতিবিম্ব শ্রীকৃষ্ণের উপর পড়িলে তিনি 'হরিত' অর্থাৎ 'হরে' কিনা হৃষ্ট বা প্রসন্ন হন।

শব্দার্থ।

(১) ভববাধা = পুনর্পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ যন্ত্রণা।
(২) হরৌ = হর বা হরণ কর।
(৩) নাগরি = ভববাধা হরণরূপ চতুরতা বা সামর্থ্যপূর্ণা; গুপ্তপ্রণয়িনী চতুরানারী ইহা সাধারণ অর্থ।
(৪) সোই = সেই।
(৫) জা তনকী = যে তনুর।
(৬) ঝাঁঈ = ছাঁচ; প্রতিবিম্ব।
(৭) পরৈ = পড়িয়া।
(৮) শ্যাম = শ্যামমূর্ত্তি কৃষ্ণ।
(৯) হরিৎ দ্যুতি = নীল পীত মিশ্রিত বা হরিদ্রাবর্ণ।
(১০) হোই = হয়।



শ্রীপাদপদ্ম প্রার্থনা।

মূল। ২। সীসমুকুট কটিকাছনী করমুরলী উরমাল।
ইহির্বণিক মোমন বসৌ সদা বিহারীলাল॥

"শির-কিরীট, কটি পট, কর বাঁশরী।
তথা বিহারী হিয়ে ব্রজ ব্রজবিহারী॥"

অর্থ। ২। শির ও কিরীট, কটি ও পট বা বসন, কর ও বাঁশী এবং মালাও বক্ষস্থলের পরস্পর যেমন চিরসম্পর্ক, কবি বিহারীলালের হৃদয়ের সহিত রাধাকৃষ্ণের তদ্রূপ চিরসম্বন্ধ হউক।

শব্দার্থ।

(১) সীস = শীষ = শীর্ষ = শির।
(২) কাছনী = কৌপীন = বস্ত্র।
(৩) উরমাল = উরঃ অর্থাৎ বক্ষঃস্থল; মাল অর্থাৎ মালা।
(৪) ইহি বণিক বা ইহি বানিক বসৌ = এইরূপে "বোনেবস" বা অবস্থিতি কর।
(৫) মোমন = আমার মনে বা হৃদয়ে।
(৬) বিহারীলাল = বিহারীলাল এই প্রার্থনা করিতেছেন (ইহা উহ্য)।

মুকুট বর্ণন।

মূল। ৩। মোর মুকুট কী চঁদ্রকণ যোঁ রাজত নঁদ নঁদ।
মনু শশিশেখর কী অকস কিবে শেখর শত চঁদ॥

ময়ুর মুকুট চাঁদে রাজে নন্দানন্দ।
শশিশেখর শেখরে যথা শতচন্দ্র॥

অর্থ। ৩। ময়ূরপুচ্ছরচিত মুকুটের সংখ্যাতীত চন্দ্রক মালার দ্বারা নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শত চন্দ্রাঙ্কিত মহাদেবের শিরের ন্যায় শোভমান হইয়াছেন।

শব্দার্থ।

(১) মোর = ময়ূরপুচ্ছ রচিত।
(২) চন্দ্রকণ = চন্দ্রকণা = ময়ূরপুচ্ছ মধ্যস্থিত চন্দ্রক মালা।
(৩) যোঁ = "ইওঁ" = এইরূপ বা এই প্রকার।
(৪) রাজত = শোভমান।
(৫) নঁদ নঁদ = নন্দের নন্দন = শ্রীকৃষ্ণ।
(৬) মনু = মনে কর = যেন।
(৭) অকস কিবে = অঙ্কিত বা চিত্রিত করে।

কুণ্ডল বর্ণন।

মূল। ৪। মকরাকৃত গোপালকে কুণ্ডল সোহত কান।
ধস্যো মনো হিয়ঘর সমর ড্যোঢ়ী লসত নিশান॥

"মকর-আকর গোপাল কুণ্ডল
দোলে দুই কান।
হৃদি দ্বারে ধরে যেন কামদেব
সমর নিশান॥"

অর্থ। ৪। মকরাকৃত কুণ্ডল গোপালের কর্ণদ্বয় এইরূপ শোভা সম্পাদন করিতেছে যেন কামদেব হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হৃদয় মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে দুইটী সমর নিশান প্রকাশ বা উড্ডীন করিয়াছেন। (কর্ণভূষণ শোভিত গোপালকে দেখিলে কামদেব বলিয়া প্রতীত হয় ইতি ভাবার্থ।)



শব্দার্থ।

(১) মকরাকৃত = মকর আকৃতি সম্পন্ন ইহার গৌণার্থ মকরকেতন = কামদেব।
(২) সোহত = শোভা পাইতেছে।
(৩) ধস্যো = অন্তরে প্রবেশ করিয়া।
(৪) মনো = মনোজ = কামদেব।
(৫) ড্যোঢ়ী = "দেউড়ী" = দ্বারদেশ।
(৬) লসত = প্রকাশ করিতেছে।

পীতাম্বর বর্ণন।

মূল। ৫। সোহত ওঢ়ে পীতপট শ্যাম সলোনে গাত।
মনৌ নীলমণি শৈলপর আতপ পর্য্যো প্রভাত॥

"শ্যামাঙ্গ পায় শোভা পীতাম্বর বরণে।
নীলমণি শৈল যথা প্রভাত কিরণে॥"

অর্থ। ৫। নীলকান্তমণির পর্ব্বতে পীতবর্ণ প্রভাত কিরণ পড়িলে যেরূপ দেখায়, নীলকান্তি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে পীতাম্বরও সেইরূপ দেখাইতেছে।

শব্দার্থ।

(১) সোহত ওঢ়ে = শোভাসম্পাদনপূর্ব্বক উড়িতেছে বা খেলিতেছে।
(২) পীতপট = পীতাম্বর।
(৩) সলোন গাত = লবণ বিশিষ্ট অর্থাৎ সুন্দর গাত্র।
লবণাতিশয্য লাবণ্যের কারণ এইরূপ প্রবাদ আছে।
(৪) মন্যৌ = মনো = মনু ইত্যাদি = মনে কর যেন।
(৫) শৈলপর = শৈলের উপর।
(৬) পর্য্যো = পড়িয়াছে

মূরলী বর্ণন।

মূল। ৬। অধর ধরত হরিকে পরত ওঠ দীঠপট যোতি।
হরিত বাঁসুকী বাঁসুরী ইন্দ্রধনুষ্ রঁগ হোতি॥

"শ্যামল গোপাল রক্তিম অধর
হরিত বাঁশের বাঁশী।
এ তিন রঙেতে, হয়ে সমন্বিত
ইন্দ্রধনু পরকাশি।"

অর্থ। ৬। শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বিম্বাধর প্রান্তে রক্ষিত হরিতবর্ণ বাঁশের বাঁশরী-জ্যোতি ইন্দ্রধনুর বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

শব্দার্থ।

(১) হরিকে=হরির।
(২) পরত=উপরত=উপর।
(৩) ওঠ দীঠ পট যোতি=ওষ্ঠস্থিত (বংশীরূপ) দৃশ্যপট বা চিত্রের জ্যোতি।
(৪) বাঁসুকী=বাঁশের।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

---

# সাংখ্য স্বরলিপি।

বালিকার রচনা।

রাগ মেঘ—তাল ঝাঁপতাল।

মেঘের রাজার সাথে করিব আলাপ,
কনক মুকুট শিরে রতন কলাপ;
নবশোভা নবরাগে রঞ্জিত আকাশ মাঝে
কি বিচিত্র বরণে!
ললিত লাবণ্য খেলে কি শোভা আনন্দ রাজে
সাঁঝের কিরণে!

তালি। ২ঃ (ন্ত) | ৩ | ০ | ১ (স্থা) ॥
মাত্রা। ২ | ৩ | ২ | ৩ ॥

(স্থা):— সা সাঃ নিঃ সা। রে২। রে+রে পা। মাঃ
(স্থা):— মৈ ঘে — র। রা। জা — র সা

গাঃ মা। রে সা২ | সা পা। নি পা নি। সা২ | + সা৩
— —। থে — | ক রি। ব —— আ। লাপ্ | —

মা রে | মা২ মা | পা পা | নি সা সা সাঃ নিঃ সা |
ক ন | ক মু | কু ট | শি — রে র — ত |

র২ নি | সা২ |
ক | লাপ্ |

(ন্ত-প্র):— নি নি। নি নি নি।
(ন্ত-প্র):— ন ব। শো — ভা।

২ ·······································································

সা সা । সা সা সা । সাঃ নিঃ সা । রেঃ সা ।
ন ব । রা — গে । র — ঙ্গি. । ত আ ।

······

সাঃ নিঃ সা । পা নিঁ পা । মা মা । গ্মা রে রে ।
কা — শ । মা — ঝে । কি বি । চি — ত্র

মা পা । গসাত । সাঃ নিঃ সা । রে সা নিঁ । পা মা ।
ব — । র । ণে — — । — — — । — — ।

( স্থা পুঃ ) — সা সাঃ নিঃ সা । রেঃ । রে + রে পা
( স্থা-পুঃ ) — মে ঘে — র । রা । জা — র ।

মাঃ গাঃ মা । রে সাঃ । সা পা । নি পা নি । সাঃ ।
সা — — । থে — । ক রি । বঁ — আ । লাপ্ ।

"ললিত লাবণ্য" হইতে "সাঁঝের কিরণে" পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অন্তরাটি প্রথম অন্তরার ন্যায় গাহিতে হইবে।

শ্রীসুঃ দেবী।

---

# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

**নব্যভারত**—পৌষ ও মাঘ। "নারী জাতির উচ্চশিক্ষা" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নারী জাতির উচ্চশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন। নারী জাতির উচ্চশিক্ষা যে অত্যাবশ্যক এ বিষয়ে পুণ্যেও অনেক আলোচনা হইয়া গেছে। নারী জাতির উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানোন্নত ব্যক্তির অসম্মতি হইতে পারে না। তবে অবশ্য কথা এই যে কি প্রণালীতে সে শিক্ষা হইতে পারে সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন বি, এ, এম, এ পাশ দিলে ভাল, কেহ বলেন বেদ পুরাণ পড়ান ভাল ইত্যাদি। আমাদিগের মতে কাল, অবস্থা ও পাত্র বুঝিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রণালীর বিভিন্নতা হওয়া আবশ্যক এবং তাহা হইবেই। তবে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটী কথা বিশেষ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। স্ত্রীশিক্ষা দিতে গিয়া কঠোর যন্ত্রপেষণে তাঁহাদিগের সরস হৃদয়কে যেন নীরস করিয়া না ফেলা হয়। মহিলাদিগের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের হৃদয়ের আনন্দ ও সুখ সন্তোষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যদি শিক্ষার ভারে কোমলহৃদয়া স্ত্রীদিগের আনন্দ ও সন্তোষ দূরে চলিয়া যায় তাহা হইলে সে শিক্ষা ফলদায়ক হয় না। অতএব প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য মহিলাদিগের জন্য আনন্দ ও সন্তোষ ও সরসতার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা দেওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে শিক্ষার ফলে রমণীহৃদয় শুষ্ক হইয়া পড়িবে এবং তাহাতে গৃহে নানা অমঙ্গলের সঞ্চার হইবে। শিক্ষার সঙ্গে সরসতা থাকিলে আনন্দময়ী মহিলাহৃদয় শক্তিপূর্ণ হইয়া সংসারকে সরস ও শক্তিমান করিয়া তুলিবে। "বীর কি বঙ্গে অসম্ভব" প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় শান্তিপুরে কোন্ দুই দলের মধ্যে এককালে লড়াই হইত এবং তাহাতে অনেক মাথা ফাটাফাটি হইত. ইত্যাদি রূপ উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন যে বঙ্গে বীর পুত্র প্রসূত হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। আমরা কথায় কথায় সুরেশ বিশ্বাস বা ফলানা ডাকাত এর উদাহরণ হাজির করিয়া আপনাদের মস্ত বীর জাতি বলিয়া

অহঙ্কারের সুযোগ খুঁজিয়া থাকি। কিন্তু এরূপে দুদিনে আমরা বীর হইয়া উঠিতে পারিব না। আমাদিগের মতে আমরা যেরূপ সত্যকে দূরে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিয়াছি তাহাতে বোধ হয় বাঙ্গালী জাতির বীর জাতিরূপে পরিণত হওয়া বহুদূরের কথা। বীরত্বের ভিত্তি সত্যে নিহিত। বাঙ্গালী হৃদয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার পক্ষে বীরত্বের সিংহাসনে আরোহণ করা এক মুহূর্ত্তের কার্য্য। এত নগণ্য জাতি সাঁওতালরাও যে বীর সেও কেবল তাহারা সত্যপ্রিয় বলিয়া। শিখেরা যে জগতে শ্রেষ্ঠ বীর জাতি বলিয়া পরিগণিত তাহা কেবল তাহাদিগের সত্যনিষ্ঠার জন্য। তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। যতদিন না বাঙ্গালী জাতি সত্যপ্রিয় হইবে ততদিন তাহার বীর বলিয়া জগতে পরিগণিত হওয়া অসম্ভব। "বর্ণসাম্য ও ধর্ম্মসাম্য"—লেখক শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার কাল ও সাদা রংই যে আর্য্য অনার্য্যের কারণ এই আজগুবী কথার বালীর বাঁধের উপর একেবারে তেতালা বাড়ী গাঁথিয়া বসিয়াছেন। বামুনের গায়ে কয় ফোঁটা সাদা রক্ত, কায়স্থের গায়ে কয় ফোঁটা সাদা রক্ত মুচী প্রভৃতি অন্যান্য জাতির গায়ে কয় ফোঁটা আর্য্য রক্ত ইত্যাদির এক স্বমস্তিষ্ক প্রসূত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রবন্ধগুলি মস্তক বিহীন কবন্ধের ন্যায় কিম্ভূত কিমাকার। "পৌনঃপুনিক অভিনয়ে" সম্পাদক মহাশয় যেরূপ ভাবে সাম্যের ধ্বনি তুলিয়াছেন তাহাতে প্রকৃত সাম্যের হানি হয়।—বৈষম্য উপস্থিত হয়। সাম্য ন্যায় ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাহাই প্রকৃত সাম্য, এই সাম্যেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। তিনি এই প্রবন্ধে ধনী দরিদ্রের সমস্যার কথা আনিয়া যেরূপ সাম্যের রোল তুলিয়াছেন তাহাতে লোকের বিষম খাইবার কথা। তিনি বলিতেছেন—এক দরিদ্র ধনীর গৃহমধ্যে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া ধনী তাঁহার উপর বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।—সম্পাদক মহাশয়ের মতে ইহাতে ধনী ব্যক্তিরই দোষ হইয়াছে। কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত। গৃহমধ্যে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপের জন্য প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র ব্যক্তির দোষ হইয়াছিল। তাহাতে ধনী ব্যক্তির বিরক্তি হওয়া বরঞ্চ স্বাভাবিক একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমরা যখন বিদ্যালয়ে পাঠ করিতাম তখন দৌ



তাম অধিকাংশ ছাত্রের কদভ্যাস ছিল ক্লাসের মধ্যে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করা। তাহাতে ক্লাসের সকলের স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে বলিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা নিয়ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে ক্লাসের গৃহমধ্যে কেহ নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। সম্পাদক মহাশয় সাম্যের বন্যায় ভাসিয়া অনেক স্থলে ন্যায় ও সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সুযোগ ছাড়িয়া দিয়াছেন। সাম্যের স্বপক্ষে বলিয়া তিনি কি বলিতে চাহেন একজনের পরিশ্রমলব্ধ ধন আলস্য পরায়ণ অপর ব্যক্তি অনায়াসে ভোগ করিবে? সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে সমান বলিয়া চৌরের দণ্ড হইবে না? দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইবে না? সংসারে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ থাকিবে না? এইরূপ সাম্যের প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিতা বশতঃ তাঁহার প্রবন্ধের গুরুত্বের লাঘব হইয়াছে। "সাবিত্রীতত্ত্বের" সমালোচনায় ক্ষীরোদ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, আজকাল সমালোচনার কোন মূল্য নাই। সমালোচকগণ আজকাল প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচার না করিয়া লেখকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার সমালোচনা করেন। অনেক সময়ে সমালোচক যদি দেখেন যে লেখক ধনীর পুত্র বা লেখক কোন মাতব্বর ব্যক্তি তবে তাঁহার রচনা নিকৃষ্ট হইলেও সমালোচক তাঁহাকে একেবারে উচ্চ সিংহাসনে চড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত নহেন। বিচারকেরও যে আসন সমালোচকেরও সেই আসন। অতএব ন্যায় ও সত্য বিচারের প্রতি সমালোচকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। "ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান" প্রবন্ধে প্রবীণতা আছে। "অধিকারী অনধিকারী" ইহা পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ। এদেশে পরমহংস সাধু সন্ন্যাসীকে সকলেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। বিজন অরণ্য, শ্মশান প্রভৃতি স্থানে একাকী বিচরণ করিয়া তাঁহারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, অনেক স্থলে সংসারী গৃহস্থেরা গৃহের সুখোপভোগের কারণে তাহা হইতে বঞ্চিত হন, তাই দেখা যায় সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে এক সভয় শ্রদ্ধার ভাবে আকৃষ্ট হইয়া সকলে তাঁহাদিগের শিষ্যত্ব লাভে ব্যাকুল হয়েন। এই দশজনের শ্রদ্ধা পাইতে পাইতে প্রায়ই দেখা যায় তাঁহাদিগের অন্তরে এক অন্তঃসলিল ভীষণ অহঙ্কারের সঞ্চার হয়। যে অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের সঙ্গে একাসন অধিকার করিয়া বসিতে চাহেন। এই কারণেই অনেকস্থলে সাধুসন্ন্যাসীরা ঘোর অদ্বৈতবাদী সোঁহং মতাবলম্বী

হইয়া থাকেন। যদি আমিই ঈশ্বর হইলাম তবে আর ঈশ্বরকে মানিয়া কি হইবে আমাকেই মান, অনেকস্থলে সাধু সন্ন্যাসীদিগের অন্তরে ইহাই গুপ্ত অভিলাষ থাকে। আমরা অনেক সময়ে স্বকর্ণে শুনিয়াছি লোকেরা সাধুদিগকে "ভগবন্!" বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীও এই অদ্বৈতবাদের হস্ত হইতে মুক্ত নহেন দেখিতেছি। তিনি এক-স্থলে বলিতেছেন "ঈশ্বর বা জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য শাস্ত্র রচনা করেন ও সদুপদেশ দেন।" এস্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে জ্ঞানবান ব্যক্তিকে একাসনে বসাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু কোথায় অনন্ত জ্ঞানশালী পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বর, আর কোথায় ক্ষুদ্র কীটানুকীট তুল্য অপূর্ণ জীব জ্ঞানবান ব্যক্তি! স্বামিজী আরেক স্থলে বলিতেছেন "যথার্থত জীবেরই নাম ওঁকার"। যদি জীবই ওঁকার অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইলেন তাহা হইলে জীবগণকে তাঁহার পরব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়াই বাহুল্য। সপ্তব্যাহৃতির ব্যাখ্যায় স্বামীজী বলিতেছেন;—"ওঁ ভূঃ অর্থাৎ পৃথিবী; ওঁ ভুবঃ আর্থাৎ জল, ওঁ স্বঃ অর্থাৎ অগ্নি, ওঁ মহঃ অর্থাৎ বায়ু, ওঁ জনঃ অর্থাৎ আকাশ, ওঁ তপঃ অর্থাৎ চন্দ্রমা ওঁ সত্য অর্থাৎ সূর্য্য নারায়ণ।" তাঁহার এই সকল ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ স্বকপোল কল্পিত, শাস্ত্রানুযায়ী নহে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য এই সপ্তব্যাহৃতির বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় সে সকলের বিস্তৃত উল্লেখ অসম্ভব। অন্যান্য অনেক বিষয়েও এইরূপ গোলযোগের কথা আছে। তিনি স্রষ্টা পরমেশ্বরকে সৃষ্ট প্রকৃতির সঙ্গে জড়াইয়া এক বিরাট রূপের কল্পনা করিয়াছেন বটে কিন্তু পূর্ণশক্তি পূর্ণসুন্দর ঈশ্বর দর্শনরূপ রত্ন লাভের জন্য আত্মার অন্তরতম প্রদেশে অবগাহন করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। তাঁহার এইরূপ উপদেশের দ্বারা জ্ঞান ও প্রেমভক্তির বিশুদ্ধ সরসতা ক্রমশঃ তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর মধ্য হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে এরূপ আশঙ্কা হয়।

**সাহিত্য**—মাঘ। শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর ফটো সাহিত্যের অঙ্গ ভূষিত করিয়াছে। সরোজকুমারীর মুখে কবি শেলির মুখের সাদৃশ্য ও কমনীয়তা আছে। "যেমনটী চাই তেমন হয় না" কবিতায় সুকবি দ্বিজেন্দ্র-লাল রায় ঠিক কথাই বলিয়াছেন। সকলকার মনের কথাটী টানিয়া বাহির



করিয়াছেন। কবিতাটী পাঠ করিলে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। "সাঁও-তাল পরগণার বিবরণ" বড় চিত্তাকর্ষক। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। "অশোক গুচ্ছ সমালোচনা" প্রকৃত কবির প্রকৃত সমালোচনা। দেবেন্দ্র বাবুর কবিত্ব বসন্ত বায়ুর মত মুক্ত। বসন্তের মুক্ত ভাবে যে সৌন্দর্য্য তাঁহার কবিতায় সেইরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। নবপল্লব পুষ্পসমূহ যেন দলে দলে তাঁহার কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এরূপ কবিতায় সময় সময় অসংযত রচনার দোষ থাকিয়া যায়, যেমন মুক্ত বসন্ত বায়ুতে পুষ্প সৌরভের সঙ্গে ধূলিরাশিও উড়িতে ছাড়ে না।

**উৎসাহ**—অগ্রহায়ণ। "স্ত্রী উক্তি" কবিতাটীতে একটু নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। "ফেরিস্তা" এই ঐতিহাসিকের নাম বঙ্গীয় পাঠকের অপরিচিত নহে। কিন্তু তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত বড় একটা কাহারও জানা নাই। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীর দ্বারা বঙ্গীয় পাঠকের উপকার হইবে সন্দেহ নাই। "চৈনিক তীর্থযাত্রী" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্ত্তৃক লিখিত। ইহাতে চীন ও ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আছে। ভারত-বাসীরা চীনে সমুদ্র পথ দিয়া যাইতেন সে বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ আছে। কবিবর মাইকেল মধুসূদনের পত্রে কবির উপযুক্ত স্পষ্টবাদিতা ও কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। "লণ্ডনে ভারত প্রদর্শনী" চিত্তাকর্ষক। কবি কুঞ্জের একটী কবিতায়ও প্রকৃত কবির মৌলিকতা বা লিপিকুশলতা নাই। ভাড়াটে গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দের মত যেন কেবলি এক ঘেঁয়ে সুর। তবু সুরমা সুন্দরীর "বাল্যস্মৃতি" কবিতাটিতে কিঞ্চিৎ লিপিচাতুর্য্য লক্ষিত হইল।

**পূর্ণিমা**—মাঘ। "মৃত্যুর পর" এই ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধে অনেক বিষয়ের একত্র সমাবেশ আছে বটে কিন্তু কোন একটা শৃঙ্খলা নাই। সব জড়াইয়া যেন একটা ভুতুড়ে ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক স্থলে ধান ভান্‌তে শীবের গীতও আছে। লেখক যদি এমন করিতেন যে "মৃত্যুর পর" একটী বড় হেডিং দিয়া তাহার নিম্নে প্রতি সংখ্যায় প্রতি অংশের ছোট ছোট হেডিং দিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করিয়া তুলি-তেন তাহা হইলে পাঠকের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইত। তাহা না হওয়ায় প্রবন্ধটী নানা আধ্যাত্মিক জঞ্জাল ও আগাছা সমেত থাকায়, পাঠকগণ অবশ্য

জঞ্জাল সাফ করিতে গিয়া অনেক সময়ে ভাল জিনিষও সাফ করিয়া বসিতে পারেন। "হনুমান দাস বাবাজী" শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ লিখিত। ইহা চন্দননগরের কোন বাবাজী সাধুপুরুষের পুণ্য কাহিনী।

অন্তঃপুর—মাঘ। অন্তঃপুর ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। যাহাতে কবিতার বাহুল্য না থাকে এবং প্রবন্ধগুলি অধিকতর সারবান হয় সম্পাদিকার তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে ভাল হয়। এই সংখ্যায় "রন্ধন" প্রবন্ধ দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। কিন্তু তাহাতে যে সকল খাদ্যপাকগুলি গিয়াছে সেগুলি কাহারও নিকট শুনিয়া লেখা হইয়া থাকিবে এবং সেগুলি স্বহস্তে পরীক্ষিত নয় বলিয়াই মনে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইতেছি, যে "Guava jelly" বা পেয়ারার জেলি বাজারে বোতলে আট আনা দশ আনা দামে বিক্রয় হয় এবং যাহা অনেকেই খাইয়া থাকিবেন এবারকার অন্তঃপুরে তাহার যে প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। অন্তঃপুরে লিখিত প্রণালী অনুসারে পেয়ারার জেলি প্রস্তুত করিতে গেলে পাঠক পাঠিকাগণ তাহাতে কখনই কৃতকার্য্য হইবেন না। আরেকটী কথা এই যে, লেখিকা পেয়ারার শাঁসটুকু ছাকিয়া লইয়া বীচিগুলি ফেলিয়া দিতে বলিয়াছেন। কিন্তু এই বীচিগুলি ফেলিয়া দিবার জিনিষ নয়। বীচিগুলি হইতে অতি উপাদেয় "গোয়াভা চীজ্" অর্থাৎ "পেয়ারার পনীর" প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাজারে "পেয়ারার পনীর"ও টিনবদ্ধ হইয়া বেশ দামে বিক্রম হয়। পেয়ারার বীচি যে, কোন কাজে লাগিতে পারে তাহা না জানিয়াই বোধ করি অন্তঃপুর লেখিকা লিখিয়াছেন "পেয়ারার বীচিগুলি ফেলিয়া দিবে।" নৈপুণ্য সহকারে সকল জিনিষের সৎপ্রয়োগের প্রতি অন্তঃপুরের মহিলাদিগের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। সহজে কোন জিনিষ তাঁহারা যেন ফেলিয়া দিতে না চাহেন। সকল জিনিষকেই কোন না কোন কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিবেন। "বিদেশে বঙ্গবাসী ও বঙ্গীয়া নারী" প্রবন্ধে অনেক বিদেশ প্রবাসী বাঙ্গালীর সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা যায়। "বুয়ার জাতির বিবরণ" একটী সুলিখিত প্রবন্ধ।

---

# পুণ্য।

## ভূগর্ভে অভিব্যক্তির সাক্ষ্য।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা সর্ব্বত্র। দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র তাঁহারই মহিমা জলন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত অচলপ্রতিষ্ঠ নিয়ম সকল ত্রিকালে কার্য্য করিয়া কি এক অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা রচনা করিতেছে। দ্যুলোকে অসীম বাষ্প রাশির গর্ভ হইতে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র ধূমকেতু সকল উত্থিত হইয়া নিত্য যে নূতন নূতন জগত রচনার সূচনা করিয়া দিতেছে, ইহাতেও যে বিশ্বকর্ম্মার হস্ত উপলব্ধ হয়; বিশ্বচরাচরে যে ব্যোমসাগর পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, অন্তরীক্ষে যে প্রাণরাশি থুকবুক করিতেছে, ইহাতেও সেই একই বিশ্বকর্ম্মার হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিভুবন তাঁহারই আদেশে তাঁহারই নিয়মে ভ্রাম্যমাণ। নিউটনের আবিষ্কৃত পরমাণবিক আকর্ষণ, কেপ্লারের আবিষ্কৃত গ্রহগণের গতিপ্রণালী প্রভৃতি জ্যোতিষিক নিয়মসমূহও যেমন নিয়ন্তা ঈশ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, সেইরূপ রাসায়ন প্রভৃতি অন্যান্য নিয়মসমূহও, যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হইবে অথবা হওয়া সম্ভব, সকলই সেই বিশ্বনিয়ন্তা ত্রিভুবনপালকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইঙ্গিতমাত্র।

জীবরাজ্যে আমরা অভিব্যক্তি প্রণালীতে এই ইঙ্গিত অনুভব করি। ঈশ্বরের কতকগুলি ইঙ্গিত আমরা অতি সহজে অনুভব করিতে পারি। আমি সত্য বলিতেছি অথবা মিথ্যা বলিতেছি, তাহা যে স্বভাবতই জানিতে পারি, এই জানিবার সক্ষমতাও ভগবানের একটী ইঙ্গিত, কিন্তু ইহা বুঝিবার জন্য আমরা অপর কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখি না। আসল কথা এই যে ভগবানের যে সকল ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিলে সংসার ছারখার

হইবার সম্ভাবনা আসে, সেইগুলিমাত্র ঈশ্বর আমাদিগের সহজজ্ঞানবোধ্য করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যের চারিধারে যে গ্রহগণ পরিভ্রমণ করিতেছে, এইরূপ ইঙ্গিত বা সত্য সকল আমাদের অন্তরে সহজজ্ঞানবোধ্যরূপে নিহিত হয় নাই, কারণ এগুলি না জানিলেও সংসারচক্র অচল হইবার সম্ভাবনা নাই। এই শেষোক্ত সত্য সকল প্রথমোক্ত সহজজ্ঞানবোধ্য সত্যসমূহের বিপরীতে বহিঃসাক্ষ্যের উপর অনেক পরিমাণে প্রমাণের জন্য নির্ভর করে। আমি জানিতেছি যে আমি ভাবিতেছি, ইহার প্রমাণের জন্য আমাকে রাশীকৃত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতে হইবে না। কিন্তু শেষোক্ত জড়সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক সত্যসকলের সম্বন্ধে সে কথা খাটিবে না—যখন কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞানেতে এইরূপ কোন সত্য প্রতিভাসিত দেখেন, তখন তিনি সাধারণের নিকটে তাহা ব্যক্ত করিতে গেলেই সকলেই তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ ও সাক্ষ্য প্রার্থনা করিবেই এবং তিনি দৃষ্টান্তাদি দ্বারা উপযুক্তরূপে সপ্রমাণ করিতে অক্ষম হইলে লোকের বিশ্বাসে তাহা স্থান পাইবে না। জীবের অভিব্যক্তিতত্ত্বও এই শেষোক্ত প্রকারের সত্য এবং সুতরাং বিশেষ প্রমাণাদির অভাব ঘটিলে লোকে ইহা স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ভূগর্ভ হইতে কিরূপ প্রমাণ ও সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অভিব্যক্তি প্রধানত দুইটী মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—পরিবৃত্তি ও জীবনসংগ্রাম। কিন্তু এই দুই মূলভিত্তির সপক্ষে যে সকল প্রমাণ উল্লিখিত হয়, সেগুলি অভিব্যক্তির অবান্তর প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, প্রত্যক্ষ বলিয়া নহে। যদি আমি সপ্রমাণ করিতে পারি যে জগতে পরিবৃত্তি অথবা জীবনসংগ্রাম কার্য্য করিতেছে, তবে এইটুকু বুঝিতে পারিলাম যে জীব সকল পরস্পর হইতে পরিবর্ত্তিত আকারে জন্মগ্রহণ করিতেছে অথবা এক শ্রেণী মৃত্যুরূপ সোপান অবলম্বনে অপর শ্রেণীর স্থান অধিকার করিতেছে; কিন্তু পরিবৃত্তি ও জীবনসংগ্রামের অনুকূল শত প্রমাণ এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিবে না যে জীবের অভিব্যক্তি বা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ঘটিতেছে; অবান্তরভাবে কেবল বলিতে পারিবে যে জীবের অভি-



ব্যক্তি সম্ভব, একেবারে অসম্ভব নহে। ভূগর্ভে চিরপ্রোথিত অস্থিপঞ্জরাদিই, বলিতে গেলে, অভিব্যক্তির অন্যতর জীবন্ত প্রমাণ। এক শ্রেণী হইতে অপর এক উন্নত শ্রেণীর উৎপত্তি অথবা প্রকারভেদ হইতে শ্রেণীতে এবং শ্রেণী হইতে বর্গে পরিণতি, এই সকল প্রত্যক্ষ করিতে ও করাইতে পারিলেই অভিব্যক্তির একেবারে চূড়ান্ত প্রমাণ হইয়া গেল। কিন্তু একটী মনুষ্যের শতবর্ষ পরমায়ুর মধ্যে এরূপ প্রমাণের দর্শনলাভ নিতান্তই অসম্ভব। এখন যদি আমরা অভিব্যক্ত প্রাণী সমূহের কঙ্কাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারি, তবে তাহা কি অভিব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না? অন্তত হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা জোর করিতে পারি। আমরা যদি একটী শিশু, একটী বালক, একটী যুবা ও একটি বৃদ্ধ, মনুষ্যের এই চার অবস্থার চারটি কঙ্কাল কোথাও প্রোথিত দেখিতে পাই, তবে এই প্রকার শিশু হইতে যে ঐ প্রকার বৃদ্ধের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা কি এক প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হইল বলা যায় না? সেইরূপ আবার যদি হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, ইংরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ককেসীয় মনুষ্যের অস্থি পঞ্জর দেখি, তাহা হইলে আমার বোধ হয় বিনা দ্বিধা বলিতে পারি যে এই কয়টি অস্থি পঞ্জরের পূর্ব্বাধিকারীগণ একই জাতীয়, সুতরাং ইহাদের মূল এক। সেইরূপ মোগল, অস্ত্রেলীয়, ককেসীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্যের অস্থি পঞ্জর দেখিলে বিনা সন্দেহে বলিতে পারি যে এই অস্থিগুলি মনুষ্যের, সুতরাং মূলে এক না হইয়া যায় না। আবার যখন অসভ্য মনুষ্যের অস্থির সহিত সিম্পাঞ্জি, গোরিলা প্রভৃতি বনমানুষের অস্থি পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিবার অবসর পাই, তখন তাহাদের উভয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া বলিতে বাধ্য হই যে ইহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য বড়ই বেশী, ইহাদের মূল হয়তো এক। বালক, যুবা ও বৃদ্ধের অস্থি দেখিয়া যে প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের বলে বলিতে পারি যে তাহাদের মূল সম্ভবতঃ এক, মনুষ্য ও বনমানুষের মূলের ঐক্যও সেই একই প্রত্যক্ষমূলক অনুমানবলেই স্বীকার করিতে পারি। এই প্রত্যক্ষমূলক অনুমান যুক্তিবিচারসম্মত, নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। আবার বনমানুষ হইতে বানর, এইরূপ ক্রমশঃ পশ্চাদ্দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে যেন বলপূর্ব্বক বুদ্ধিকে সায়

দিতে হয় যে সকল জীবেরই মূল এক। জীবেরও পশ্চাতে যাইয়া দেখি যে কতকগুলি জীব উদ্ভিদের সহিত রূপে এক এবং মাংসাশিকা প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদ প্রকৃতপক্ষে জীবধর্ম্ম সমন্বিত—ইহাদের মূল যে এক-এরূপ অনুমান করা কি এতই আশ্চর্য্য? এইরূপে আমরা অনুমান করিতে বাধ্য হই বলিলেও চলে যে, মনুষ্য অবধি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণ পর্য্যন্ত সকলেরই মূলে সেই মহাপ্রাণপ্রেরিত আদিম প্রাণ জীবাদি এবং সুতরাং অন্য কথায় বলা যায় যে জীবাদি হইতেই এই যাবতীয় প্রাণরাজ্যের অভিব্যক্তি হইয়াছে।

মনুষ্য অবধি জীবাদি পর্য্যন্ত প্রাণীসমূহের বর্ত্তমান অথবা অতীত অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়া আমরা অনুমান করিয়া আসিলাম যে সকল প্রাণীর মূলে জীবাদি অর্থাৎ জীবাদি হইতেই সকল প্রাণীর অভিব্যক্তি। এখন এ বিষয়ে প্রথম একটী বক্তব্য এই যে জীবাদি হইতে উৎপন্ন সেই আদিম কালের অনেক প্রাণীতো বর্ত্তমানে বিদ্যমান দেখি না, তবে তাহার উপর নির্ভর করিয়া অভিব্যক্তি কিরূপে অনুমান করা যাইতে পারে। এইখানেই ভূতত্ত্ব আমাদিগকে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিতে পারিবে ও করিয়া থাকে। ভূতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা ভূগর্ভের নানাস্থান খনন করিয়া এই বিষয়ে কত শত আশ্চর্য্য ঘটনা আবিষ্কৃত করিয়াছেন। কোথাও বা আদিম কালের শম্বূকাদি অন্যান্য দ্রব্যের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়াকালে প্রস্তরকল্প আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত থাকিতে দৃষ্ট হইয়াছে, কোথাও বা অতি আদিককালের বৃক্ষলতা নিজে বিলুপ্ত হইয়া গেলেও প্রস্তরাদিতে নিজমূর্ত্তি অঙ্কিত রাখিতে ভুলে নাই; আর কোথাও বা জীবজন্তুর অস্থিকঙ্কালসমূহ কর্দ্দমাদিপ্রস্তুত প্রাকৃতিক পেটকে যুগযুগান্তরের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে, এবং হিমালয়ের ন্যায় উচ্চতম পর্ব্বতের অনেক উচ্চ অংশ হইতে সাগর গর্ভজাত আদিমকালীন শম্বূকাদি সংগৃহীত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই সকল সংগ্রহ করিয়া অভিব্যক্তিতত্ত্ব স্থিরীকৃত করিবার পক্ষে যথেষ্টই সহায়তা করিয়াছেন।

ভূগর্ভ উৎখাত করিয়া যে সকল প্রস্তরশীল ( fossil ) কঙ্কালাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য অভিব্যক্তিবাদ সমর্থন পক্ষে যথেষ্ট হইলেও নিতান্ত



যে অসম্পূর্ণ তাহা বলা বাহুল্য। অসম্পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা জীবিত অবস্থায়ই আমাদের সকল দ্রব্য সমস্ত ঠিক রাখিতে পারি না, কত কীটদষ্ট হয়, কত অগ্নিদগ্ধ হয়, তখন কোটী কোটী বৎসর যুগযুগান্তর পূর্ব্বের কঙ্কালাদি অক্ষত ও সম্পূর্ণ দেখিবার প্রত্যাশা করিতে পারি কি? জীবাদি অবধি মনুষ্য পর্য্যন্ত প্রাণশৃঙ্খলের প্রত্যেক সংযোগ না দেখিলে অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিব না, এ কথা বলিলে নাচার। এই পৃথিবী যে বাষ্পাকার অবস্থা হইতে ক্রমশ শীতল হইতে হইতে এই সুন্দর আকার লাভ করিয়াছে, এ কথা আজকাল বিদ্যালয়ের ছাত্রমাত্রেরই জ্ঞাত আছে। কিন্তু এই আকার লাভ করিবার কালে পৃথিবীর কত যে বিশাল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কতশত পর্ব্বতের ধ্বংসসাধন, কতশত নিম্নভূমির উচ্চতালাভ, কতশত নগরগ্রামের অরণ্যে পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা ভূতত্ত্ব একটু বিশেষভাবে আলোচনা না করিলে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। এখনও রৌদ্র বাতাস ও জল যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। পর্ব্বতের গাত্রে বৃষ্টি পড়িল, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকালে পর্ব্বতের প্রস্তরগুলি আংশিক ক্ষয় হইয়া গেল অর্থাৎ প্রস্তরের অংশ, পরিমাণে যাহাই হউক, ধূলির আকারে পরিণত হইল এবং পরিশেষে বায়ু তাহা প্রবাহিত করিয়া দিগদিগন্তে বাহিয়া চলিল। এইরূপ কার্য্যের ফলে রাজপুতানা, তিব্বত ও আরবদেশের মরুভূমি সকল প্রস্তুত হইয়াছে। অনেকেই জানেন যে "আঁধি" নামক বাতাসে এত ধূলি ও বালুকা উড়াইয়া স্থানান্তরিত করে যে, সময়ে সময়ে তাহা বর্ষার মেঘান্ধকার উপস্থিত করে। এই প্রকার আঁধির ফলে স্কটলাণ্ডের অন্তবর্ত্তী মরে moray নামক অত্যুর্ব্বর স্থান, বড় অধিক দিন নয়, ১০০ ফুট বালুকার নিম্নে প্রোথিত হইয়া এক্ষণে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই বায়ুই ঢাকার নবাবের বাটীর অংশ ধূলিরাশিতে পরিণত করিয়াছিল। এই সেদিন সংবাদপত্রে দেখা গেল যে বায়ুবলে আসামের প্রদেশবিশেষে জীবন্ত পশুমনুষ্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

বায়ু ও জল ছাড়িয়া দিয়া এক ভূমিকম্পের দ্বারা যে কিরূপ সহসা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে, তাহা গত ভূমিকম্পের সময় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পূর্ব্বাঞ্চলে ইহার কার্য্য বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা

গিয়াছিল। অসংখ্য স্থলে পৃথিবী ফাটিয়া গিয়া কোথাওবা কর্দ্দমমিশ্রিত জল, কোথাওবা উষ্ণপ্রস্রবণ, কোথাওবা বালুকাপ্রস্রবণ উদ্গত হইল। গত ভূমিকম্পে পূর্ব্বাঞ্চলের বৃহৎ ব্রহ্মপুত্রনদেরই গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আমরা স্থানীয় বৃদ্ধলোকের নিকট শুনিয়াছি যে বোলপুরস্থ ভুবনডাঙ্গা প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে শালবন ছিল, কিন্তু আজ তাহা মরুভূমিসম ডাঙ্গা—শালবনের চিহ্নও দেখি না। দেড়শত বৎসরেই অরণ্যচিহ্ন যখন খুঁজিয়া পাই না, তখন যুগযুগান্তরের এই প্রকার বিশাল পরিবর্ত্তন সমূহের মধ্যে ভূগর্ভস্থ সাক্ষ্যসকল অধিকৃত ভাবে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া কি অসম্ভব নহে? জীবাদি অবধি মনুষ্য পর্য্যন্ত প্রাণশৃঙ্খলের প্রত্যেক সংযোগ প্রাপ্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য স্বীকার করি যে পৃথিবীর স্থানে স্থানে অস্থিকঙ্কাল প্রভৃতি সাক্ষ্যসমূহ সঞ্চিত রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন ভূপৃষ্ঠ হইতে ভূকেন্দ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল অংশ উৎখাত করিয়া পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তখন যদিবা প্রত্যেক সংযোগ ভূগর্ভে সঞ্চিত থাকে, তাহা আবিষ্কার করাও আমাদের ক্ষমতার বাহিরে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ সাক্ষ্যসঞ্চয় দেখা যায়বা কখন্? আগ্নেয়গিরি সমুদ্ভূত লাক্ষা বা পাংশুরাশির দ্বারা যদি নগরগ্রাম পল্লিনগরের ন্যায় সহসা আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, জীবজন্তুর পলায়নের অবকাশ না থাকে; অথবা পর্ব্বতোপরিস্থ বরফ রাশি সহসা অবতরণ করিয়া নগরগ্রাম আচ্ছাদন করিয়া ফেলে; এইরূপ সহসা বিপদপাত না হইলে বিস্তৃতরূপ সাক্ষ্যসঞ্চয় দৃষ্ট হইবার উপায় নাই। এই সকল কঙ্কালাদি আবার যদি দৈবক্রমে উপযুক্ত আধারে রক্ষিত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা অস্পৃষ্ট অবস্থায় আমাদের নয়নগোচরে উপস্থিত হয় তবেই বলিতে পারি যে যথার্থরূপ সাক্ষ্যসঞ্চয় লাভ করিয়াছি। খটিক যুগের (chalk age) শম্বূকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়াফলে স্তূপাকার খটিক পর্ব্বতে পরিণত হইয়া সাক্ষ্যসংগ্রহের অনেকটা বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে। এই একটী দৃষ্টান্ত দিলাম—ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে এমন রাশি রাশি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এখন বোধ হয় বুঝা গেল যে অভিব্যক্তিবাদে ভূগর্ভের সাক্ষ্য কেন অসম্পূর্ণ। তবে যে সকল সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা অবলম্বনেই অভিব্যক্তিবাদ অনেকটা পরীক্ষিত হইয়াছে এবং



নানা তর্কবিতর্কের পর তাহা সত্য বলিয়াই একপ্রকার পরিগণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া গোঁড়ামী ও আংশিক মূর্খতার পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হয়।

ভাল, না হয় স্বীকার করাই গেল যে এইস্থানে কতকগুলি জীবকঙ্কাল পাওয়া গেল, ঐস্থানেও কতকগুলি পাওয়া গেল। কিন্তু ইহা হইতে যে জীবের অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহার প্রমাণ কি? যে প্রণালীতে অন্যান্য বিজ্ঞানবিভাগে সত্য আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়া থাকে, সেই প্রণালীতেই অভিব্যক্তিতত্ত্বও পরীক্ষিত হইয়া সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ যদি তাঁহাদের সিদ্ধান্তমূলক অনুমানের সহিত দৃষ্ট ঘটনাসমূহের মিল দেখেন, তবেই সেই সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। দুএকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করি। জ্যোতির্বিদগণ গ্রহগণের গতি প্রণালী অনুসরণ করিয়া হয়তো কোন গ্রহের কক্ষনির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তমূলক অনুমান হইল যে এই গ্রহের এই কক্ষে চলাই সম্ভব। কিন্তু এই গ্রহ যদি উক্ত কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন কক্ষে পরিভ্রমণ করে, জ্যোতির্বিদগণ তখনই পুনরায় সিদ্ধান্তমূলক অনুমানবলে স্থির করে যে সম্ভবত এই নূতন কক্ষ অপর কোন বৃহত্তর জ্যোতিষ্কের আকর্ষণবলে সংরচিত হইয়াছে এবং তখন হইতে তাঁহারা সেই নূতন জ্যোতিষ্কের অনুসন্ধানে তৎপর হয়েন। পরে এই জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার ঘটিলে তাঁহাদের অনুমানের সহিত প্রত্যক্ষ ঘটনার মিল হইল, সুতরাং তাঁহাদের অনুমানও সত্যে পরিণত হইল। আর একটী দৃষ্টান্ত দিই। জলকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল যে তাহা দুইটী বাষ্পের সংমিশ্রণে উৎপাদিত; সুতরাং সিদ্ধান্তমূলক অনুমানে স্থির করা গেল যে এই দুই বাষ্পের সংমিশ্রণে জল উৎপাদিত হইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে বৈদ্যুতিক সংযোগে উক্ত দুই বাষ্প মিশ্রিত হইলে জল উৎপন্ন হয়—এতক্ষণে অনুমান সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইল। কি জ্যোতিষ, কি রসায়ন, কি চিকিৎসা, বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই এই প্রণালীতেই সত্য আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়া থাকে। অভিব্যক্তিবাদীগণও এই প্রণালী অবলম্বনে অভিব্যক্তিতত্ত্ব আবিষ্কার পূর্ব্বক সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভূতত্ত্ববিৎ গণ্ডিতগণ যে সকল সাক্ষ্যভাণ্ডার ( Deposits ) আবিষ্কার করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি সাক্ষ্য উপরোক্ত প্রণালী অনুসারে একেবারে অকাট্যরূপে অভিব্যক্তিবাদের সত্যতা সমর্থন করে। অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেন যে যতই আদিম যুগের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই প্রাণীদিগের আকার প্রকার অজটিল হওয়া সম্ভব। কয়েকটী ভাণ্ডারে সেইরূপই পাওয়া গেল। উদ্ভিদজাতির বিষয় আলোচনা করিলে অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। পাথুরে কয়লার যে সকল খনি দেখা যায়, সেগুলি যে আদিম যুগের অরণ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়াবশতঃ ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। এখন যে সকল খনি যত আদিম যুগের, সেই সকল খনিস্থিত কয়লা-সূচিত তৃণ বৃক্ষ সকল ততই সরল অজটিল আকার প্রকারের দৃষ্ট হয়; আদিম যুগে বর্ত্তমানের ন্যায় ফলপুষ্পে অবনত বৃক্ষ সকল দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বপ্রথম যুগের তৃণ ঘাসের ন্যায় একপত্র মাত্র; তাহার পরে শৈবাল জাতীয় fern তৃণ—ইহা অঙ্গার যুগে ( Coal-age ) সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে পাইন ( Pine ) জাতীয় কোণিক বৃক্ষ সকল দেখা যায় এবং সর্ব্বশেষে পুষ্পিত বৃক্ষের আবির্ভাব। এই সকল প্রমাণের উপর উদ্ভিদের অভিব্যক্তি সাহসের সহিত স্বীকার করা যাইতে পারে। জীবজন্তুর সম্বন্ধেও দেখা যায় যে অভিব্যক্তিবাদীগণের সিদ্ধান্তমূলক অনুমানের অনুকূল সাক্ষ্যভাণ্ডার দু একটী পাওয়া গিয়াছে। ইউরোপের হাঙ্গেরী প্রদেশে হ্রদজাত শম্বূকাদির কতকগুলি ভাণ্ডার পাওয়া গিয়াছে এবং সেইগুলি সম্বন্ধে বিশেষ পর্য্যালোচনাও হইয়া গিয়াছে। এই ভাণ্ডারগুলি ভূপৃষ্ঠের ২০০০ ফুট নিম্নে পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ছয় হাজার বৎসরে এক ফুট স্তর গঠিত হয় ধরিলে এই সকল কঙ্কালাবশেষ জীবগুলি এক কোটী কুড়ি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল ধরা যাইতে পারে। এই শম্বূক সমস্ত একশ্রেণীর নহে—তাহাদিগকে আটভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে একটা বিশেষ সংযোগ আছে—সকল শ্রেণীর মধ্যে উদ্বর্ত্তন সূচক একটা আকার-পরিবৃত্তি দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে আধুনিকতর শম্বূকগুলি আদিম শম্বূক হইতে এত ভিন্ন যে তাহাদিগকে বিভিন্নপরিবারের মধ্যে পরিগণিত করিতে হইয়াছে। আরও একটী দৃষ্টান্ত দিই। কুম্ভীর ও টিকটিকী পরস্পর কত ভিন্ন, কিন্তু অধ্যাপক হক্‌স্‌লি ভূগর্ভ হইতে ইহাদের মধ্যবর্ত্তী সংযোগ কতকগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল মধ্যবর্ত্তী প্রাণীর শারীরিক অস্থিসংস্থানও মূলও অভিব্যক্ত উভয় প্রাণীর মধ্যবর্ত্তী। আবার আরও আশ্চর্য্য যে অধ্যাপক হকসলি আরও পুরাকালে পৌঁছিয়া টিকটিকিরও মূলে কতকগুলি প্রাণী আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাদের আকৃতি অনেকটা পক্ষীজাতির অনুসরণ করিয়াছে।



অশ্বজাতির মূল অনুসন্ধানে অভিব্যক্তিবাদের সপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তম সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে—অর্থাৎ সিদ্ধান্তমূলক অনুমানের অনুরূপ অশ্বজাতীয় প্রাণীকঙ্কাল ধারাবাহিকরূপে পাওয়া গিয়াছে। অশ্ব, গর্দ্দভ, জেব্রা এই জাতীয় বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের মধ্যে সাধারণ কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন আছে। উরু, পা, ক্ষুর এবং দন্ত, এই চারিটী বিষয়ে অশ্বজাতি অন্যান্য জন্তু হইতে পৃথক ভাবাপন্ন। সচরাচর চতুষ্পদ জন্তুর অগ্রবাহুর দুইটী করিয়া হাড় থাকে; কিন্তু ঘোড়ার সহসা দেখিলে একটা হাড়ই দেখা যায়—তবে একটু বিশেষভাবে দেখিলে দ্বিতীয় হাড়ের চিহ্ন দেখা যায়। ঘোড়ার পা যেন হাঁটু হইতে একটা আঙ্গুল বা গোড়ালি বাহির হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহারই অগ্রবর্ত্তী নখ যেন ক্ষুরের আকার ধারণ করিয়াছে। অন্যান্য গোড়ালি ও অঙ্গুলি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া নিতান্ত অপরিস্ফুট আদিম অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। পশ্চাতের পায়েও প্রায় ঐরূপ কার্য্য দৃষ্ট হয়। অশ্বজাতির দাঁত কঠিন কোমল পদার্থের দানা প্রভৃতি চিবাইবার উপযুক্তরূপে সংগঠিত। ইহাদের দাঁত অন্যান্য জীবজন্তুর দাঁতের সঙ্গে মেলে না। এই সকল বিশেষ বিশেষ প্রত্যঙ্গের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইহাদের কঙ্কাল অন্যান্য জীবের কঙ্কালের সহিত পৃথকভাবে অনায়াসেই আলোচনা করা যাইতে পারিবে—ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ইউরোপীয়গণ যখন প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন সেখানে একটীও ঘোড়া দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু সেখানে অশ্ববংশের দেহাবশেষ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সেখানে অশ্বজাতীয় যেসকল কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, সর্ব্বপশ্চাতে এমন এক জীবে পৌঁছিতে হয়, যাহা বর্ত্তমান অশ্ব হইতে অনেক ভিন্ন, এমন কি, মধ্যবর্ত্তী সংযোগগুলি না পাইলে বুঝিবার উপায় ছিল না যে উভয়ে এক জাতীয়। বর্ত্তমান

যুগের প্রত্যূষভাগে Eocene period শৃগালের ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতি একপ্রকার জীবের কতকগুলি শ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই জন্তুর পায়ের হাড়গুলি সম্পূর্ণই দেখা যায়, চারটা সুপরিস্ফুট গোড়ালিও আছে। ইহা ব্যতীত সম্মুখ পদে অপরিস্ফুট একটী গোড়ালি ও পশ্চাৎ পদে তিনটী গোড়ালি আছে। এই জীবের পায়ের ও দাঁতের গঠনের সাদৃশ্যেই ইহাকে অশ্বের সহিত একজাতীয় বলিয়া বুঝা গিয়াছে। কিছুকাল পরে এই জন্তুর কঙ্কাল অদৃশ্য—তৎপরিবর্ত্তে আকৃতিতে সমান খর্ব্বাকার আর এক জীবের আবির্ভাব; ইহার আকার সাধারণত প্রায়ই পূর্ব্বের অনুরূপ, তবে সামনের পায়ের অপরিস্ফুট গোড়ালিটী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য কতক বিষয়ে ঘোড়ার দিকে একটু অগ্রসর। আবার এ জন্তুও অদৃশ্য হইল, তৎপরিবর্ত্তে মেষের ন্যায় বৃহত্তর আকারের জীব উপস্থিত হইল; ইহার সামনের পায়ের তিনটী গোড়ালি এবং পায়ের হাড় ও দাঁত ঘোড়ার অভিমুখে অধিকতর উদ্বর্ত্তিত। ইহার পরে চতুর্থ জন্তুর আবির্ভাব; তাহার প্রত্যেক পায়ে তিনটী করিয়া গোড়ালি, কিন্তু তৃতীয় অপেক্ষা বৃহত্তর এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর। পঞ্চম জন্তু প্রায় গর্দ্দভের ন্যায় বৃহৎকায় এবং অনেকটা আধুনিক ঘোড়ার কাছাকাছি যায়, ইহারও প্রত্যেক পায়ে তিনটী করিয়া গোড়ালি, কিন্তু মাঝের গোড়ালি থেকে একটা অস্ফুট ক্ষুর বাহির হইয়া ভূমি স্পর্শ করে এবং অন্য দুইটী বিশেষ প্রয়োজনে আসে না। ষষ্ঠ জন্তু আধুনিক ঘোড়া হইতে অতি অল্পই ভিন্ন। ইহার দুইটী পার্শ্বস্থ গোড়ালি প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং মাঝেরটা ক্ষুরের আকারে অনেকটা পরিস্ফুট; ইহার পায়ের হাড় বর্ত্তমান ঘোড়ার সহিত প্রায় নিখুঁত সমান, দাঁতও অতি অল্প ভিন্ন। সর্ব্বশেষে আমরা বর্ত্তমান ঘোড়ার কঙ্কালাবশেষ প্রাপ্ত হই—এই অশ্ববংশ আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বেই কোন কারণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই যে ঘোটকের ইতিবৃত্ত বলিয়া আসিলাম, অভিব্যক্তিবাদীগণ প্রত্যেক অবস্থার জীবের কিরূপ হওয়া উচিত অনুমান করিয়াছিলেন, পরে সেইরূপ জীবের অস্থি পাইয়া বুঝিলেন যে তাঁহাদের অনুমান সত্যমূলক।

উপরোল্লিখিত দৃষ্টান্ত সমূহ আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকিতেই পারে



না যে জীবের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। ভগবানের আদেশ ব্যতীত, তাঁহার নিয়ম অতিক্রম করিয়া কিছুই সংঘটিত হইতেছে না। কিন্তু আমরা বলি যে অভিব্যক্তি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত অচলপ্রতিষ্ঠ একটি নিয়ম, একটি প্রণালী। পিতামাতার সন্তান যে তাঁহাদের আকৃতি ন্যূনাধিক পরিমাণে লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করে, আমরা তখন কি একথা বলি যে ভগবান এই সন্তানটিকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন? একদিক দিয়া একথা ঠিক—কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দিক দিয়া ইহা ঠিক নহে। আমরা বলিব যে বিশ্ববিধাতার নিয়ম অনুসরণ করিয়া সন্তান পিতামাতার আকৃতি ন্যূনাধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছে। সেইরূপ, যেমন অশ্বজাতির মধ্যে দেখিলাম, তেমনি যখন সকল প্রাণীর মধ্যেই বিভিন্নতার মাত্রা ক্রমশ বর্দ্ধিত দেখা যায়, তখন ঈশ্বর প্রত্যেকটিকে বিসৃষ্টি করিয়াছেন বলিবার পরিবর্ত্তে তাঁহারই নিয়মে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও আমাদের বুদ্ধিতে অধিকতর সায় পায়। অভিব্যক্তিবাদের শাখাপ্রশাখার অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু ইহা অস্বীকার করিতে পারিব না যে ইহার মূল অবিকৃত থাকিবে এবং এই অভিব্যক্তিবাদই আমাদের নয়নগোচর জীবন্ত প্রাণীসমূহের সৃষ্টি সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে এবং আমাদেরও হৃদয়ে উন্নততর দেবজন্মধারী মানব সৃষ্টির আশা আনয়ন করিয়া আনন্দময় সংসারের এক অভিনব চিত্র নয়নসম্মুখে উপস্থিত করে। অভিব্যক্তিবাদও ভগবানেরই মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# শিল্প সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র।

"শিল্প সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষেত্র" এই নামে একটি প্রবন্ধ "নিউ-রিভিউতে" প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলেন;—নিম্নশ্রেণীর জীবদিগের মধ্যেও সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রথমে পুরুষজাতির মধ্যেই রসাত্মিকা বৃত্তির বিকাশ দেখা যায়। পুরুষ পাখীরাই গান গাহিয়া থাকে—স্ত্রী পক্ষীরা নীরব। অসভ্য মনুষ্যজাতিদিগের মধ্যেও এই রহস্যটি পরিলক্ষিত হয়। শরীরকে বিভূষিত করা, অস্ত্রাদি ও ঘরকন্নার দ্রব্যসামগ্রীকে অলঙ্কৃত করা—ইহাই মানব শিল্পের সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা। এই সকল শিল্পে পুরুষরাই অগ্রগণ্য ছিল।

খোদন কার্য্য, চিত্র কার্য্য, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতি চারুশিল্প সামান্য অঙ্কুর হইতে আরম্ভ হইয়া সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন যেমন পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তাহার উপর পুরুষ জাতির প্রভাবই বিশেষরূপে দেখা যায়—তাহাতে স্ত্রীলোকের হস্তচিহ্ন অতি অল্পই আছে। পৃথিবীর বড় বড় শিল্পীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের মধ্যে এমন প্রায় দেখা যায় না, যাহারা একটা কিম্বা দুইটা বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে না পারে কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রতিভাশালী সুর-কবি একটিও জন্মায় নাই। চিত্রকর্ম্ম প্রভৃতিতে সেকানি, মারেণি, এবং রোজা বনর্ এই তিনটি নামের উল্লেখ করিলেই স্ত্রীলোকের তালিকা নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোক কবি ও লেখকের সংখ্যা অধিক। স্যাফো, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রৌনিং, জর্জ স্যাণ্ড, জর্জ এলিয়ট ইত্যাদি।

এ বিষয়ে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা যে নিকৃষ্ট তাহার বেশি প্রমাণ দিবার আবশ্যক নাই। কারণ এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইতে পারে না কিন্তু এই রূপ নিকৃষ্টতার কারণ কি? অনুসন্ধান রাখা আবশ্যক। ইহার প্রধান কারণ, স্ত্রীলেককেরা ইন্দ্রিয় লালসা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত শৈত্যভাবাপন্ন। এদিকে, প্রেমই চারু শিল্পের বীজ। চক্ষু কি কর্ণ এই সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্য রসবোধের প্রকৃত কেন্দ্র অধিষ্ঠিত নহে—কারণ ইহারা তো মনের দ্বার স্বরূপ। উহার প্রকৃত কেন্দ্র প্রেমিকতা-বৃত্তির মধ্যে নিহিত; অধিকাংশ চারু শিল্পই



এই বৃত্তিকে উত্তেজিত করিবার দিকে প্রবণ। স্ত্রীদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য পুরুষ পক্ষীরা গান গাহিয়া থাকেন, সুন্দর সুদৃশ্য নীড় প্রস্তুত করে। জীবের ক্রমবিকাশের প্রথম অবস্থাতে শিল্প ও প্রেমের মধ্যে এই যে যোগ দেখা যায়, সমুন্নত মানব সমাজেও তাহাই উন্নত আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ নাটক ও উপন্যাসে প্রেমের আলোচনাই থাকে প্রেমই গীতি-কাব্যের মূলমন্ত্র। চিত্রকার্য্যে ও মূর্ত্তি গঠনে যে সৌন্দর্য্য রসবোধ উপলব্ধি হয়—প্রকৃতপক্ষে উহা কি? উহা প্রেম-লালসায় ইন্দ্রিয়ানুভব ভিন্ন আর কিছুই নহে—তবে এই ইন্দ্রিয়ানুভবের সহিত মানসিক কল্পনা ও মানসিক ভাবেরও যোগ হইয়া থাকে। জীবন্ত ভাবের গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্ত্তি ও রুবেন্স ও ভাণ্ডিকের চিত্র দেখিয়া আমাদের যে এত আনন্দ হয় তাহার অর্থ এই যে, প্রেমের অনুভবে আমরা যেরূপ শিহরিত তনু হইয়া থাকি তাহারই ছায়া ঐ সকল শিল্পকার্য্যে আমরা দেখিতে পাই।

এই প্রেম-লালসার অল্পতা হেতু শিল্পকর্ম্মে স্ত্রীলোকের উৎপাদনী শক্তি নাই এমন কি দৈহিক সৌন্দর্য্যও তাহারা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে না। মেদিচি ভিনসের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা আদৌ মাতিয়া উঠে না। কিছুদিন হইল, অ্যাপলো বেলভিডিয়ারের মূর্ত্তি দেখিয়া একজন মহিলা আর কিছু বলিবার চাইলেন না—কেবল বলিলেন, উহার মুখে তাঁহার দ্বার রক্ষকের অনেকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়! কিন্তু প্রেম-লালসা শিল্প রচনার উপকরণ মাত্র—প্রেম প্রথমে উত্তেজিত হওয়া চাই, কিন্তু তাহার পর মস্তিষ্ক ভাবিয়া চিন্তিয়া উহাকে আকারে পরিণত করে।—উহাতে গঠন প্রদান করে। ইহাও স্ত্রীলোকের নিকৃষ্টতার আর একটি কারণ। মনুষ্যের এই গঠন শক্তিই এই সংশ্লেশনী শক্তিই বুদ্ধিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা—এই শক্তিই অতি মাত্রায় পরিপুষ্ট হইলেই প্রতিভা হইয়া দাঁড়ায় এবং এই শক্তিই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিরল। সংশ্লেশনী শক্তির অভাব হইলে শিল্প-রচনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার অভাবে মস্তিষ্কে নানা প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভব উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু তাহারা বিশেষ কোন আকার ধারণ না করিয়াই মরিয়া যায়।

একদিকে, প্রেম-ঘটিত ইন্দ্রিয়ানুভব স্ত্রীলোকের যেমন কম, আর

একদিকে মাংসপেশী-জনিত অনুভবও কম। যুঝাযুঝি ভাবের সঙ্গে এই অনুভব সর্ব্বদাই সংযুক্ত থাকে। শিল্পীর মনঃকল্পিত নায়ক সংগ্রামে জয়ী হউক বা বিজিত হউক, সেই সংগ্রামে যে প্রতিরোধিতা শক্তির আবশ্যক, সেই শক্তি শিল্পীর নিজে কতকটা অনুভব করা চাই। ইহা হইতেই মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর "শেষ বিচার" ও "মোজেস্" এই রচনাদ্বয়—মিলটনের "প্যারাডাইস লস্ট" বায়রণের ম্যান্‌ফ্রেড্ এবং গয়্‌তের ফাউস্টের কিয়দংশ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শরীর দুর্ব্বল হওয়ায় এই পৈশিক অনুভব তত প্রবল নহে কাজেই জীবন-নাট্যের সাংগ্রামিক ভাব তাহারা বড় উপলব্ধি করিতে পারে না।

কিন্তু যেখানে চুট্‌কি রকমের সৌন্দয্যের সংশ্রব আছে, সেই সব সৌন্দয্য স্ত্রীলোক চট্ করিয়া ধরিতে পারে এবং তাহাতে তাহার উদ্ভাবনী শক্তিও কতকটা প্রকাশ পায়। সেইজন্য মাইকেল অ্যাঞ্জেলো অপেক্ষা Watteaur রচনা এবং দস্তজুইস্কি অপেক্ষা কপের রচনা স্ত্রীলোকদের বেশি ভাল লাগে।

স্ত্রীলোকেরা মুখের ভাব দেখিয়া মনের ভাব চট্ করিয়া বুঝিতে পারে। তবে যে তাহারা নাটক সেক্সপিয়ারের মত লিখিতে পারে না, তাহার কারণ, তাহাদের উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ কম। তাহাদের মানব চরিত্র-জ্ঞান অন্ধ সংস্কারমাত্র—জীবনের কাজে তাহারা বেশ ইহাকে খাটাইতে পারে কিন্তু শিল্পরচনায় বড় কিছু কাজে আইসে না। কিন্তু কতকগুলি শিল্প আছে যাহাতে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একটা দৃষ্টান্ত, যেমন অভিনয় কার্য্য। বড় বড় অভিনেতা অপেক্ষা, বড় বড় অভিনেত্রীর সংখ্যা অধিক। ভাব অনুভব না করিয়া তাহারা ভাণ করিতে পারা এ বিষয়ে স্ত্রীলোক মাত্রেরই একটা অশিক্ষিত পটুত্ব আছে।

আর এক প্রকার শিল্পকার্য্যে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেহকে বিভূষিত করা—দ্রব্য সামগ্রী ও গৃহকে অলঙ্কৃত করা—এই সমস্ত কার্য্য যাহাতে পুরাকালীন অসভ্যেরাও কতকটা দক্ষ ছিল, ইহাতে স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সাজসজ্জা পরিচ্ছদে স্ত্রীলোকের উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশ পায়।

আর একটী বিষয়েও স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কথাবার্ত্তায়



পুরুষেরা স্ত্রীলোকের নিকট হার মানে। কথাবার্ত্তা চালাইবার কৌশল তাহাদের ন্যায় আর কেহ জানে না। কথোপকথনই স্ত্রীলোকের বাগ্মিতা। ফরাসী "স্যালোঁ"তে কত ডিমস্থিনিস ও পিটের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আদাম ষ্টাচেলের বন্ধুরা তাঁহাদের বলিতেন, তাহার সঙ্গে যাহারা কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন তাহারা তাঁহার লেখা অপেক্ষাকৃত নীরস বলিয়া মনে করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# অদৃষ্ট। *

[ ১ ]

আজ বিয়ে বাড়ীতে মহাধূম, আজ নরেন্দ্রের ফুলশয্যা। নরেন্দ্রের সহিত মনোরমার বিবাহ হইয়াছে। মনোরমা দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা মাত্র। দেখিতে সে সুন্দরী না হইলেও তাহার সেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে, সুগোল সুগঠিত দেহে, লাবণ্য ধারা উছলিয়া পড়িতেছিল, বিশেষ তাহার পদ্মপলাশ নয়ন ও ভ্রূতে সে মুখের শ্রী কি সুন্দর দেখাইতে ছিল। বিয়ের কনেটি তবু তাহার সেই প্রফুল্ল মুখ দেখিলে, কোন অপরিচিত লোক বুঝিতে পারিবেনা যে তাহার এই সবে বিবাহ হইয়াছে। সে হাসিয়া, গল্প করিয়া সমবয়সী ননদদের সহিত পান সাজিতেছিল, ছাদে বেড়াইতে ছিল, আর বার বার ঘোমটা টানিতেছিল; দুদিনের অভ্যাসে সে ভালরূপে অভ্যস্থ হইতে পারিতেছিল না। তাহাকে দেখিলেই যেন একটি জীবন্ত আনন্দরূপিণী প্রতিমা বলিয়া ভ্রম হয়। শ্বাশুড়ী খুড়শ্বাশুড়ী তাহার সেই সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেছিলেন।

দ্বিপ্রহরের আহারাদি শেষ হইয়াছে। একটি গৃহের কোলেই দালান, মনোরমার শ্বাশুড়ী এবং কয়েকজন আত্মীয়া মহিলা সেইখানে বসিয়া গল্পগুজব

* একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত

করিতেছিলেন ; মনোরমা ঘোমটা টানিয়া তাঁহাদের মাঝখানে বসিয়াছিল। এমন সময় তাহার কনিষ্ঠ দেবর সুরেন ছুটিয়া আসিয়া মাকে বলিল—

"মা তোমার গুরু ঠাকুর আসিয়াছেন, কনে বউকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন কি ?"

মা মস্তক হেলাইয়া সম্মতি জানাইলেন। বালক পুনরায় ছুটিয়া বাহিরে গেল। প্রাচীন ব্রাহ্মণ ভিতরে আসিয়া, মনোরমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ রাশি বর্ষণ করিয়া বলিলেন "তোমার হাত দেখি মা লক্ষ্মী।"

মনোরমা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সালঙ্কৃত ক্ষুদ্র হস্তটি বাহির করিয়া দিল। তিনি বিশেষ ভাবে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিলেন "মা তুমি লক্ষ্মী, তুমি চির সুখী হও" এই বলিয়া তিনি একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। সেই নিশ্বাসটী কেহ শুনিয়াছিল কি ? ব্রাহ্মণ কি মনোরমার নির্ম্মল সুখের আকাশে কালো মেঘের ছায়া দেখিয়াছিলেন ?

বড় ঘটা করিয়া সন্ধ্যার সময় ফুলশয্যা আসিল। মনোরমা সমবয়সী এক খুড়তুত ননদের সহিত তাহার দুদিনেই খুব ভাব হইয়াছিল। কুসুম শুইতে যাবার সময় বলিয়া গেল "বউ কাল আমায় আজ রাত্রে যা যা কথা হবে বলতে হবে।"

সে হাসিয়া সায় দিয়া বলিল "হাঁ।"

ফুলশয্যা আসার পর, কুটুম্ব বাড়ীর দাসী চাকরকে খাওয়াইয়া বিদায় করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। তাহার পর যখন মনোরমার শ্বাশুড়ী ননদরা মঙ্গলাচারের জন্য তাহাকে শয্যা হইতে তুলিতে গিয়া দেখিলেন যে তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছে। মনোরমার শ্বাশুড়ীর বুকে যেন একখানি পাথর কে বসাইয়া দিল। শুভ দিনে জ্বর গায়ে ত কোন শুভ কাজ হয় না তবু তিনি তাহাকে তুলিয়া ফুলশয্যার মঙ্গলাচার করিতে গেলেন, আত্মীয়স্বজনে কেহই জানিল না। কিন্তু তাঁহার প্রসন্ন অন্তরে কে যেন বিষাদের অন্ধকারে আবৃত করিল।

কোন শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে উভয়ের বিবাহ হইয়াছিল, তাহা কোন অন্তর্যামী ভিন্ন অন্যে কেমন করিয়া জানিবে ? কিন্তু সেই শুভ দৃষ্টির উভয়ের চিত্ত উভয়ে উভয়ের নিকট বিনিময় করিয়াছিল। নরেন



গৌরবর্ণ মুখে বিনয় ও নম্রতা সর্ব্বদাই প্রভাসিত হইত। তিনি পিতা মাতার অনুগত সন্তান, ভ্রাতা ভগিনীর স্নেহময় সহোদর ও আত্মীয় স্বজনের একান্ত প্রিয় ছিলেন। মনোরমা সেই ফুলশয্যার রাত্রে, সুকোমল শয্যায়, জ্বরের যাতনায় অধীর হইতেছিল, নরেন সারারাত পাখার বাতাস দিয়া, জলের গ্লাস মুখে ধরিয়া, ললাটে হাত বুলাইয়া সেই বালিকার চিত্ত চিরদিনের জন্য কিনিয়া লইলেন। মনোরমা দ্বাদশ বর্ষের বালিকা হইলেও সেইদিন হইতে স্বামীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে শিখিল।

ফুলশয্যার পরদিন বৌভাত হইবে। আত্মীয় স্বজনে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনোরমা তাহার প্রিয় সঙ্গিনী কুসুমকে সকল কথা বলিতে ভুলিল না। দ্বিপ্রহরের সময় হইতে তাহার পুনরায় জ্বর বাড়িল, তাহার দূর সম্পর্কীয়া এক ননদ, নরেনের হাত ধরিয়া টানিয়া সেই ঘরে আনিয়া বলিল

"নরেন দা বউয়ের হাত দেখত, জ্বর হয়েছে কি ?"

নরেন চিরকাল পরোপকারী, পরের সেবাই তাঁহার জীবনের সারব্রত। তিনি লজ্জিত হইয়া মৃদু হাসিয়া বউয়ের হাত দেখিয়া বলিলেন "খুব জ্বরত হয়েছে, চুপ করে শুয়ে থাকতে দাও।"

রহস্যপ্রিয়া ভগিনীটি কক্ষের অন্য সকলের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন

"দেখলে ত নরেনদার বউয়ের উপর টান কত, কাল সারারাত পাখার বাতাস করেছেন, গল্প করে বউটোকে ঘুমোতে দেন নাই বলেত আজ এত জ্বর হয়েছে।" নরেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া দ্রুতপদে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মনোরমা ঘোমটায় মুখ আবৃত করিয়া কুসুমের হাত টিপিয়া ধরিল।

মনোরমার জ্বর হইয়াছে শুনিয়া তাহার পরদিন তাহার পিতা আসিয়া তাকে লইয়া গেলেন। ক্রমেই বিয়ে বাড়ীর গোল কমিয়া আসিল। নরেনের পিতা সপরিবারে কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। গৃহে কেবল নরেনের প্রতিপনার ছেলে মেয়ে লইয়া ও নরেনের ঠাকুমা রহিলেন। নরেন বি মুগ্ধ হইতেছিলেন, একজামিন কাছে ; বাড়ীতে ছেলে মেয়েদের কোলাহলে দ্বিপড়া শুনা হয়না বলিয়া, তিনি বরাহনগরে তাঁহার এক বন্ধুর মনোরম তেন। তাঁহার সেখানে যাইবার পূর্ব্বের দিন ঠাকুমা একবার

* একঘর বসত করাইতে আনিলেন।

কুসুম দুপুর বেলা চুপি চুপি কনে বউয়ের নিকট ডাকিয়া আনিয়া কহিল "নরিদা এখন বলত বউকে কত ভালবাস।"

"তোর চেয়ে নয়" এই বলিয়া নরেন হাসিয়া বোনের চুল টানিয়া দিলেন।

[ ২ ]

বিবাহের পর মনোরমার পিতা কন্যাকে লইয়া আপন কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। কলিকাতা হইতে দূরে তিনি কর্ম্ম করিতেন। বিবাহের পর একপক্ষ অতীত না হইতে নরেন্দ্রের চিঠি আরম্ভ হইল। তিনি মনোরমার জন্য "স্বর্ণলতা" "সুশীলার উপাখ্যান" কিনিয়া পাঠাইয়া দিলেন, আর প্রতি পত্রে মনোরমাকে ভালরূপে পড়িতে, হাতের লেখা পরিষ্কার করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইতেন। তাঁহার পত্র এইরূপ হইত

"মনোরমা

আজ কোন বই পড়িলে? কতদুর পড়িলে। যাহা পড়িতেছ তাহার মানে বুঝিতেছ ত? যদি না পার ত বাবার নিকট বুঝাইয়া লইও। তুমি ভালরূপে লেখাপড়া শেখ, এই আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বাসনা জানিও। আমি যাহাতে সুখী হইব তুমি কি তাহা করিবে না? লেখা পড়া শিখিলে স্ত্রীলোক বুদ্ধিমতী হয়। সেকালের লোকেরা একালের মেয়েদের লেখা পড়া শেখা দোষের মনে করেন, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে খনা ও লীলাবতী বিদ্যাবতী ছিলেন না? আজকের ডাকে বুক পোষ্টে তোমায় একখানি নবনারী পাঠাইলাম। পড়িয়া কেমন লাগে আমায় লিখিও। গুরু-জনদিগকে আমার প্রণাম দিও। তুমি আমার ভালবাসা জানিও। আমায় দেখিতে ইচ্ছা করে কি?

তোমার নরেন

পুঃ তুমি যখন চিঠি লিখিতে, অক্ষর যাহাতে স্পষ্ট হয় ও লাইন বাঁকা না হয় তাহা করিবে। ইংরাজীতে ঠিকানা লিখিতে শিখিতেছ ত?"

মনোরমা তাহার উত্তরে প্রায় এই প্রকার উত্তর দিত।

"প্রিয়তম

তোমার পত্র পাইয়াছি, তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই করিতেছি। রোজ ৪ পাতা লিখি, তুমি আসিলে দেখাইব। আমি অত শাস্ত্র জানি না, তবে



প্রাণ থাকিতে তোমার কথনো অবাধ্য হইব না। বাবা তোমার বড় সুখ্যাত করেন, বলেন এমন জামাই কারো হয় নাই। পূজার সময় আসিবে ত? না এলে মা দুঃখিত হবেন। আমার তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করে কিনা জিজ্ঞাসা করেছ তা এলে বলিব। না দেখিয়া কি করিয়া বলিব যে ইচ্ছা করে কিনা। আমার প্রণাম ও ভালবাসা জানিও।

তোমার রমা"

মনোরমাকে সকলে আদর করিয়া রমা বলিয়া ডাকিত। তাহাদের এই সামান্য সরল পত্রে প্রাণের সকল কথা সুস্পষ্টরূপে প্রবাহিত হইত। নরেন আবার একবার সেই মুখখানি দেখিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। পরী-ক্ষার পড়ার যখন একান্ত মনোনিবেশ করিতেন, তখন মাঝে মাঝে সেই সরল মুখ, প্রেমপূর্ণ দুটি কালো চোক আসিয়া বুকের ভিতর উঁকিঝুঁকি মারিত। পূজার ছুটির পূর্ব্বে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক একখানি স্নেহলিপি পাঠাইলেন। কিন্তু নরেন পিতার বিনানুমতিতে কখনো কোন কাজ করেন নাই তিনি পিতাকে সেই পত্রখানি পাঠাইয়া দিলেন। নরেনের পিতা তাহাতে বিরক্ত হইয়া লিখিলেন "এখন একজামিন কাছে আসিতেছে যাওয়া হইতে পারে না আমি তোমার শ্বশুর মহাশয়কে তাহাই লিখিয়া দিলাম। ভালরূপে পড়িও আশা করি এবারে সেবারকার এল এর মত ফেল হইবে না।"

নরেনের হৃদয়ের চঞ্চল বাসনা নিরাশায় ডুবিয়া গেল। তিনি চক্ষের অভিমানাশ্রু মুছিয়া মনোরমার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন। "এখন যাইতে পারিলাম না একজামিন কাছে আসিতেছে, আশা করি সেজন্য ক্ষমা করিবেন।" মনোরমাকে সকল কথা খুলিয়া লিখিলেন। আশার আনন্দ পুলকে মনোরমা হৃদয় উচ্ছ্বলিত হইতেছিল, সহসা সেই পত্রখানি পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার মা নিকটে বসিয়া ছোট মেয়েটীর চুল বাঁধিয়া দিতেছিলেন, তিনি কন্যাকে পত্রপাঠ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি রে রমা নরেন আসবে ত?"

চমকিত হইয়া, মাতার প্রতি সেই সজল চক্ষে চাহিয়া মনোরমা কহিল—

"না শ্বশুর মহাশয় বারণ করেছেন"

মাতা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, প্রথম মেয়েটী—জামাই লইয়া সাধ আহ্লাদ বুঝি কপালে নাই। তাহার পর মৃদু স্বরে কহিলেন—

"তা নাই আসুক ভাল থাক, আমি আর কিছু চাইনা।"

[ ৩ ]

একজামিন দিয়াই নরেন তাহার খুড়ীর সহিত জামালপুর যাইবে স্থির হইল। নরেনের এক খুড়তুতো বোনের মরণাপন্ন সঙ্কট পীড়ার পর, ডাক্তার বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার কেহই ছিল না, কাজেই নরেনকে সঙ্গে যাইতে হইবে। নরেন যাইবার পূর্ব্বে একবার শ্বশুরালয়ে যাইবার স্থির করিল, এত অল্প দিন বাকি ছিল যে পিতার অনুমতি আনাইয়া যাওয়া হইত না। কাজেই পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই নরেন শ্বশুরালয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম ও শেষ তিনি পিতার অবাধ্য হইয়াছিলেন। মনোরমা সাহস করিয়া স্বামীকে আসিতে লেখে নাই, কিন্তু প্রতি পত্রেই সে লিখিত "তোমায় বড় দেখিতে ইচ্ছা করে, কবে দেখিব তাহা ঈশ্বর জানেন"। নরেন্দ্র সেই করুণ আহ্বানে মন্ত্রমুগ্ধের মত চলিয়া গেলেন।

নরেন শ্বশুরালয়ে আসিবার পর, তাঁহার শ্বশুর মহাশয় ও শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর আর আনন্দ ধরে না। জামাইকে কোথায় রাখিবেন, কি খাওয়াইবেন কি প্রকারে আদর যত্ন করিবেন, এই চিন্তাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান হইল। কিন্তু নরেন পিতাকে না বলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া সাহস করিয়া বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না, কেবল মাত্র চারিটি দিন ছিলেন। সে চারিদিন যেন স্বপ্নের মত কাটিয়া গেল। রমার মা মেয়েকে প্রথমেই বলিয়া দিলেন "বাড়ীতে অন্য কেহ নাই যে নরেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, তুমি সর্ব্বদাই কাছে কাছে থাকিও। এখন আর সংসারের কাজ দেখিতে হইবে না।"

মনোরমার যে টুকু চক্ষু লজ্জা ছিল মায়ের অনুমতি পাইয়া চলিয়া গেল। অবিচ্ছিন্ন সুখ স্রোতে দুইটী হৃদয় মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেল। রমা স্বামীকে সেলাই দেখাইয়া পড়া শুনাইয়া আর তৃপ্তি লাভ করিতে পারিত না। নরেন প্রত্যহ তাহাকে সকল কবিতা পুস্তক হইতে কবিতা পড়িয়া শুনাইতেন।



একদিন "প্রভাত সঙ্গীতের" "অভিমানিনী নির্ঝরিণী" শুনিয়া রমা বলিল "এ যেন ঠিক আমারি মত, বিশেষ এই লাইনটী

শৈশব স্বপন গুলি
সব যেন গেছি ভুলি
ঢলিয়ে পোড়েছি প্রেমে, প্রেম পারাবারে।"

"তা হোলে তোমার ভালবাসা বিফল প্রেম কেমন ?"

"তাত আর বলছিনা আমার মনের কথার সঙ্গে মিলে গেল তাই বল্লাম।"

"এত তোমায় কে শেখালে বল দেখি ?"

"কেন তুমি ; সারদা মঙ্গলের আমার সেইটে খুব ভাল লাগে।"

"কোনটা"

"যদি তুমি না হাসত বলি।"

"হাসব না বল ত শুনি।"

কেন সেই যে "যত মনে অভিলাষ
তত তুমি ভালবাস
তত মন প্রাণ ভরে আমি ভালবাসি।"

নরেন হাসিয়া রমার প্রতি চাহিলেন। রমা ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া দিল। যাইবার নাম করিলেই রমার মনে কেমন অজানা বিষাদের ছায়া জাগিয়া উঠিত।

নরেন বলিলেন—"রমা এইবার ত চলে যাব আবার কবে দেখা হবে কে জানে।"

রমা নরেনের হাত ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয়া কহিল

"যাবার নামে আমার প্রাণের ভিতর এমন করে কেন ?"

নরেন হাসিয়া চক্ষের জল মুছিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

বিদায়ের পূর্ব্ব রাত্রে আর উভয়ের নিদ্রা হইল না। সারারাত সেই জ্যোৎস্না দীপ্ত ছাদের উপর বেড়াইয়া, সিঁড়ির উপর বসিয়া, গল্প করিয়া কাটাইয়া দিলেন। সেই একি কথা বার বার কহিয়া, শুনিয়া কি উভয়ের তৃপ্তি হইতেছিল ? মানবের জীবনে প্রথম পবিত্র প্রণয়ের মত আর কি আছে ? যখন সকাল হইয়া আসিল রমা নরেন্দ্রের বক্ষে মাথা রাখিয়া আর

অশ্রুজল লুকাইতে পারিল দা। কাতর কণ্ঠে নরেন্দ্র কহিলেন

"কাঁদিওনা রমা, বাবা বোধ হয় এবার তোমায় শীঘ্র লইয়া যাইবেন।"

নরেন্দ্রের অশ্রু রমার কেশে ঝরিয়া পড়িতেছিল, রমা সেই অশ্রু সিক্ত মুখ তুলিয়া কহিল—

"তা নয় তোমায় যেতে দিতে আমার বড় ভয় হচ্ছে, মনে হচ্ছে বুঝি আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।"

"আশ্চর্য্য কি ? যদি আমি মরিয়া যাই"—রমা নরেনের মুখে হাত দিয়া বলিল

"অমন অলক্ষণে কথা যাবার দিন মুখে এনো না। আমি এমন কি পাপ করেছি যে তোমায় হারাব ? তবে তুমি দেবতা আমি অনেক পুণ্য করেছিলুম বলেই ত ভগবানের কৃপায় তোমায় পেয়েছি।"

সেই ত্রয়োদশ বর্ষিয়া বালিকা, এত কথা কোথা হইতে শিখিয়াছিল কে জানে।

ক্রমে বিদায়ের সময় আসিল। রমার নিকট বিদায় লইয়া আসা নরেনের পক্ষে সুকঠিন হইল, অথচ সে গ্রাম ষ্টেসন হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে, পাল্কী করিয়া গিয়া তবে ট্রেণ ধরিতে হইবে। অবশেষে নরেন একবার মাত্র সেই অশ্রু সিক্ত মুখ তুলিয়া চুম্বন করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বারান্দায় শশ্রু ঠাকুরাণী ছিলেন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তিনি বাহির বাটীতে আসিলেন। পাল্কীর নিকট মনোরমার পিতা দাঁড়াইয়াছিলেন, নরেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিবার পর, তিনি সস্নেহে নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন "তোমার পিতা সৌভাগ্যবান তাই এমন পুত্র পাইয়াছেন।" সলজ্জে নরেন্দ্র পাল্কীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। সারাপথ তাঁহার মনে শ্বশুর মহাশয় ও শশ্রু ঠাকুরাণীর অকৃত্রিম স্নেহ ও মনোরমার অশ্রুসিক্ত কমল নয়ন দুটী মানস পটে জাগিয়াছিল। তাঁহার কেবল মনে হইতেছিল

"কিন্তু আহা দু দিনের তরে হেথা এনু
একটী কোমল প্রাণ ভেঙ্গে রেখে গেনু"

[ ৪ ]

জামালপুরে আসিবার সপ্তাহ খানেক পরে নরেন পিতার একপত্র পাই-



লেন। সে পত্রে দুইখান ষ্ট্যাম্প দেখিয়াই তাঁহার খুলিবার সময় হস্ত স্তম্ভিত হইতেছিল। তিনি বিস্মিত হইয়া পত্র পাঠ করিয়া জানিলেন, যে তাঁহার পিতা মনোরমার পিতার পত্রে তাঁহার শ্বশুরালয়ে গমনের সংবাদ শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে লিখিয়াছেন এবং তিনি পিতার অবাধ্য সন্তান এই কথা বলিয়াছেন। পত্র পাঠ করিয়া নরেন মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি জীবনে কখনো পিতার কঠিন কথা বা ভৎর্সনা শুনেন নাই। নরেন শয্যায় পড়িয়া বালকের মত রোদন করিতে লাগিলেন, কোন কার্য্য বশতঃ নরেনের খুড়ীমা সেই ঘরে আসিয়া নরেনকে সেই ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন

"কি হয়েছে নরেন পাশের সংবাদ বেরিয়েছে বুঝি ?"

অশ্রুপূর্ণ নয়নে খুড়ীমার প্রতি চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে নরেন বলিলেন

তা নয় খুড়ীমা, শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিলুম বলে বাবা বড় রাগ করেছেন"

"সেইজন্য ছেলে মানুষের মত কাঁদছ ? তোমার বাবার যেমন কথা ; দেখব অন্য ছেলেরা কি করে। এ বাড়ীর নিয়মই এই, যে ভাল হয় তারি ঘাড়ে চাপ পড়ে"। খুড়ীমার সস্নেহ বাক্যে নরেন পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন।

ইহার মাস খানেক পরে বি এ একজামিনের সংবাদ গেজেটে প্রকাশিত হইল। আশার আনন্দে নরেন্দ্র গেজেটের পাতা উলটাইয়া চলিলেন, কিন্তু নাম আর মিলিল না। নরেনের চক্ষুর জ্যোতি যেন নিভিয়া গেল। নিতান্ত ম্রিয়মান হইয়া, কাতর হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিবার পর, তাঁহার খুড়ীমা তাঁহার নিরাশা ব্যথিত মলিন মুখ দেখিয়া সকল বুঝিলেন, তিনি সাহস দিয়া বলিলেন

"নাইবা পাস হলে, এ বছর মন দিয়ে পড়িলেই পাস হবে।"

নিতান্ত অবসন্ন ভাবে নরেন বারান্দায় মাটিতে বসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন তাহার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "খুড়ীমা এ যেন আমার পুত্র শোকের মত বোধ হইতেছে। বাবা কি বলিবেন ? শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা কি ভাবিবে ?"

"কি আর বলিবে ? তুমি ত আর ইচ্ছা করিয়া ফেল হও নাই।"

তাহার কয়েক দিন পরেই মনোরমার পিতার পত্র আসিল

"প্রিয় নরেন

এবার গেজেটে তোমার নাম দেখিলাম না। এবার অকৃত কার্য্য হইয়াছ বলিয়া নিরাশ হইও না। আমাদের সেই পুরান বাঁধা গৎ মনে করিও

"যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে"

এবার মন দিয়া পড়িলেই পাস হবে। আমি দু দিনেই তোমায় বুঝিয়াছি, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল মরুন এই প্রার্থনা।

তোমার শুভার্থি

শ্রী—"

সেইদিনই নরেন মনোরমার পত্র পাইল

"প্রিয়তম নঃ

বাবার মুখে শুনিলাম একজামিনে পাশ হও নাই, কিন্তু সেজন্য আমরা কেহ দুঃখিত হই নাই। এবার নাইবা পাস হলে, তুমি ভাল থাক এই আমার প্রার্থনা। আমার এ সময় তোমার নিকট থাকিতে ইচ্ছা করে, তোমায় বড় দেখিতে ইচ্ছা করে, যাক সে কথা। শীঘ্র পত্র দিও আমার মাথা খাও দুঃখ করিও না। খুড়ীমাকে প্রণাম দিও। তুমি আমার ভালবাসা জানিও।

তোমার রমা"

এই দুখানি পত্র নরেন্দ্রের সেই দুঃখের সময় সুখের ছায়ার মত বোধ হইতে লাগিল। অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের মত জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু নরেন্দ্রের পিতা একটিও পত্র দিলেন না। কেবল কয়েকদিন পরে তাঁহার ছোট ভাই লিখিল

"দাদা

তুমি পাশ করিতে পার নাই কেন? সবাই কি বলে জান? বিয়ে করে বিগড়ে গেছে। বাবা বলেন ভাল করে পড় নাই তাই ফেল হলে। তবে আমার বিশ্বাস তুমি ভাল করে পড়েও পাস হলে না, তোমার কাগজ ভাল করে একজামিন করে নাই। আমি যে তোমার জন্যই এত ভাল করে পাশ হয়েছি, সে কথা তোমার মনে আছে ত? ইতি

তোমার ছোট ভাই যতীন"



নরেন আবার বিষাদ তিমিরে ডুবিলেন, হায় তাঁহার আশার আলোকের কি এই শেষ হইল?

এই সময় নরেন্দ্রের পিতা মাতা নরেনের খুড়ীমাকে আপনাদিগের নিকট লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। নরেনের কলেজ খুলিবে, আর জামালপুরে থাকা হইবে না। জামালপুর হইতে তাঁহার পিতার কর্ম্মস্থান দুদিনের পথ। যাইবার দিন স্থির হইবার পর নরেন্দ্রের পিতা লোকজন সহ গাড়ী ও পাল্কী পাঠাইয়া দিলেন। কারণ সে পথ ট্রেণের নয়, গাড়ী বা পাল্কীতে যাইতে হয়। পরদিন প্রভাতে যাত্রার দিন স্থির হইল। নরেনের দুইজন বন্ধু সেইদিন আসিয়া নরেন্দ্রকে লইয়া তিন পাহাড়ে বেড়াইতে গেলেন। নরেন্দ্র একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধুদিগের অনুরোধে যাইতে বাধ্য হইলেন। যখন তিনি যাত্রা করিতে বাহির হইয়াছেন ঠিক সেই সময় পিয়ন আসিয়া তাহাকে একটি পত্র দিল। মনোরমার পত্র, নরেন তাড়াতাড়ি পত্র পড়িয়া বক্ষের পকেটে রাখিয়া খুড়ীমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন

"খুড়ীমা আজ যদি নৌকা ডুবি হয় ত বেশ হয়"

"সে কি কথা নরেন, ওকথা মুখে এনো না।"

"তা হলে বাবাকে আর এ কালা মুখ দেখাতে হয় না"

"ও কি কথা নরেন তা হলে আজ আর তোমার গিয়ে কাজ নাই" বাহির হইতে তাঁহার বন্ধুদ্বয় "নরেন শীঘ্র এস বেলা হয়ে গেল" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

নরেন "আসচি" বলিয়া পুনরায় খুড়ীকে বলিলেন

"বউ কি লিখেছে জান?"

"কি?"

"আমার জন্য তার ভারি ভাবনা, দুঃস্বপ্ন দেখেছে; দুঃস্বপ্ন মানে আর কি হবে তার মানে আমি মরে গেছি। তা আমি মরে গেলে তোমরা বউকে দেখবে ত? আমার ত 'সাধ হয়েছে মনে, দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবী জীবনে'"

"নরেন আজ তোমার কি হয়েছে, ও সব অলক্ষণ কথা কেন বলচ?"

নরেন হাসিয়া অন্য কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

তিন পাহাড়ে গিয়া তাঁহারা নৌকা করিয়া গঙ্গার বক্ষে একটি মন্দির দেখিতে গেলেন। সেথান হইতে প্রকৃতির দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়, সেইজন্য তাঁহারা সেখানে গিয়াছিলেন। সেই প্রস্তরের দ্বীপের মত একটি স্থান, সেইস্থানে একটি মহাদেবের মন্দির। সেইস্থানে নৌকা লাগাইয়া সকলে অবতরণ করিলেন। সঙ্গে ভৃত্য ছিল, আহারীয় দ্রব্যাদি আনিয়াছিল, সে রন্ধন কার্য্যে মন দিল। মাঝি মাল্লারা উঠিয়া আপন আপন আহারের যোগাড় করিতে লাগিল। তখন তাহারা তিন বন্ধুতে মিলিয়া স্নানে গেলেন। তাহার ভিতর একটী সন্তরণ প্রিয় বালক সন্তরণ দিতে লাগিল, সে একেবারেই সন্তরণ পটু ছিল না। তাহার কিয়ৎদূরেই জলের স্রোতের বেগ এত অধিক যে স্রোতের মুখে পড়িলেই টানিয়া লইয়া যায়, সহসা সেই বালকটি সেই স্রোতের মুখে পড়িয়া ভাসিয়া চলিল, দেখিয়াই নরেন বজ্রাহতের মত অবশ হইয়া পশ্চাতে না ফিরিয়াই হটিতে আরম্ভ করিয়া "মাঝি মাঝি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অপর বন্ধু কূলেই ছিলেন, তিনি তীরাভিমুখে ছুটিয়া মাঝিদের ডাকিতে লাগিলেন, সহসা একবার ফিরিয়া আর নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না, আকুল আতঙ্কে চাহিয়া রহিলেন, সহসা নরেন্দ্র যে স্থানে ছিলেন সেইস্থানে দুইটি বাহু দেখা গেল, মুহূর্ত্তের মধ্যেই পুনরায় কোন অতল জলে ডুবিয়া গেল। অপর বালকটি স্রোতাভিমুখে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। ইহা লিখিতে বা বলিতে যত সময় লাগিল, ঘটিতে তাহা হইল না। রঙ্গভূমির একটি সিনের মত পড়িয়াই উঠিয়া গেল। যিনি বাঁচিয়া ছিলেন তাঁহার নাম শরতচন্দ্র, নরেন্দ্রের প্রতিবাসী, তাঁহার আকুল চীৎকারে মাঝি মাল্লা ছুটিয়া আসিল। মাঝিরা আসিবার পর আর তাঁহার বাক্য সরিল না, তিনি 'ঐ ঐ' বলিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। দূরে গঙ্গার বক্ষে একখানি তোয়ালে ভাসিতেছে, ভৃত্য নরেন নাই দেখিয়া সকল কথা বুঝিতে পারিল। তখন তাহারা দুইজনে গঙ্গাবক্ষে সাঁতারিয়া চলিল। শরতচন্দ্র তাহার পর উঠিয়া যে স্থানে নরেন্দ্রের বাহু শেষবার দেখা গিয়াছিল, সেইস্থান লক্ষ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। মাঝিরা গিয়া দেখিল, সেখানে অতল জল, এবং এক প্রকাণ্ড খাদ। মাঝিরা কোনরূপে তাহার তল পাইল না, তাহার মধ্যে কয়েকজন ভাল ডুবুরি মাঝি



ছিল তাহারা কিছুতেই তল পাইল না। বিফল মনোরথ হইয়া তাহারা ফিরিয়া চলিয়া আসিল।

নরেন ও যতীশের (অপর বালকটি) একত্রে বাড়ী আসিবার কথা। রাত নটা অবধি নরেনের খুড়ীমা আহারের দ্রব্য সজ্জিত করিয়া বসিয়া আছেন। আগামী প্রভাতে নরেনের পিতার কর্ম্মস্থানে যাইবার কথা।

তিনি ছেলে মেয়েদের খাওয়াইয়া, আপনি নরেন্দ্রের জন্য বসিয়া আছেন; নিকটে যতীশের মা (সম্পর্কে নরেন্দ্রের দিদি) বসিয়া গল্প করিতেছেন। এমন সময় গৃহের দ্বার খুলিয়া ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল। নরেনের খুড়ীমা শুধু ভৃত্যকে সেই প্রকারে আসিতে দেখিয়া সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন কহিলেন

"কি রে হরি ছেলেরা কোথা?"

হরি নিরুত্তর, চক্ষের অশ্রুধারা আর বাধা মানিল না।

যতীশের মা বলিলেন "কি রে আমার যতীশ কই?"

বৃদ্ধ ভৃত্য নিরুত্তর। তিনি ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন দেখিলেন কেহ নাই, পার্শ্বেই শরতচন্দ্রের বাটী হইতে মৃদু রোদন ধ্বনি আসিতেছে। তিনি ছুটিয়া তাহাদের গৃহে গিয়া দেখিলেন শরতের মা বসিয়া কাঁদিতেছেন, শরতচন্দ্র মুখে বস্ত্র দিয়া বসিয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহার চক্ষের দীপ্তি নিভিয়া গেল, তিনি তবু একবার শরতের হাত ধরিয়া কহিলেন—তাঁহার স্বর যেন বসিয়া গিয়াছে—

"শরত, নরি ও যতী কোথা?"

শরতচন্দ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কহিলেন—

"মাসীমা আমি কোনরূপে তাহাদের বাঁচাইতে পারিলাম না আমি কি করিব মাসীমা?"

"তারা নাই? আমার যতী নাই?" আর বাক্য সরিল না প্রস্তর পুত্তলিকার মত তিনি সেইস্থানে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন।

গ্রামের লোকেরা পরবর্ত্তী সকল স্থানে টেলিগ্রাম করিল, প্রতি গ্রামের কূলে কূলে লক্ষ্য রাখাইল। গঙ্গার বক্ষ জুড়িয়া জাল ফেলাইল, ষ্টীমার নৌকাতে গঙ্গা বক্ষ ছাইয়া ফেলিল, তবু তাঁহাদের দেহ মিলিল না।

তিনদিন পরে নরেন্দ্রের খুড়ী মর্ম্মাহত হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ীতে নামিবামাত্র নরেনের ঠাকুমা কঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন "এলিরে, আমার সোণার যাদুকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে ফিরে এলিরে ?" নরেন্দ্রের খুড়ীমার যাতনা অব্যক্ত, পরের পুত্রকে পুত্রাধিক স্নেহ করিয়া, আজ একি দুঃখের পশরা তিনি বুকে লইলেন? তাঁহার ভাগ্যে তাহাই লিখা ছিল।

[ ৫ ]

তাহার কয়েকদিন পরে নরেন্দ্রের পিতার লোকজন, তাঁহার কর্ম্মস্থানে পুনরায় ফিরিয়া গেল। একদিন দ্বিপ্রহরের সময় বাড়ীর ছেলে মেয়েরা সেই গাড়ী ও পাল্কী দেখিয়া আনন্দ পুলকে ছুটিয়া আসিল। অন্তঃপুরে নরেন্দ্রের জননী ও ভগিনীরা কত সাধ করিয়া কত মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। নরেন্দ্রের জননীর বড় সাধ একবার "যা" লইয়া ঘর করেন। কখনও তাহা হয় নাই তাই অদ্য তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। নরেন্দ্রের ভগিনীরা সব শ্বশুরালয়ে ছিল, বহুদিন পরে দাদাকে দেখিবে, খুড়ীমাকে দেখিবে, তাহারা ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়া চিকের অন্তরালে দাঁড়াইল

ছেলেদের কোলাহলে নরেন্দ্রের পিতা অগ্রসর হইয়া বাহিরে আসিলেন। সেই যে পুত্রকে কঠিন পত্র লিখার পর, আর একখানিও পত্র দেন নাই, অদ্য স্নেহে বিগলিত অনুতপ্ত হৃদয়ে পুত্রকে বক্ষে ধরিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হায় এ কি! পাল্কী ও গাড়ী শূন্য, কই কেহত আসে নাই। শুষ্ক ম্লান বেশে অশ্রু বিগলিত নয়নে, পুরাতন ভৃত্য নতমুখে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্রের পিতার বক্ষের শোণিত প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল। অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হইরা তিনি কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ক্যা হায় লালধারী সব কোই আয়ে নেই ?"

"নেই হুজুর আনে নেই স্যাকে"

তিনি ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে কহিলেন

"কা হুয়া হু লালধারী ?"

"বাবু গঙ্গামে ডুব গিয়া হুজুর"



"কোন বাবুরে ? হামারা বড়া বাবু আচ্ছা ত ?

"হুজুর আপনা বড়া বাবুইত ডুব গিয়া"

নরেন্দ্রের পিতা ওঃ বলিয়া একটী হৃদয় ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সেই-স্থানে জ্ঞান শূন্যের মত বসিয়া পড়িলেন।

অন্তঃপুরে ক্রন্দনের কোলাহল উঠিল। সে বাড়ীর ক্রন্দন ধ্বনিতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইতেছিল।

* * * *

সেই বাঙ্গলা দেশের এক প্রান্তে মনোরমা কি করিতেছিল ?

স্বামীর শেষ প্রেম পত্রিকা খানি লইয়া বার বার রাখিতেছিল, ও বার বার খুলিয়া পড়িতেছিল। যেদিন নরেন্দ্র পৃথিবীর নিকট জন্মের মত শেষ বিদায় লইয়া ছিলেন, সেইদিন তিনি পাহাড়ে যাইবাব পূর্ব্বে এই পত্রখানি লিখিয়া গিয়াছিলেন। সে পত্র অদ্য ৪।৫ দিন হইল আসিয়াছে, তাহার পর আর কোনও সংবাদ মনোরমা পায় নাই। সে প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিত ও প্রত্যহ একটী পত্র পাইত। সহসা ৪।৫ দিন কোন সংবাদ না পাইয়া তাহার আর ভাবনার সীমা নাই। হায় অভাগিনী তখন কি জানিত যে তাঁহার জন্মের মত সব সাধ আশা শেষ হইয়াছে। তাহা হইতে বঙ্গের বিধবার সংখ্যা একটী বাড়িয়াছে। সে কত কি ভাবিয়া পুনরায় একখানি পত্র লিখিয়া, ঝিকে ডাকিয়া ডাকে ফেলিতে দিল। সে বারান্দায় আসার পর তাহার মা বলিলেন

"আয় রমা এই বেলা তোর চুল বেঁধে দি"

"না মা আজ থাক"

"আজ কি নরেনের চিঠি এসেছে ?"

মেয়ে চমকিত হইয়া বলিল "কই নাত।"

"তা হলে হয় ত সে আসবে, উনি ত তোর শ্বশুর কে অনেক করে লিখে-ছেন। কাল জামাই ষষ্ঠী বোধ হয় তা হলে সে কাল আসবে," মনোরমা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

পরদিন প্রভাতে মাতা ও কন্যা গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় ডাক আসিল। মনোরমার পিতা অন্তঃপুরের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন, ভৃত্য পত্র

আনিয়া তাঁহার হস্তে দিল।

তিনি পত্র না খুলিয়াই বলিলেন "মনোরমা তোর মা কোথায় ?"

তিনি রান্না ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন,

"কেন এইযে নরেনের আসবার কোন খবর এয়েছে কি ? সে এলোনা বুঝি ? আহা এই প্রথমবার জামাই ষষ্ঠীতে বাছাকে নিয়ে সাধ আহ্লাদ কর্ব্বার কি ইচ্ছাই আমার ছিল।"

"কই আর এলো বল, এই দেখনা জামালপুর থেকে কে চিঠি দিয়েছে, লেখাটা নূতন নূতন ঠেকছে।"

"তা খুলে পড়ইনা কেন, কে লিখেছে জানবে।"

"এই যে পড়ি" এই বলিয়া তিনি যেমন পত্র খুলিয়া প্রথম লাইন পড়িলেন, অমনি চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার হস্ত পত্রের মত কম্পিত হইয়া উঠিল।

মনোরমা মাতা ভীত হইয়া বলিলেন

"কি হয়েছে গো, অমন কচ্ছ কেন, বলনা কি হয়েছে ?" মনোরমা দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল, মাতার কণ্ঠস্বরে ছুটিয়া পিতার নিকট আসিয়া পিতাকে পত্র হস্তে সেইরূপ ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া, তাহার মনে হইল যে বুঝি হৃদপিণ্ড এখনি ফাটিয়া বাহির হইবে ; চক্ষে যেন সব অন্ধকার হইয়া গেল। সে লজ্জা ভুলিয়া পিতার হস্ত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল

"কি হয়েছে বাবা শীগ্‌গীর করে বল, আমার সর্ব্বনাশ হয় নাই ত ? পিতা কন্যাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া, উচ্চস্বরে বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন। মনোরমার মাতা বজ্রাহতের মত ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। আর মনোরমা সে পিতার বক্ষে মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

* * * *

সময়ে সকলি সহিয়া যায়। সেই শোক সে অভাব সকলি কালে কমিয়া আসে। যে গিয়াছে, অন্যে আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করে। কিন্তু সে স্মৃতি এখনো কি বিধবার শূন্য বক্ষে জাগিয়া নাই ? কে জানিত সেই শুভ বিবাহের পর উভয়ের অদৃষ্টে ইহা ছিল। ঈশ্বর মঙ্গলময় তাঁহারি ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। মনোরমাকে এখন কে মনে করিতেছে কেবা চাহিতেছে। এখনো সে অযত্নে



পালিত বন্য কুসুমের মত পড়িয়া আছে। কবে সেদিন আসিবে যেদিন আবার সে নরেন্দ্রকে পাইয়া সকল ব্যথা ভুলিবে। এই জগতের বিরহের পর কি সেই পুণ্যালোকে চিরমিলন হইবে না ?

এ পৃথিবীতে আসিয়া শুধু তাহার

"হল সার অশ্রুঢালা
নিরাশ মরম জ্বালা
দিবানিশি কুলু কুলু আকুল বিলাপ।"

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

---

# গীতি-কুঞ্জ।

## আলো ছায়া।

গৌরী—ঝাঁপতাল।

তোমার দিন কাটে পুলকে,
দুঃখ মোর পলকে পলকে,
ভাল লাগে নাকো তাই হাসি খেলা ;
চৌদিক হেরি উদাস যেন,
ভাবি দুঃখের কপাল হেন,
ব'সে থাকি আপন মনে একেলা।
পশ্চিমে সূর্য্য ডুবিয়া যায়
দেখিয়া পরাণ করে হায়,
মনে হয় এইরূপ অবসান ;—
আলোকের পরে অন্ধকার,
প্রাণ গেলে মৃত্যুতে কে কার—
সমুদয় তবে স্বপন সমান !

আকাশে সুধীরে ফোটে তারা
হেরিছে উর্দ্ধে এ আঁখি তারা,
দেখিতে দেখিতে চোখে নিদ্রা আসে ;
সুখের ঘটনা মনে জাগে
কত প্রেমে কত অনুরাগে,
ভাবি কেন প্রাণে প্রাণ ভালবাসে।
সুখ টুকু গেলে প্রাণে দুঃখ আসে,
হিত কহে বিশ্বে কাঁদে কেহ হাসে
আলো ছায়া খেলে এই মহাকাশে।

---

## ছিল ভাল না দেখাই।

বেহাগ—জৎ।

রোজ আমি সেথা যাই,
গিয়ে তার দেখা পাই ;
সোপানে সুধীরে নাবে
কথা কবে মনে ভাবে,
সরমে বাধিয়া যায়
কথা হয়নাকো হায়,
দেখা দিয়ে কথা নাই
ছিল ভাল না দেখাই।

---

## প্রভো তুমি কৃপা কর।

কানাড়া—ঢিমে তেতালা।

এ জীবন হইবেই অবসন্ন
প্রভো না যদি হও তুমি প্রসন্ন ;



এ জীবনে আসিবেই অবসাদ,
প্রভো না যদি পাই তব প্রসাদ ;
প্রভো তুমি কৃপা কর কৃপা কর
মম দুঃখ হর মম দুঃখ হর।

---

## সুখী যদি লোকে মূর্খ কয়।

কেদারা—আড়াঠেকা।

যখনি আমার নিজেকে মনে হয়
তখনি ধুঝিরে নিজেকে কিছু নয় ;
করিতেছি কি এমন কাজ
কাজ দেখি মোর হয় লাজ ;
নিজেকে অতিশয় তুচ্ছ মনে হয়
সুখী যদি আমারে লোকে মূর্খ কয়।

---

## ফুল বনে।

বাহার—ঠুংরি।

এস সখি ফুলবনে
যাই মোরা নিরজনে,
কত ফুল আছে ফুটে
কত ফুল পড়ে ঝ'রে ;
সেথা কত অলি জুটে
সারাবেলা গুঞ্জরে।

এস মোরা দুইজনে
যাই, সাধ গেছে মনে।

---

## দেখ।

সাহানা – ঝাঁপতাল।

বিষয়ের মোহময় মলিন আবেশে
রয়েছ মগন ;
একবার দেখ শোভে কি সুন্দর বেশে
অসীম গগন !
বিচিত্র সৌন্দর্য্য কিবা উন্মুক্ত মহান
বক্ষে কত লোক ;
দিবানিশি গ্রহ তারা হ'তে ঝরে গান
আনন্দ আলোক।

---

## দুই জনে।

শ্রীরাগ—পটতাল।

রহিব নিরজনে
বসিয়া দুইজনে
তটিনীর তীরে ;
মৃদুল সমীরণে
কেমন এ কাননে
শব্দ হয় ধীরে।



দুজনে তুলে আঁখি
দেখিব নানা পাখী
ডাকে নানা সুরে ;
হেথায় ব'সে দোঁহে
রহিব কিবা মোহে
মধুর মধুরে।
ফুলের গন্ধ আসে
নদীতে নৌকা ভাসে
কতরূপ শোভা—
দুজনে দেখি ব'সে
শান্ত এ প্রদোষে,
সন্ধ্যা মনোলোভা।
কিরণ ঝরে জলে
ছায়ায় তরুতলে
হাঁসেরা বেড়ায় ;
স্বপনসম অলি
গুঞ্জরি যায় চলি
ফুলের বেড়ায়।

---

## কেমনে তোমায় পাব !

সাহানা—জলদতেতালা।

কেমনে তোমায় পাব কহ মোরে কহ,
পাপমোচয়িতা তুমি পুণ্যের আবহ ;
মাথাটী হেলায়ে বসি কত চিন্তা করি,
কেমনে তোমায় পাব কহ মোরে হরি ;

ডাকে পাখী, ফোটে ফুল জ্বলে গ্রহতারা,
তোমারি নিগূঢ় কথা কহে মোরে তারা ;
গোপনে র'য়েছো তুমি অথচ প্রকাশ,
তোমারি মহিমা গাহে অনন্ত আকাশ ;
কেমনে তোমায় পাব কহ ভগবন,
বাঁচিয়া তোমারি তরে মোর এ জীবন।

---

## হেসে হেসে চলে গেছে।

বাহার—ঠুংরি।

হেসে হেসে চলে গেছে
কোন কথা বলেনি ;
হেলে দুলে চ'লে গেছে
নিকটেতে আসেনি ;
প্রাণ ধীরে ছুঁয়ে গেছে
হৃদি ধীরে টুটে গেছে
আর কিছু করেনি।

---

## মধুর স্বপন।

মিশ্র বাহার—জৎ।

পূরবে মেঘের মাঝে
সোনার চাঁদ উঁকি মারে ;
দূরে ওই বাঁশী বাজে—
কে যেন ডাকিছে আমারে।



ফুটেছে রজনীগন্ধ,
আসিছে সৌরভ মধুর,
বহে বায়ু মন্দ মন্দ
কেন এ পরাণ বিধুর।
কোথা পিক ডাকে কুহু
দূরে ঐ ডাকিছে পাপিয়া ;
কারে মনে পড়ে মুহু
কার তরে আকুল হিয়া।
একি অনাহত বাণী!—
কে যেন আমার আপন—
কে মোর হৃদয়রাণী
আহা কি মধুর স্বপন!

---

## দুঃখের জীবন।

রামকেলি—কাওয়ালি।

যে দুখ পেয়েছি মনে
পারি না কহিতে,
গেছে কাল নিরজনে
বহিতে বহিতে ;—
বহিতে পারি না আর
দুঃখ ভার এই,
হায় রে প্রাণে আমার
কেন সুখ নেই!

---

## একা যেতে বনপথে।

ভূপালী বাহার—ঝাঁপতাল।

একা যেতে বনপথে
দেখেছিনু কাল তারে,
কত সুখ মনোরথে
দেখে গেল সে আমারে।
ক্ষণতরে দুটী আঁখি
ছিল দুটী আঁখি পরে,
আকুল এ প্রাণ-পাখী
চির প্রেম-সুধাতরে।

শ্রীহিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

---

# জগন্নাথ তীর্থে গুরু নানক ও জগন্নাথের আরতি। *

—:++:—

গুরু নানকের মত দেশ পর্য্যটক কেবল ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে কেন প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারীদিগের মধ্যেও অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি উত্তরে হিমাচল হইতে দক্ষিণে লঙ্কা পর্য্যন্ত এবং আসামের প্রান্ত হইতে পশ্চিমে গান্ধার পর্য্যন্ত ভারতের চতুর্দ্দিকে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নাম প্রচার না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। এই নব্যযুগে ভারতে যখন রেলপথে অগ্নিযানে যাতায়াতের সুবিধা হয় নাই তখনও ইংরাজ রাজত্বকালে পথের ও বাহনের সেরূপ অসুবিধা ছিল না। এই কারণে ইংরাজ রাজত্বের দিবালোকে তীর্থযাত্রাও বিশেষ অসাধ্য সাধন ব্যাপার নহে। কিন্তু সেই ঘোর মুসলমান রাজত্বের রজনীতে ভাবিয়া দেখ পথে এক পা চলিতে কত না বিপদ ছিল। কিন্তু যোগসিদ্ধ নির্ভীক হৃদয় গুরু নানক সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া এক ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক অবাধে ভারতের নবখণ্ডে বিচরণ করিয়া সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের নামে কত সাধুব্যক্তিকে প্রকৃত মুক্তির পথ দেখাইয়াছিলেন এবং কত অসাধু পামর ব্যক্তিকে সৎপথের পথিক করিয়াছিলেন। হিন্দুর কোন তীর্থই তিনি দেখিতে বাকী রাখেন নাই। তাঁহার সেই সকল স্থানে যে সব বিস্ময়জনক ঘটনাবলী ঘটিয়াছিল তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহা একাধারে যেমন আনন্দদায়ক ও মনোরম তেমনি প্রচুর উপদেশ পূর্ণ। ঐ সকল পাঠ করিলে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা সুদৃঢ় না হইয়া যাইতে পারে না।

গুরু নানকের গয়াদর্শন সমাপ্ত হইলে তিনি মর্দ্দানাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গয়া ত দেখা হইল মর্দ্দানা এক্ষণে আর কোথায় যাইবে—জগন্নাথ

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে প্রপঠিত।

দেখিবে ?'' তাহাতে মর্দ্দানা বলিল—"যাহা আপনার ইচ্ছা''। তাই গুরু নানক জগন্নাথের অভিমুখে চলিলেন। পথে কত ভীষণ জঙ্গল ও নানা দুর্গম প্রদেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে জগন্নাথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

জগন্নাথের যাহারা পুজারী তাহারা সব ব্রাহ্মণ ছিল। তাহারা নানককে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতেই দিল না। তাহাতে 'বাবা নানক' মর্দ্দানাকে বলিলেন—"চল ভাই মর্দ্দানা আমরা বাহিরে গিয়া বসি ; যদি জগন্নাথ স্বয়ং ডাকেন ত যাইব।" বাবা নানক জগন্নাথের বহির্দ্দেশে আসিয়া পরমানন্দে সমুদ্র সৈকতে গিয়া বসিয়া রহিলেন। "অতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ'' অতিথি স্বর্গের সেতু। গুরু নানক বহুদূর হইতে জগন্নাথে আসিয়াছেন পাণ্ডারা কোথায় পূজ্যপাদ সাধু অতিথির সৎকার ও সেবা পূর্ব্বক জগন্নাথের মন্দিরাদি দর্শন করাইয়া পাদ্য ও অর্ঘ্যাদির দ্বারা যত্ন করিবে তাহা নয়, সঙ্কীর্ণতা বশতঃ তাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতেই দিল না। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার সঙ্গে মুসলমান শিষ্য মর্দ্দানা ছিল সেই জন্য বোধ হয় ব্রাহ্মণ পাণ্ডারা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। আদর সৎকার দূরে থাকুক অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হয় নাই। যাই হউক গুরু নানক পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া সমুদ্র সৈকতে সমাধিমগ্ন চিত্তে সমাসীন রহিলেন। সেই দিন যখন শ্রীজগন্নাথজীর ভোগ লাগিবার সময় হইল তখন পাণ্ডারা স্বর্ণ থালিতে করিয়া জগন্নাথের ভোগ রাখিয়া আসিল। সেই দিন কিন্তু জগন্নাথের ভোগ লাগিল না। পাণ্ডারা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল মন্দিরে ভোগের থালী পর্য্যন্ত নাই। ঈশ্বরের কৃপাবলে ও গুরু নানকের যোগ সিদ্ধি বলে আশ্চর্য্য যে সেই থালী ভোগ সমেত গুরু নানকের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কৃপায় সকলেই সিদ্ধ হইতে পারে। লোক চক্ষে যাহা অসম্ভব বা অলৌকিক তাহাও যে দৈব বলে সম্ভব হইতে পারে না তাহা নয়। যখন গুরু নানক তাঁহার শিষ্যদ্বয় সহ একাকী অসহায় অবস্থায় সমুদ্র তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন তখন কেই বা তাঁহাদেয় আহার যোগায় কেই বা তাঁহাদিগকে রক্ষা করে। ভক্তের রক্ষার জন্য এবং পাণ্ডাদিগকে যথোচিত শিক্ষা দিবার জন্য প্রভু পরমেশ্বর জগন্নাথ ( জগতের নাথ ) স্বয়ং মন্দিরের ভোগ নানকের সমীপে আনিয়া



উপস্থিত করিয়াছিলেন ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি ? * গুরু নানক সেই সমুদ্র সৈকতে তৃষাতুর শিষ্যদ্বয়ের জলপানার্থ হস্তদ্বারা বালুকা অপসারিত করিলেন আশ্চর্য্য যে লবণাক্ত জলের পরিবর্ত্তে সেই স্থান হইতে অতি সুমিষ্ট স্বচ্ছ পানীয় জল নির্গত হইল। শিখেরা সেই স্থানে একটী 'বাউলী' বা ক্ষুদ্র বাপী নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়াছেন। ঐ স্থান এক্ষণে শিখতীর্থরূপে পরিণত। ঐ বাউলী একেবারে সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত হইলেও উহার জল অত্যন্ত সুমিষ্ট। সমস্ত জগন্নাথক্ষেত্রে এমন সুমিষ্ট জল আর কোথায়ও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

এদিকে পাণ্ডারা ঠাকুরের ভোগ লাগে নাই দেখিয়া কত প্রার্থনা ও মানত করিতে লাগিল। গললগ্নীকৃতবস্ত্রে যোড়করে তাহারা সকলে জগন্নাথের নিকট অনেক বিনতি করিল। সকলের মুখ একেবারে শুষ্ক ও ম্লান হইয়া গিয়াছিল। তাহারা জগন্নাথের সমীপে বলিতে লাগিল "হে দেব আমরা কি দোষ করিয়াছি। ক্ষমা কর, আমাদিগের প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর।" এইরূপে যখন তাহারা বড়ই দীন ভাবাপন্ন হইল তখন জগন্নাথের আদেশ হইল যে "তোমরা আমার পরম ভক্ত নানক নিরংকারীকে আমার সম্মুখে আসিতে দাও নাই এই জন্য আমি বড়ই অপ্রসন্ন হইয়াছি। আমার পরম প্রিয় নানককে এখানে লইয়া আইস তবে ভোগ লাগিবে।" যখন জগন্নাথের এই আদেশ হইল তখন সকল পাণ্ডারা যোড়করে শ্রীগুরু নানকের পায়ে আসিয়া পড়িল।

---

* যোগবলের কথায় এক্ষণে অনেকের অবিশ্বাস হইতে পারে। যাঁহারা পরমেশ্বরের নামে সিদ্ধ তাঁহারা যে সকল অসাধ্য সাধন ব্যাপার করিয়া থাকেন তাহা শুনিলে সাধারণ লোকের অবিশ্বাস্য বলিয়াই বোধ হয়। কবিত্বে যাঁহারা সিদ্ধ তাঁহারা সহজে যে সুন্দর কবিতাবলী রচনা করেন তাহা যেমন সাধারণের অলৌকিক বলিয়াই মনে হয় ইহাও সেইরূপ। ঈশ্বরের নামে যাঁহাদিগের অণিমাদি সিদ্ধি লাভ হইয়াছে যোগবলে তাঁহাদিগের অনেক অলৌকিক ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা জন্মে। প্রকৃত কথা এই যে ঈশ্বরের নামে এবং যমনিয়মাদি সাধনের দ্বারা তাঁহাদিগের চিত্ত বৃত্তির এরূপ একটী শক্তি বা ঘনীভূত তেজ উৎপন্ন হয়, যে যাহাতে তাঁহাদিগের চিৎশক্তির, জড়ের উপর বিশেষ আধিপত্য বা কর্ত্তৃত্ব জন্মে। যে কর্ত্তৃত্বের বলে তাঁহারা অনেকটা ইচ্ছামত চেতনশক্তির দ্বারা জড়কে চালনা করিতে সক্ষম হয়েন।

তাহারা নানককে অনেক বিনতি পূর্ব্বক বলিল যে "হে সাধু হে ভক্ত 'শ্রীবোধাবতার জগন্নাথজীর' আজ্ঞা হইয়াছে আপনাকে মন্দিরের ভিতরে চলিতেই হইবে। আপনি চলিলে তবে ঠাকুরজীর ভোগ লাগিবে।" শ্রীগুরু নানক পাণ্ডাদিগকে বলিলেন "ভাই তোমরা আমাদিগকে ঠাকুরের মন্দির ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলে না আমি কিন্তু আপন মন্দিরে জগন্নাথের দর্শন করিতেছি। তোমরা যাও গিয়া নিরংকার জগন্নাথের ভোগ লাগাও।" ইহাতে তাহারা বলিল "হে স্বামীজী আপনি সাধুপুরুষ আমাদের দোষ মার্জ্জনা করুন; আপনাকে একবার কৃপাপূর্ব্বক মন্দিরে পদার্পণ করিতেই হইবে।" তাহার পরে গুরু নানক উঠিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন। জগন্নাথের আদেশানুসারে মহাপ্রসাদ তিনি হস্তেই লাভ করিলেন। সেই অবধি জগন্নাথের ইহা আদেশ আছে যে গুরু নানকের শিষ্য যদি কেহ এখানে আসেন তবে তাঁহাকে কাহারও নিষেধ করিবার অধিকার নাই।

তাহার পরে আরতির সময়ে যখন পাণ্ডারা সকলে আরতি করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল তখন ভক্ত নানক দণ্ডায়মান না হইয়া মগ্নচিত্তে বসিয়াই রহিলেন। আরতি সমাপ্ত হইলে পাণ্ডারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "হে ভক্ত আরতির সময় আপনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন না? জগন্নাথের আরতি করিলেন না?" তখন নানক বলিলেন—"দুই প্রকার আরতি আছে, এক আরতি ঈশ্বরের ও আর এক আরতি জীবের। তোমরা বল আমি কোন আরতি করিব?" তখন পাণ্ডারা বলিল "আপনার যাহা ভাল মনে হয় আপনি তাহাই করুন। আপনার উপরে শ্রীনারায়ণ বোধাবতারের * বড়ই কৃপা আছে। যাহা আপনি করিবেন তাহা ভালই হইবে।" পরে শ্রীগুরু নানক ধনাশ্রী রাগে একটী গান করিয়া সমগ্র জগতের নাথ সেই পূর্ণ পরব্রহ্মের আরতি করিলেন। মলয়ানিল যখন পুষ্পগন্ধে সমীরিত হইতেছিল, যখন সান্ধ্য গগনের এক প্রান্তে রবি ও আরেক প্রান্তে চন্দ্র রক্তিম রাগে শোভা পাইতেছিল, যখন সমুদ্রবীচির ভেরী নিনাদে চারিদিক ধ্বনিত হইতেছিল সেই সুমধুর বাসন্তী সন্ধ্যায় পরমেশ্বরের

* প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন শিখ গ্রন্থে জগন্নাথকে অনেক স্থলে "নারায়ণ বোধাবতার" বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাবের সম্মিশ্রণে জগন্নাথ দেবের উৎপত্তি কিছু অসম্ভব নহে।



মহান আরতির ভাবে মগ্ন না হইয়া কে যাইতে পারে? গুরু নানক সন্ধ্যার মধুর রাগে যাহা গান করিলেন সকলে মোহিত হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল।

রাগ ধনাশ্রী।

গগন্‌মে থাল রবি চন্দ্র দীপক্ বনে।
তারকা মণ্ডল জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিলো পত্তন্ চওঁরো করে।
সগল বন রায়্ ফুলন্ত জ্যোতি।
কেয়সি আরতি হোয় ভবখণ্ডন তেরি আরতি।
অনাহতা সবদ বাজন্ত ভেরী।
সহস্তো নয়ন্ নন নয়ন্ তোহে কো।
সহস্ মূরৎ নন এক তোহি।
সহস্ পদ বিমল্ নন একপদ গন্ধবিন্।
সহস্তো গন্ধ্ এব চলত মোহি।
সব মহ্ জ্যোৎ জ্যোৎ হেয় সোয়্।
তিস্‌দে চানন্ সব মেয়্ চানন্ হোয়্।
গুরু সাখী জ্যোৎ পর্‌ঘট্ হোয়্।
জো তিস্ ভাবে সো আর্‌তি হোয়্।
হর্ চরণ্ কমল্ মকরন্দ লোভিত্।
মনো অনদিনো মোহে আহি পিয়াসা।
কৃপা জল্ দেহ্ নানক সারঙ্গকো।
হোয় জাতে তেরে নায়্ বাসা॥

"গগনের থালে রবিচন্দ্ররূপ দীপক শোভা পাইতেছে। সে গগনের থাল তারকামণ্ডলরূপ মুক্তাফল খচিত। পরমেশ্বরের আরতিতে ধূপ হইয়াছে মলয়ানিল আর পবন রূপ চামরের ব্যজন চলিতেছে। সকল বনরাজীর 'কুসুমাবলী যেন আরতির পুষ্পাবলী হইয়াছে। হে ভবখণ্ডন তোমার এ কেমন আরতি হইতেছে। এ আরতিতে অনাহত শব্দরূপ ভেরী বাদ্য বাজিতেছে। তোমার সহস্র নয়ন অথচ তোমার একটীও নয়ন নাই। তোমার সহস্ররূপ অথচ তুমি রূপ হীন, তোমার সহস্র বিমল পদ অথচ তোমার একটীও পদ

নাই। তুমি গন্ধ বিহীন অথচ তোমার সহস্র মোহকারী গন্ধ বহিতেছে। সকল বস্তুতে যাঁহার জ্যোতি প্রকাশিত এবং যিনি জ্যোতি স্বরূপ, তিনি সর্ব্ব-বস্তুতে প্রকাশিত আছেন বলিয়া সকলি প্রকাশিত। সেই জ্যোতি স্বরূপ পরব্রহ্ম গুরূপদেশের দ্বারা প্রকাশিত হয়েন। তাঁহাকে ভাবিলেই তাঁহার আরতি করা হয়। সেই হরির চরণ কমলের মধুপানে আমার মন অনুদিন লোভিত। আমার পিপাসা লাগিয়াছে; হে ঈশ্বর নানক চাতককে কৃপাবারি দাও। যাহাতে তোমার নামে আমার চির অনুরাগ থাকে।" *

এই গান শ্রবণান্তে পাণ্ডারা সকলে শ্রীগুরু নানকের চরণে আসিয়া প্রণিপাত করিল। তিনি পাণ্ডাদিগকে ভবিষ্যতে যাহাতে সাধু সজ্জনের বিশেষ সমাদর ও সেবা শুশ্রূষা করা হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তাহার পর এক 'সবদ্' বা পদ বলিলেন।

রূৎ আইলে সরস্ বসন্ত মাহ্।
রঙ্গ্ রাতে রমহ্ সে তেরে চাহ্।
কিস্ পূজ চঢ়াঁও লগোঁ পায়।
তেরা দাসন্দাসা কহোঁরায়।
জগজীবন যুগৎন মিলিয়ে কায়।
তেরি মূরৎ একা বহুৎ রূপ।
কিস্ পূজ চঢ়াঁও দেঁও ধুপ।
তেরা অন্তন পায়া কঁহা পায়।
তেরে দাসন্দাসা কহোঁ রায়।
তেরে সঠ সম্বৎ সব তীরথা।
তেরা সচ্ নাম পরমেশ্বরা।
তেরি গৎ অবিগৎ নহি জানিয়ে।
অনজানত নাম বখানিয়ে।
নানক বিচারা কেয়া কহে।
সব্ লোক্ সলাহে একসে।
সির নানক লোকা পাওহে।
বল্হারি যাঁও জেতে তেরে নাঁও হে॥

"সরস বসন্ত ঋতু আসিয়াছে হে পরমেশ্বর তোমার সাথে রমণ করিতে আমার চিত্ত অভিলাষী হইয়াছে। আমি আর কাহার জন্য পূজা চড়াইব? আমি তোমার দাসানুদাস পায়ে পড়িয়া আছি। সেই জগজ্জীবন পরমেশ্বরকে যুক্তিতর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না। হে ঈশ্বর তোমার মূর্ত্তি এক অর্থাৎ তোমার এক অকালমূর্ত্তি কিন্তু তোমার বিশ্বে বহু রূপ বিদ্যমান। কোন্‌রূপ বস্তুর জন্য পূজা চড়াইব আর ধূপ লাগাইব? (অর্থাৎ ঈশ্বরকে উপাসনা না করিয়া তাঁহার নানারূপ সৃষ্ট বস্তুর পূজা বিড়ম্বনা মাত্র।) হে ঈশ্বর তোমার অন্ত কেহ পায় নাই। আমি কেমনে পাইব? আমি তোমার দাসানুদাস বলিয়া আপনাকে জানি। যে সময়ে বা যেস্থানে তোমার নাম হয় তাহাই তীর্থ। তোমার সত্য নাম পরমেশ্বর। তোমার কি যে অভিপ্রায় তাহা কেহই জানে না। না জানিয়াই সকলে তোমার নাম গান করে। বেচারী অজ্ঞ নানক কি বলিবে? সকল লোকেই সেই এক তোমার স্তুতি গান করিতেছে। যাঁহারা তোমার স্তুতি গান করে তাঁহাদের পদতলে আমি আমার মস্তক স্থাপিত করি। তোমার যত নাম সকল নামেই আমি বলিহারি যাই।" ইহার পর জগন্নাথের রাজা ও সেখানকার পাণ্ডারা সকলেই তাঁহার শিষ্য হইলেন। গুরুজী নানক সকলের উপর প্রসন্ন হইলেন। সেখানকার লোকেরাও গুরু নানকের দর্শনে পরম আনন্দিত হইল। গুরু নানকের জগন্নাথ দর্শন সমাপ্ত হইলে সেখান হইতে উঠিয়া অযোধ্যার অভিমুখে চলিলেন। *

গুরু নানকের এই সকল কীর্ত্তি কলাপ দর্শনার্থে পঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য

* এই গানটীর প্রথমাংশটুকু "বাজন্তভেরী" পর্য্যন্ত ব্রহ্মসংগীতের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে ইহা জয়জয়ন্তী রাগে গীত হয়। প্রাচীন গায়ক ওস্তাদগণ অনেকে ধানশ্রীর পরিবর্ত্তে জয়জয়ন্তীতে উহা গান করিতেন। কিন্তু গুরু নানক সম্বন্ধে রাগিণী ধনাশ্রীতে এই গীতটী বসাইয়া সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানের ও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন।



* গুরু নানক ১৫৬৭ সম্বতে বসন্ত কালে জগন্নাথ গিয়াছিলেন। তিনি যখন জগন্নাথ গিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর।

প্রভৃতি নানা দিগ্দেশ হইতে শিখগণ নিত্য জগন্নাথ তীর্থে আসিয়া থাকেন। শিখেরা জগন্নাথে অন্য কোন পাণ্ডার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। কেবল এক "কল্‌যুগী" উপাধিধারী পাণ্ডা আছে, যে কোন দেশ হইতে যে কোন শিখই আসুননা কেন কল্‌যুগী পাণ্ডার আশ্রয় লইবেন। প্রসিদ্ধি আছে যে এই কল্‌যুগী পাণ্ডার আদি পুরুষের উপরে প্রসন্ন হইয়া গুরু নানক তাহাকে এক তাম্রফলক দিয়াছিলেন। সেই তাম্রফলকের জন্যই "কলযুগী" পাণ্ডা শিখদিগের বিশেষ সম্মানভাজন। সেই নানকের তাম্রফলকখানি এখনও নাকি "কল্‌যুগ" পাণ্ডার গৃহে বিদ্যমান।

গুরু নানক জগন্নাথে আসিবার পথে কটকেও কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি কটকে যেস্থানে দন্তধাবনাদি করিয়াছিলেন সেস্থানে এখন "বাহগুরুর মঠ" বা শিখ মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# ঈশ্বর প্রেম ও দূরদর্শিতা। *

আমরা যৌবনের প্রারম্ভে পদ নিঃক্ষেপ করিয়াছি, আমরা যেন এখন হইতে দূরদর্শী হই—যেন ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকল কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই। শিশু সন্তানেরা বর্ত্তমানের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, ভবিষ্যতের প্রতি চক্ষু কদাপি উন্মীলন করেনা। তাহাদিগের বর্ত্তমান ইচ্ছার শান্তি হইলেই সুখী হয়; ক্ষুধায় ক্ষুধিত হইলেই ক্রন্দন করে এবং ক্ষুধার শান্তি হইলেই আমোদিত হয়। এই প্রকারে শিশুকাল গত হইয়া যখন বালক কাল উপস্থিত হয় তখন আবার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভবিষ্যৎ দৃষ্টির উদয় হইতে থাকে, তাহারা আগ্রহ পূর্ব্বক বিদ্যালয়ের ক্রীড়াকালকে উপেক্ষা করে, তাহারা শিক্ষকের তুষ্টি সাধনের নিমিত্তে অথবা দণ্ড প্রাপ্তির ভয়ে বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করে। এইরূপে শিশুকাল ও বাল্যকালে ক্রীড়া ও আমোদেই অধিকাংশ সময় গত হয়। সংসারের কুটিল পথ দেখিতে তাহারা তখন অক্ষম থাকে; তাহারা চিন্তা রহিত হইয়া অক্লেশে সময় যাপন করে। তাহারা না মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়, না ঈশ্বর প্রেমে মত্ত হয়। তাহারা যেখানে থাকুক পুনঃ পুনঃ মাতার ক্রোড়ে যাইবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এবং ধর্ম্মপথস্থিতা ঈশ্বর পরায়ণা সাধ্বীমাতারাও, সেই ধূলায় ধূসর অর্দ্ধস্ফুট মধুরবাক সন্তানদিগকে ক্রোড়ে লইয়া মুখে শত শত চুম্বন করতঃ ঈশ্বরোপাসনায় তাহাদিগের সেই কোমল মনকে অল্পে অল্পে রত করেন। কারণ তিনি তাহার পুত্রের যথার্থ মঙ্গল প্রার্থনা করেন। শিশুকালে হৃদয়ে যাহা একবার দৃঢ়রূপে প্রবিষ্ট হয় তাহা বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই প্রকারে আনন্দের সহিত বাল্যকাল পর্য্যন্ত গত হয়; আমাদেরও সেই প্রকারে বাল্যাবস্থা গত হইয়াছে। এতদিন প্রায় আমরা ভবিষ্যতের দিকে চক্ষুকে একবারও উন্মীলন করি নাই, কেবল বর্ত্তমান লইয়াই জাগ্রত ছিলাম, এখন আমাদিগের চক্ষু উত্তম-

* ১৭৮২ শকে লিখিত।

রূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এখন আমাদিগের যে কেবল বর্ত্তমান ক্ষুধার শান্তি হইলেই হয় এমত নহে, এখন আমরা যে কত প্রকার ভবিষ্যৎ কল্পনা করি তাহার ঠিক নাই। যাঁহারা পুত্রকন্যা লাভদ্বারা পরিবারের স্বামী বলিয়া গণ্য হয়েন তাঁহারা পুত্রকন্যার কর্ণবেঁধ বিবাহ প্রভৃতির নানা প্রকার জল্পনা করেন ও তাহাদিগের ভরণ পোষণার্থে অতি দুঃখেতেও ধন সঞ্চয় করেন; যাঁহাদিগের কেবল বিবাহ বিধি সম্পন্ন হইয়াছে তাঁহারা পুনরায় পুত্রকন্যার মুখ দর্শনের নিমিত্ত লালায়িত থাকেন এবং যাহাদিগের বিবাহ বিধি সম্পন্ন হয় নাই তাহাদিগের কল্পনা সকল আকাশমার্গে উড্ডীন হইতে থাকে, তাহারা কত প্রকার যে আকাশ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, কত প্রকার মৃগতৃষ্ণিকায় যে ভ্রমণ করেন ও কত প্রকার যে স্বর্ণজালে বদ্ধ হন তাহার আর সীমা করা যায় না। এই প্রকার সাংসারিক আশারূপ-যষ্টি অবলম্বন করিয়া যৌবনাবস্থায় পদার্পিত ব্যক্তিরা যদিও নানা প্রকার ক্ষণিক দুঃখ অতিক্রম করে, যদিও তাহারা এই প্রকার আত্মগত মনোরথদ্বারা মনকে উজ্জ্বল রাখে বটে কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবেক যে এই সকল মনোরথদ্বারা কখনই চিরস্থায়ী সুখ লাভ করা যায় না। যদি কখন কোন ব্যক্তি এক সংসারিক বিষয়ের নিমিত্তে লালায়িত থাকে, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ তাহার মন কখনই তৃপ্তি লাভ করে না; ততঃপর অনেক কষ্ট করিয়া যদিও সে তাহার সেই অভিমত বস্তু প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহা এখন কেবল তাহাকে ক্ষণিক সুখ প্রদান করে এবং সে ব্যক্তি শীঘ্রই তৎপ্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে। তবে ইহা এখন আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে ঈশ্বর স্বয়ং এ প্রকার প্রণালীতে নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন যে আমরা এই অনিত্য সংসারে চিরস্থায়ী সুখ অপ্রাপ্ত হইয়া সেই আনন্দরূপ অমৃত স্বরূপেরই প্রতি অটল ভাবে মন স্থাপন করিব,—যিনি আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করিতে ক্ষণ কালের নিমিত্তও বিরত হইবেন না এবং যে আনন্দ উপভোগ দ্বারা কখনই পুরাতন বোধ হয় না বরং উহা নিত্যই নব্য বেশ ধারণ করে।

সাংসারিক দূরদর্শী মাত্র হইলে তত উপকার দর্শে না যত আমাদিগের ঈশ্বরবিষয়ক দূরদৃষ্টি দ্বারা হইবার সম্ভব। ঈশ্বরবিষয়ক ও ধর্ম্মবিষয়ক



আলাপনই আমাদিগের যথার্থ হিতসাধক। ঈশ্বরপরায়ণ যুবকেরা ঈশ্বরানুরাগে মত্ত হইয়া ও ঈশ্বরের প্রীতি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া তাঁহাকে রসস্বরূপ তৃপ্তি হেতু বলিয়া গণ্য করেন এবং এই রস আস্বাদন করিয়া তাঁহারা সাংসারিক কুটিল পথ অনায়াসেই অতিক্রম করেন। যদি পৃথিবীর কোন যথার্থ বন্ধুর প্রীতি লাভের নিমিত্ত অথবা লোকভয়ে ভীত হইয়া কোন মন্দ ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিতে সমর্থ হই, তবে কেন আমরা, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্ধু যাঁহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও গোপন রাখিবার উপায় নাই এবং যিনি পাপীদিগের পক্ষে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" বলিয়া গণ্য হয়েন, তাঁহার নিমিত্ত সকল মন্দ ইচ্ছা ও মন্দ কার্য্য পরিত্যাগ না করি—তাঁহার সহবাস সুখ লাভের নিমিত্ত আত্মসুখ বিসর্জ্জন কেন না দিই। যদি আমরা সেই সকল কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হই যাহা তাঁহার ইচ্ছানুযায়িক, তাহা হইলে তাঁহার প্রসন্নমুখ আমাদিগের প্রতি কেমন স্নিগ্ধরূপে প্রেরিত হইবে, কেমন তাঁহার সহিত আমাদের সহবাস লাভ হইবে, যে সহবাসের মর্ম্ম কোন পাপী কখনও বুঝিতে পারে না, এবং তাহা হইলে তাঁহার সিংহাসনের নিকট অগ্রবর্ত্তী হইয়া আমরা তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হইতে পারিব, এত নিকট যে আমাদের আত্মা পরমেশ্বরকে স্পর্শ করিবে। যাহারা সংসারেই বদ্ধ থাকে, তাহাদিগের সাংসারিক ভোগের যে লালসা তাহা কিছু কাল পরেই নির্ব্বাণ হইয়া যায়; কিন্তু হে জগদীশ্বর! তোমার অনুরাগ তাদৃশ নহে; ইহা যত পুরাতন হইতে থাকে, আমরা যত বৃদ্ধাবস্থাতে পদার্পণ করিতে থাকি ইহা ততই দ্বিগুণ উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করে। যে পাপ গ্রন্থি সকল গত বৎসরে আমার হৃদয়কে তোমা হইতে বিযুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার অনেককে আমার আত্মা অতিক্রম করিয়া তোমার বিন্দুমাত্র শান্তি বারি পান করিতে উন্মুখ রহিয়াছে এবং এই অমৃত বিন্দু দ্বারা তৃষ্ণার শান্তি করিয়া পুনরায় রিপুদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এই প্রকারে আমাদের মন এক এক বার সংগ্রামস্থলে আসুরিক প্রবৃত্তি সকল দমন করে এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পুরস্কারের জন্য এক এক বার তোমার নিকটে শান্তিসলিল যাচ্ঞা করে। যাহারা ভীরু স্বভাব বশতঃ রিপুদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে, যাহারা তোমার কার্য্য করিতে লোকভয়ে ভীত হয়, তাহারা তোমার সেই প্রসন্ন মূর্ত্তিকে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং ভয়ানাংভয়ং ভীষণং ভীষণানাং'

রূপে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেমোজ্জ্বল মনে ধাবমান হয়েন। তাঁহাদিগের দূরদৃষ্টি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত গমন করে। তাঁহারা বর্ত্তমান সুখেও সুখী হয়েন এবং ভবিষ্যৎ আশাতেও প্রফুল্ল থাকেন। পাপী যুবকদিগের এ প্রকার ভাবের সম্ভাবনা নাই তাহারা না সাংসারিক সুখে সুখী হইতে পারে, না ভবিষ্যৎ আশাযষ্টি অবলম্বন করিতে পারে। তাহারা অনন্তকালের পর্য্যালোচনা মাত্র করিলেই ভয়ে কম্পিত হয়। তাহারা মনে করে যে এই সকল বিষয় ভাবিতে গিয়া পাছে তাহাদিগের মন সংসার হইতে আকৃষ্ট হয়, পাছে অনন্তকালের প্রতি দৃষ্টি পাত করিতে গিয়া সাংসারিক অনেকানেক মলিন সুখ হইতে তাহাদিগকে ছিন্ন হইতে হয়। এই প্রকার তাহারা পশুর ন্যায় বর্ত্তমান সুখকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি চক্ষুরুন্মীলন করে না, সাংসারিক কোন বস্তুর প্রতি লোভ সম্বরণ করিতে পারে না এবং ইচ্ছার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে তাহা কখন অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা যৌবনের তরঙ্গ যাহাতে অতিক্রম করিতে পারি তাহার জন্য কি করিতেছি? হে পরমাত্মন! তোমার অধীনে আমাদের চিরকাল বাস ও সহায়ে আমাদের নির্ভর। তুমি আমাদিগকে ধন জন যৌবন বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সকলই প্রদান করিয়াছ। কিন্তু এ সকল প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হও নাই তুমি আমাদিগকে সুখী করিবে এই হেতু স্বয়ং আপনাকে দান করিয়াছ এবং আমাদিগকে অমৃত নামের অধিকারী করিয়াছ। তোমার এই সকল মঙ্গলভাব পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া আমাদের মন নিস্তব্ধ হইয়া যায় এবং আমাদের জিহ্বা বাক্‌শূন্য হয়। কোন্ ব্যক্তি ইহা জানিয়া সুখী থাকিতে পারে যে, যে পর্য্যন্ত আমি ইহলোকে জীবিত রহিয়াছি সেই অবধি যে সকল আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ করিয়া লইতে পারি, ইহার পরে আর কিছুই নাই। বিচার কর্ত্তা যাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন সে কি কখন কারাবাসে তদবস্থায় থাকিয়া কতক ভোগের সামগ্রী পাইলেই সুখী হইতে পারে? কখনই না। অতএব হে মঙ্গলময় তুমি যেন আমাদিগের আশা-যষ্টি হইয়া এই তমসাবৃত সংসার হইতে তোমার পথে অগ্রসর করাও যাহাতে আমরা সকলে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া সংসারারণ্যে যথাসুখ ভ্রমণ করিতে পারি।

৺ হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

# তৈল ব্যবহার।

তৈল চর্ব্বি ও ঘৃত এই তিন পদার্থ এক পর্য্যায়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ তৈলের যে তিনটি ধর্ম্ম পরে উল্লেখ করা যাইতেছে তাহা সামাণ্যতঃ তিন পদার্থেই সমভাবে আছে বলিয়া ঐ তিন পদার্থকেই এক পর্য্যায়ে ধরা যাইতেছে। যেমন এক ভালবাসা গুরু ব্যক্তিতে ভক্তি, সমানে প্রেম, কনিষ্ঠে স্নেহ; আধার ভেদে নাম ভেদ মাত্র। এক তৈল শব্দ প্রয়োগেই অপর দুই পদার্থকে বুঝিয়া লইতে হইবে। তিল বা সর্ষা প্রভৃতির ভিতর হইতে আসিলে তেল হয়, দুধের ভিতর হইতে আসিলে ঘৃত এবং মাংসের ভিতর হইতে আসিলে চর্ব্বি হয়, এই মাত্র প্রভেদ। আমার বক্তব্য বিষয়ে ধর্ম্মগত ভেদ নাই, য়াসায়নিক ভেদ থাকিতে পারে। সে তিনটি ধর্ম্ম কি? একটি ধর্ম্ম যে আলো করে, দ্বিতীয় পিচ্ছিল করে, তৃতীয় বিনাশের মুখ হইতে রক্ষা করে (অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে preserve করে)।

অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে কার্য্য নির্ব্বাহে যেরূপ অসুবিধা ঘটে তাহা সকলেই জানেন। আলোকময় হইলে জগতের কত প্রকার সুবিধা, তাহা লিখিয়া শেষ করিবার নহে। আলোক যেরূপ সুখপ্রদ ও কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদক তাহা সামান্য উপকারের বিষয় নহে।

দ্বিতীয়তঃ পিচ্ছিলকর কোন বস্তুতে মর্চ্চে ধরে না। যখন নষ্ট হইতে থাকে তখন সে বস্তু বাস্তবিক মরচে অর্থাৎ মরিতেছে। 'মর্চে' এবং মরচে এ দুয়ের কেবল যতি (accent) গত ভেদ। 'ম'র উপরে accent পড়িলে মরচে অর্থাৎ মরিতেছে বুঝায় নতুবা কলঙ্ক অর্থে গ্রহণ করে। তৈল সংযোগ করিলে মর্চে ভাগ অপসৃত করিয়া পিচ্ছিল করিয়া দেয়। এই জন্য লৌহের যত কল কব্জা এবং গাড়ির চাকা প্রভৃতিতে তৈলের ব্যবহার।

তৃতীয়তঃ, দ্রব্যকে রক্ষিত করা। এই ধর্ম্ম বশতঃ মাছ তৈলে ভাজিয়া রাখে। কোন মৃত জন্তু তৈলে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলে দীর্ঘ কাল অবিকৃত

থাকে। ফলমূলাদি তৈলে ভিজাইয়া আচার করিয়া খায়।

এখন শরীরে তৈল প্রয়োগ কিরূপ উপকারী দেখা যাক। বাল্যাবধি প্রাচীনকাল পর্য্যন্ত শরীরের যে তিনটি অবস্থা ঘটে তাহার স্থূল বিবরণ না জানিলে, প্রয়োগের উপকারিতা সুন্দর বোধগম্য হইবে না। অতএব শারীরিক সেই তিনটি অবস্থা ও তৈলের সদসদ্ভাবে যে রূপ শুভাশুভ সংঘটিত হয় তাহা লিখা যাইতেছে।

নবপ্রসূত সন্তান যে শরীর লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় তাহাতে বাহির হইতে কেহ রক্ত মাংস প্রভৃতি লেপন করিয়া বর্দ্ধিত করে না, কিন্তু তাহা খাদ্য দ্রব্যের উপযোগে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শরীরের প্রতিক্ষণে জন্ম, প্রতিক্ষণে মরণ। বাল্যাবস্থায় জন্ম মরণের জমাখরচের মধ্যে খরচ অপেক্ষা জমা বেশী দেখা যায়। ইহাতে অবধারণ হয় যে বাল্যাবস্থায় পাকযন্ত্রের (অর্থাৎ ঘানির) বল থাকায় ভুক্ত অন্ন হইতে তৈলাংশ সার উদ্ধৃত হইয়া শরীরে খরচ অপেক্ষা জমা বৃদ্ধি হইতে থাকে। কোন নির্জ্জীব বস্তুতে ঘানির ন্যায় পাকযন্ত্র না থাকায় স্বতই তাহার ক্ষতি পূরণের উপায় থাকে না। দেখা যায় খড়ম পায়ে দিলে এক বৎসরে উহার কিযদংশ ক্ষয় হইয়াছে, তাহার আর পূরণ হয় না। কিন্তু তদপেক্ষা শিশুর কোমল শরীরের নানা রূপ ব্যবহারেও ক্ষয় হয় নাই এমন নহে। ঘানি যন্ত্রের বলে সে ক্ষতি পূরণ হইয়াও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির দিকে গিয়াছে। ইহাতে সপ্রমাণ হইল বাল্যাবস্থায় খরচ অপেক্ষা জমা বেশী।

এখন তৈলের যে তিন ধর্ম্ম প্রথমে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা বালকের শরীরে কিরূপে কার্য্য করে আলোচনা করা যাক।

তৈলের প্রথম ধর্ম্ম আলো করা। বালকের শরীর দেখিবামাত্র বোধ হয় যে তৈলের প্রথম ধর্ম্ম যে আলোর স্ফূর্ত্তি, তাহা যেন বালক শরীরে চক্‌চক্ করিতেছে—চক্ষু জ্যোতিষ্মান্, শরীরে একটু টোপ খায় নাই; তৈলপূর্ণ প্রদীপ যেমন দপ্‌দপ করিয়া জ্বলে তেমনি লাবণ্য জ্যোতিতে যেন আলোকময় হইয়া রহিয়াছে।

দ্বিতীয় ধর্ম্ম পিচ্ছিল করা। যেমন কোন পিচ্ছিল স্থানে পা পড়িলে পা স্থির থাকে না, সেইরূপ ছেলেরা সর্ব্বদাই অস্থির। শিশুরা যে সময় চলিতে



পারে না তখনও তাহাদের সর্ব্বদা অঙ্গচালন হয়—তাহা তৈলের পিচ্ছিলতা ধর্ম্মের দরুন।

তৃতীয় ধর্ম্ম নাশের মুখ হইতে রক্ষা করা। বাল্যবস্থায় স্বভাবত বৃদ্ধির দিকে যত টান থাকে ক্ষয়ের দিকে তত নহে।

যৌবনাবস্থায় শরীরের ভাব কিরূপ থাকে দেখা যাক:—

এ অবস্থায় কিছু কাল জমাখরচ সমান চলে। যেমন জোয়ার ভাটার মধ্যে থম্‌থমার অবস্থা। এ সময় ঘানির বল সমভাবে থাকায় ক্ষয় বৃদ্ধি সমভাবেই থাকে।

এখন পূর্ব্ব সঞ্চিত তৈল যাহা কাঁড়ায় ছিল তাহা যদি অন্যায় রূপে অপচয় না করা যায়—বকচরের তৈল কিছু অপচয় হউক যদি জলকরের তৈল অপচয় না করে—তবে যৌবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত তৈলের তিন ধর্ম্মই তাহাদের প্রবল থাকিতে পারে। আর যদি আমোদের লোভে জলকরের তৈল পর্য্যন্ত অপচয় করিয়া ফেলে তবে অকালে প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। সাবধান যেন তৈল বৃথা ব্যয়িত না হয়।

যৌবনের প্রারম্ভে যখন তৈলের পিচ্ছিলতা ধর্ম্মে যুবারা ইতস্ততঃ উন্মত্তের ন্যায় বেড়াইতে থাকে তখন লোকে ব্যঙ্গ করিয়া বলে "হুঁ! ইহার বড় যে তেল হয়েছে।" আবার কোন কার্য্য আটক পড়িলে তৈলের পিচ্ছিলতা ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া অনেক চতুর ব্যক্তি কার্য্য উদ্ধারের জন্য পাদদেশে অথবা শিরোদেশে তৈল দানের ব্যবস্থা করেন।

এখন বৃদ্ধাবস্থা আসিল; ঘানির আর তেমন বল নাই—ভুক্ত বস্তুর তৈলাংশ পৃথক করিতে পারে না। এই জন্য তৈল ও খইল একত্র নির্গত হইয়া যায়। অজীর্ণ দোষ সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বাভ্যাস বশত আহারের পরিমাণের বিচার থাকে না। কি পরিমাণ খন্দ ঘানি বহন করিতে পারে তাহার বিচার না থাকায় সর্ব্বদাই ঘানির পীড়া উপস্থিত হয়। যদি পূর্ব্ব সঞ্চিত তৈল অন্যায় রূপ অপচিত না হইয়া থাকে তবে এসময় কিছু কাল প্রদীপ জ্বলিতে পারে। তৈলক্ষয় এ সময় কিরূপ অবস্থা ঘটিবে তাহা ভাবিলে শোকের উদ্দীপন হয়। এখন আর সেরূপজ্যোতি নাই, আলোক মিট্‌মিট করিতেছে, শরীরের লাবণ্য গিয়া এখন ক্রমেই "বন্য" ভাব উপস্থিত

হইতেছে; চক্ষু অন্ধকার হইয়া আসিতেছে,ইন্দ্রিয় স্ফূর্ত্তি রহিত।

দ্বিতীয়, পিচ্ছিলতার অভাবে বালিশের মতন এক স্থানেই পড়িয়া আছে,—উদ্যম বিহীন।

তৃতীয়, ক্রমেই নাশের মুখে গিয়া পড়িতেছে; রক্ষার ভাব সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে।

বঙ্গদেশে এত তৈলের ব্যবহার কেন সে বিষয় একটু অনুসন্ধান করা উচিত।

বঙ্গদেশের লোক বড় ঝোলপ্রিয়। যেমন ঝোল দুধ, ঘোলের ঝোল, মাছের ঝোল ইত্যাদি। এই জন্য ইহাদের শরীর বড় ঝোলা। যাহা কিছু ঝুলিবার তাহা অল্পবয়সেই ঝুলিয়া যায়। শরীরের বাঁধনী ঢিলা হইয়া পড়ে। বাঙ্গালীর খাদ্য দ্রব্য হইতে ঘানি যন্ত্র দ্বারা যে পরিমাণ তৈল সংগৃহীত হয় তাহাতে পর্য্যাপ্ত রূপে জীবনের তৈল সংগ্রহ হয় না। এই জন্য বাহির হইতে তৈল মর্দ্দনের প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে। এই হেতু বঙ্গদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রায় সমস্ত রোগেই ভিন্ন ভিন্ন পাকতৈল ব্যবহারের বিধি আছে। বোধ হয় তৈল মর্দ্দনে দ্বিবিধ হিত সাধন। প্রথমতঃ আমাদের বঙ্গদেশে সেঁতসেঁতে গ্রীষ্ম এজন্য এখানে বহু প্রকার কীট উৎপন্ন হইয়া নানা রূপে শরীরের অনিষ্ট সাধন করে। অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে দেখা যায় আমাদের লোমকূপ সাক্ষাৎ কূপস্বরূপ। অদৃষ্টগোচর কীটাণু সকল সেই কূপদ্বারা শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বহু প্রকার রোগের উৎপাদন করে। সংসারে দৃষ্ট পদার্থ অপেক্ষা অদৃষ্টের ভাগই অধিক। যখন কোন কার্য্যের কারণের অনুসন্ধান হয় তখন কারণটা দৃষ্টি গোচরে থাকিলে ভবিষ্যতের নিমিত্ত সাবধান হই, কিন্তু সে কারণ যদি অদৃষ্ট ভাগে থাকে তবে অদৃষ্টের উপর বরাত দিয়া প্রতিকার চেষ্টায় বিমুখ হই। লোকে অদৃষ্টকে কপাল বলিয়া থাকে, কিন্তু কপালে যে কিছু লেখা থাকে এমন বোধ হয় না। দৃষ্টিগোচরে কারণ পাইলেই লোকের তৃপ্তি নচেৎ অদৃষ্টের উপর বরাত।

অতএব অদৃষ্ট কীটাণু শরীরের ভিতর লোমকূপ দ্বারা প্রবেশ করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে তৈল মর্দ্দন দ্বারা লোমকূপ রুদ্ধ করিয়া রাখা প্রচলিত। দ্বিতীয়, বঙ্গদেশ গ্রীষ্ম প্রধান; যদি বাহিরের তাপ শরীরে



প্রবেশ করিতে পায় তবে অত্যন্ত তাপ বৃদ্ধি হইয়া শরীরের পীড়া জন্মিতে পারে এবং শরীরের ভিতর হইতে তাপ বহির্গত হইয়া স্বভাবিক তাপের লাঘব করিতে পারে। এই উভয় দোষ নিবারণের নিমিত্ত তৈলমর্দ্দন তৈলের আবরণ আমাদের দেশে এত প্রচলিত।

৺হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

---

# পুরাতন বর্ষের বিদায় গ্রহণ।

—:++:—

## (স্বপ্ন)।

চৈত্রের সংক্রান্তি তিথি নিরব নিশীথে,
একাকী বসিয়া আছি শয়ন মন্দিরে,
একটি মানব এবে নাহি চলে পথে,
সোহাগিনী শশী ক্রমে নামিতেছে ধীরে।
কালের ভীষণ চক্র দ্রুত আবর্ত্তনে,
ঘূর্ণিত হইল পুনঃ আর এক বার;
নিষ্পেষিল তার সনে কত প্রাণীগণে,
কৃতান্ত-জানেন শুধু সংখ্যা কত তার।
এই মত কত চিন্তা আসিল মানসে,
তন্দ্রাবেশে হ'ল তনু আলসে মগন,
নিদ্রার-কোমল-ক্রোড়ে শুইলাম শেষে,
দেখিনু তখন এক অদ্ভুৎ স্বপন।

তখন দেখিনু এক উচ্চগিরি চূড়ে,
রয়েছি একেলা ব'সে সশঙ্কিত প্রাণ ;
চারিদিক আচ্ছাদিত আঁধার তিমিরে
নিভৃত গহন মাঝে নাহি কোন জন।
আকাশে রয়েছে চাঁদ ক্ষীণ অংশু লয়ে,
পড়িয়াছে স্থানে স্থানে ম্লান জ্যোতি তার ;
ভাবিতেছি অনুক্ষণ আকুল হৃদয়ে,
শুনিনু নিকটে যেন দীর্ঘ শ্বাস কার।
চাহিয়া দেখিনু আমি অতি সচকিতে,
কোন প্রাণী কি দুঃখেতে কাঁদিছে এখানে ;
রয়েছে মানব এক পারিনু বুঝিতে,
যাইনু নিকটে আমি শঙ্কিত পরাণে।
দেখিনু অভাগা কোন বয়সে প্রাচীন,
মাথায় মুকুট আর অঙ্গে রাজ বেশ,
নয়নে নাহিক তেজ দেহ অতি ক্ষীণ,
করেতে কপোলদেশ, শিরে জটাকেশ।
কেন হেন নিশাকালে এ ঘোর বিপিনে,
রহিয়াছে একা কেন এখানে বসিয়ে,
কেন এ বিষাদ ছায়া পড়েছে আননে ;
এই মত কত প্রশ্ন উদিল হৃদয়ে।
তখন শুনিনু যেন উর্দ্ধদিক হ'তে,
বাজিছে স্বর্গের বীণা বড়ই সুতানে ;
দেব শিশু সম এক সুরপুর হ'তে,
উরিছে অবনি পরে দেখিনু নয়নে।
চারিদিকে ছোট বড় শত শত পরী,
জ্যোতির্ম্ময় শিশুসনে ল'য়ে বীণা বাঁশী,
আসিছে ধরায় গগন উজ্জল করি।
সকল আননে যেন আনন্দের হাসি।



যতই নিকটে শিশু আসিতে লাগিল,
ধীরে ধীরে চাঁদ খানি হ'ল অস্তমিত ;
অযুক্ত বীণার তানে কানন পুরিল,
রূপের প্রভায় বন হ'ল আলোকিত।

আসিল ক্রমেতে শিশু নৃপতি সম্মুখে,
প্রণমিল জোড় করে অবনত শিরে।
তুলিল বদন রাজা উচ্ছসিত দুখে
কহিতে লাগিল ধীরে স্নেহ মাখা স্বরে।
" আসিয়াছ বৎস তুমি লহ আশীর্ব্বাদ,
তোমার বিলম্ব দেখে এসেছি এখানে,
পারিনা কহিতে কথা তনু অবসাদ,
জীবন প্রদীপ বুঝি নিবে তৈল বিনে।
সহিয়াছি বহু ক্লেশ মম রাজ্য কালে,
পারিনি তুষিতে আমি ভুলোকবাসিরে ;
দহিছে হৃদয় সদা সেই দুঃখানলে,
বিঁধিছে দুঃখের শেল অন্তর ভিতরে।
আমার রাজত্ব কালে কত শত দেশ
দুর্ভিক্ষ করাল গ্রাসে হ'য়েছে পতিত,
তাদের ক্লেশের দেখি নাহি কোন শেষ ;
হইল শশ্মানে বুঝি এবে পরিণত।
সমর অনল মহা জ্বলেছে দক্ষিণে,
প্লাবিছে পবিত্র ধরা শোণিত ধারায়,
এ অনল শিখা কবে নিবিবে কে জানে,
ভাবিলে এ সব কথা বিদরে হৃদয়।
ভীষণ বন্যায় আর ভীম প্রভঞ্জনে,
করিয়াছে ছারখার কত রম্য স্থান,

স্মরিয়ে সে দৃশ্যগুলি ব্যথা পাই মনে ;
এ দুঃখের কাহিনীর নাহি অবসান।
এক বর্ষ পূর্ব্বে বৎস এমনি সময়ে,
তব সম শিশু বেশে সহাস্য বদনে,
এসেছিনু ধরাতলে কত আশা ল'য়ে ;
অতি ক্ষীণ ছায়া সম পড়িতেছে মনে।
কিন্তু বৎস আজি মম শেষ দিবসেতে,
নাহিক সে আশা সুখ, শুধু বেদনায়
রয়েছে মগন আজি হৃদি বিষাদেতে ;
করিও প্রত্যয় এই বৃদ্ধের কথায়।
পাইয়াছ পুণ্যবলে বিশ্বরাজ্য ভার,
ধর রাজদণ্ড এবে সুকোমল করে,
সতত রাখিও মতি চরণেতে তাঁর
সর্ব্বদা চিন্তিত যিনি বিশ্বজন তরে।
আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরসুখী হও,
পালহ জগৎজনে সযতনে অতি,
নর অদৃষ্ট গৃহের এই চাবি লও,
দেবতা তোমাকে দিল সুবিমল মতি।"
এতেক বলিয়া নৃপ নিস্তব্ধ হইল
প্রভাত অরুণ সম সেই দেব সুত,
সুকোমল স্বরে তবে বলিতে লাগিল।
" শতবার ও চরণে করি প্রণিপাত ;
দেব, যেন তব আশীর্ব্বাদে এই মত,
বর্ষপরে যেতে পারি হাসি মুখে ফিরে ;
কি আছে ললাটে লেখা জানেন বিধাত,
সুখ দুঃখ মিশে আছে ভবিষ্য আঁধারে।
পিত ! পারি যেন তব পদাঙ্ক দেখিয়া,
পুণ্যের পথে সদা করিতে বিচরণ ;



শ্রীহরির পাদপদ্ম স্মরণে রাখিয়া,
কাটাইতে পারি যেন সুখে আজীবন।
দুর্ভিক্ষ প্রকোপ আর সমর অনল
আমার শাসন কালে যায় যেন দূরে ;
হৃদয়েতে থাকে যেন উপযুক্ত বল,
রোগ, শোক, ক্লেশ যেন যায় রাজ্য ছেড়ে।
শান্তি সুধানীরে যেন ভাসে জীবগণ,
আনন্দ কল্লোলে যেন পুরে সব দেশ,
তাদের সুখেতে হয় চিত্ত নিমগন।"
তাহার সকল কথা না হইতে শেষ,
অকস্মাৎ দিয়া বাধা ভূপতি তখন
কহিলা শিশুরে। " নাহিক সময় আর,
দেখ উঠিছে ভাস্কর লোহিত বরণ ;
(বৎস) আজি হ'তে মম রাজ্য হইল তোমার।"
আসিল তখন এক বিচিত্র বিমান,
ল'য়ে গেল নৃপতিরে স্বরগ ধামেতে ;
উজলিল নভস্থল রবির কিরণ,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর সেই আলোকেতে।
মেলিয়া নয়ন যবে দেখিনু, তখন
মনেতে আসিল দীর্ঘ স্বপনের কথা ;
রয়েছে সত্যই দেখি আকাশে তপন,
কি জানি প্রাণেতে কেন লাগিল ব্যথা।

শ্রীহরিহর শেঠ।

# গঙ্গাদেব।

—:০:—

## জয়পুরী গল্প।

মীনাজাতি জয়পুরের আদিম নিবাসী। ইহারা পরাক্রমে ও সাহসিকতায় রাজপুতদিগের অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে। পূর্ব্বে কছবাহ রাজাদিগের সহিত ইহাদিগের গুরুতর সংঘর্ষণ হইত। জয়পুর রাজ্য পূর্ব্বে মীনাদিগেরই অধিকার ভুক্ত ছিল। অদ্যাপিও মীনাজাতিরা সংখ্যায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক। মীনাজাতি সুচতুর বলিয়া পরিগণিত। তাহা আমাদের এই গল্প পাঠেও পাঠক বুঝিতে পারিবেন। "গঙ্গাদেব" আষাঢ়ে ধরণের গল্প হইলেও ইহা হইতে মীনাদিগের জাতিগত চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়

গঙ্গাদেব নামক একটী ষোড়শবর্ষীয় পিতৃহীন মীনা বালক ছিল; কিন্তু তাহার চরিত্র নীচ মীনাজাতিদিগের যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপ ছিল। একদিন প্রতিবেশীদিগের মধ্যে তাহার কোন সঙ্গী তাহাকে বলিল—"ভাই আমি আজ শ্বশুর বাড়ী যাব।" সে তাহা শুনিয়া তাহার মার নিকট গিয়া বলিল—"মা, আমার এক সঙ্গী শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে, আমিও শ্বশুর বাড়ী যাব, আমায় একটী টাকা দাও।" তাহার মাতা কহিল—"বাছা, তোমার তো এখনও বিয়ে হয়নি, শ্বশুর বাড়ী যাবার কথা কেন বলছ?" ছেলেটি বলিতে লাগিল—"মা আমি শ্বশুর বাড়ী যাব, আমায় একটা টাকা দাও।" অনেক পেড়াপীড়ি করিয়া সে তাহার মার নিকট হইতে একটি টাকা লইয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইল। পরদিন এক গ্রামে গিয়া পৌঁছিল। পরিশ্রান্ত হইয়া একটা পাতকূয়া হইতে জলপান করিয়া, সেইখানেই একটু বিশ্রাম করিতে লাগিল। এমন সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক জল লইতে ঐ পাতকূয়ার নিকট আসিল। তাহারা গঙ্গাদেবকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—"এই ছেলেটী আমাদের পণ্ডিতজীর জামায়ের মতন



ঠিক দেখ্‌তে, না ভাই? আহা, বিবাহের পর হইতে আজ আট বৎসর জামাইটীর কোন খোঁজ নাই।" গঙ্গাদেব কাণ খাড়া করিয়া এই সব কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল—"তোমরা ঠিক ধরেছ গো, আমি পণ্ডিতজীরই জামাই। বাড়ীতে মার ভারী ব্যামো, তাই বৌকে তাড়াতাড়ি নিতে এসেছি। ঘোঁড়ায় চড়িয়া আসিতে ছিলাম, পথে সর্দ্দি গর্ম্মি হইয়া ঘোঁড়াটী মারা গেছে। তোমরা শীঘ্র গিয়া তাঁহাদের খবর দাও।" স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি পণ্ডিতজীর বাড়ী গিয়া বলিল—"মাঠাক্‌রুণ, মাঠাক্‌রুণ, বক্সিস আনুন, তোমার জামায়ের সন্ধান এনেছি। তোমার বেয়ানের ভারী ব্যামো, তাই তোমার জামাই তাড়াতাড়ি বৌকে নিতে আস্‌ছেন। তিনি ঘোঁড়ায় চড়ে আস্‌ছিলেন, কিন্তু ঘোঁড়াটী পথে সর্দ্দি গর্ম্মিতে মারা গেছে।" অনেক দিনের পর জামাই ঘরে আসিতেছে শুনিয়া বাড়ীতে খুব আহ্লাদের ধূমধাম পড়িয়া গেল। গঙ্গাদেব আসিবামাত্র তাহার সম্মুখে মঙ্গলঘট স্থাপিত হইল। সে তাহার মার নিকট হইতে যে টাকাটি লইয়া আসিয়াছিল, সেইটি ঘটের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। বাড়ীর দাসদাসীরা এই দেখিয়া তাহাকে ধনসম্পন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। আহারান্তে সে তাহার "শ্বাশুড়ীকে" বলিল—"মা আমি অর্থের জন্য এতদিন দেশ বিদেশে ঘুরিতেছিলাম। কিছু অর্থ না করিয়া বাড়ী ফিরিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া, এতদিন আপনাদের সহিত সাক্ষাতও করি নাই এবং কোন খরবও দিই নাই। বাড়ীতে আসিয়া দেখি মা শয্যাগত, তাই আমি তাড়াতাড়ি আজকেই "বউ"কে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। তাহার "শ্বাশুড়ী" বলিলেন—"তোমার 'শ্বশুর' গ্রামান্তরে গিয়াছেন। অনেক দিনের পর বাবা এসেছ, তাঁহার সঙ্গে দেখা করে গেলে তিনি অত্যন্ত খুসি হবেন।" মীনা যুবক বলিয়া উঠিল—"আমি সন্ধান লইয়া প্রথম তাঁহার নিকটেই গিয়াছিলাম, সেইজন্য আমার ঘোড়াটি পরিশ্রান্ত হইয়া সর্দ্দি গর্ম্মিতে মারা গিয়াছে। তিনি বলিলেন "আট বৎসরের পর শ্বশুর বাড়ীতে বউ পাঠাতে কে আপত্তি করিবে? বিপদের সময় যদি না পাঠাব তো কখন্ পাঠাব? তিনি কিছু কাজে ব্যস্ত আছেন, নতুবা আমার সঙ্গে আসিতেন।" তাহার "শ্বাশুড়ী" তখন বলিলেন—"তবে তুমি "বউ"কে নিয়ে যেতে পার, কিন্তু গাড়োয়ানের পীড়া হইয়াছে।" গঙ্গাদেব বলিল—"আমাকে মা এখুনি যেতে হবে, আমি কোন রকমে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে

যাব। বিপদের সময় সবই কর্‌তে হয়।" অগত্যা তাহার "শ্বাশুড়ী" টাকা কড়ি ও কাপড় প্রভৃতি সঙ্গে দিয়া মেয়েকে তাহার সহিত পাঠাইয়া দিলেন।

গঙ্গাদেব ও পণ্ডিতজীর জামাতার মুখের চেহারায় অধিক প্রভেদ ছিল না, তাহা ছাড়া বিবাহের পর আট বৎসর জামাইএর দেখা শুনা নাই, সুতরাং পণ্ডিতজীর স্ত্রী ও কন্যা গঙ্গাদেবকে পরপুরুষ বলিয়া জানিতে পারে নাই। "জামাই" কন্যা লইয়া বিদায় হইবার ঘণ্টাকতক পরে পণ্ডিতজী বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই কিছু-ক্ষণ হোলো তোমার জামাই এসে মেয়েকে নিয়ে গেছে। আমি বল্লুম দুদিন থাক, ওঁর সঙ্গে দেখা করে যেও, তুমি মেয়ে নিয়ে যেতে বলেছ তাই পাঠালুম। বেয়ানের শুন্‌লুম ভারী ব্যামো।" পণ্ডিতজী এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"সর্ব্বনাশ হয়েছে আমি কাহাকেও মেয়ে নিয়ে যেতে বলিনি এবং জামাইএর সঙ্গে আমার দেখাও হয় নি। কোন দুষ্টু লোক এ কাজ করেছে।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ এক দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়িয়া কন্যার উদ্ধারে চলিলেন। কিছুদূর দ্রুতগতিতে আসিয়া ঘোড়াটি ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং তাহার লাগাম ছিঁড়িয়া গেল। তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া লাগাম বাঁধিতে লাগিলেন। গঙ্গাদেবও সেই সময় রাস্তার মোড় ফিরিতে ছিল। দূর থেকে বয়্‌লে গাড়ির ছিদ্র হইতে পণ্ডিতজীর কন্যা পিতাকে দেখিতে পাইয়া-ছিলেন। তিনি গঙ্গাদেবকে বলিলেন—"ওগো, বাবার মতন দূরেতে কাকে দেখছি। বেশ আমাদের বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।" মীনা যুবক তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া বলিল—"এতদিন বাপের বাড়ি থেকে বাপকে দেখে আশ মেটেনি? বাড়িতে বিপদ এই কি সাক্ষাৎ কর্‌বার সময়?" সেই রাস্তার মোড়ে একটি কৃষক লাঙ্গল দিতেছিল। গঙ্গাদেব তাহার "স্ত্রীকে" বলিল—"তুমি জোরে এই রাস্তা দিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া চল। আমি এই লোকটির কাছ থেকে এক ছিলিম তামাক খেয়ে আস্‌ছি।" গাড়ি হইতে নামিয়ে সে কৃষকের নিকট গিয়া বলিল—"ভাই আমি তোর লাঙ্গল চালাচ্ছি, তুই একটু আগুন আন্। আমি এই তামাক দিচ্ছি। একবার তামাক খাওয়া ভাই।" কৃষকটিরও তামাক খাইবার ইচ্ছা ছিল। সে আগুন আনিতে গেল ও মীনা যুবক তাহার লাঙ্গল চালাইতে লাগিল। এমন



সময় পণ্ডিতজী ঘোড়ায় করিয়া ঐ রাস্তার মোড়ে আসিয়া গঙ্গাদেবকে লাঙ্গল দিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে কৃষক, তুমি কি এই রাস্তা দিয়ে কোন গাড়ি যেতে দেখেছ? মীনা বলিল—"গাড়ি! কিসের গাড়ি!" তিনি তাহাকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। মীনা উত্তর করিল—"হ্যাঁ কিছু-ক্ষণ হইল একখানা গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে (যে রাস্তায় গাড়ি যাইতেছিল তাহার বিপরীত দিক্ দেখাইয়া) যেতে দেখেছি। আমি আপনার গাড়ি এনে হাজির কর্‌ছি, আমায় কি বক্সিস দেবেন বলুন।" তিনি তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। গঙ্গাদেব বলিল—"আপনি আমার লাঙ্গলটা দেখেন তো, আমি এখুনি আপনার ঘোড়ায় চড়ে গাড়িটা খুঁজে আন্‌ছি।" পণ্ডিতজী তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। মীনা ঘোড়া লইয়া পলায়ন করিল। অনতিবিলম্বে কৃষকটী আগুন লইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার ঘোড়া কোথায়?" কৃষক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—"ঘোড়া! সে কি!" তখন পণ্ডিতজী কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। বুঝিলেন কোন শঠ ব্যক্তি তাঁহাকে এইরূপে প্রবঞ্চনা করিয়াছে।

এদিকে মীনা যুবক ঘোড়াটী তাহার গাড়ির পশ্চাতে বাঁধিয়া, গাড়ি হাঁকাইয়া চলিতে লাগিল। পথের মধ্যে একটা ঠগীদের গ্রাম ছিল। সাত-জন ঠগী সস্ত্রীক তথায় বাস করিত। গঙ্গাদেবের সেই গ্রাম ছাড়া অন্যদিক দিয়া যাইবার কোন পথ ছিল না। গ্রামের বাহির দিয়া কেহ গেলে ঠকেরা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া লুটপাট করিয়া লইত। আর যদি কেহ গ্রামের ভিতর দিয়া যাইত, তাহা হইলে কুসংস্কার বশতঃ ঠকেরা তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা না করিয়া বাড়িতে লইয়া গিয়া আতিথ্যের ভান করিয়া খাদ্যের সহিত বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিত। গঙ্গাদেব কপাল ঠুকিয়া গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে মনস্থ করিল। সে তাহাদিগকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল—"মামা ভাল আছতো?" ঠকেরা ভাবিল—"এ ব্যাটা ভারি চালাক। প্রাণভয়ে আমাদিগকে মামা বলিতেছে। যাহা হউক যখন মামা বলিয়াছে, একে কোন ছুতা বাহির করিয়া মারিতে হইবেক।" তাহারা গঙ্গাদেবকে তাহাদিগের ঘরে রাত্রি যাপন করিতে আহ্বান করিল। মীনা

তাহাই করিতে বাধ্য হইল। ঠকদিগের স্ত্রীরা আসিয়া মীনার "স্ত্রী"কে অন্দর মহলের মধ্যে লইয়া গেল এবং ঠকেরা মীনাকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। আহারান্তে ঠকেরা মীনাকে এক সুন্দর ও সুসজ্জিত গৃহের মধ্যে লইয়া গেল এবং এক ঘটি ক্ষার মিশ্রিত জল তাহার হস্তে দিয়া বলিল—"বাপু আমরা ঠক্, তুমি আমাদিগকে মামা বলিয়াছ, সেইজন্য তোমাকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা না মারিয়া তোমার প্রতি এই কৃপা করিতেছি যে এই ক্ষারগোলা জল * তোমাকে খাইতে হইবেক। যদি তুমি এই ক্ষারগোলা খাইয়াও রাত্রি মধ্যে ঘর বিন্দুমাত্র অপরিস্কার না কর; তাহা হইলে প্রাতঃকালে তোমাকে খালাস দিব। আর যদি অপরিস্কার কর তাহা হইলে তোমাকে মারিয়া ফেলিয়া সমস্ত লইব। এই বলিয়া তাহারা মীনা যুবককে ঐ গৃহের মধ্যে তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে পর গঙ্গাদেব একটী তালাবন্ধ চোরকুঠুরী দেখিতে পাইল। গঙ্গাদেবের নিকটে যে চাবির গোছা ছিল তাহার একটী দিয়া চোর কুঠুরী খুলিল। কুঠুরীর মধ্যে দেখিল যে একটী পাত্রে দই রহিয়াছে। সে তাহা খাইয়া পরে গলায় অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া ঐ পাত্রে উদ্গীরণ (বমি) করিতে লাগিল। সে যাহা ক্ষার পান করিয়াছিল তাহাও উদ্গীরিত হইল। অবশেষে পাত্রটী চোর কুঠুরীর মধ্যে রাখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তালাবন্ধ করিয়া দিল। প্রাতঃকালে ঠকেরা আসিয়া "মীনা নিশ্চয় ঘর অপরিস্কার করিয়াছে" ভাবিয়া আহ্লাদে দরজা খুলিল; কিন্তু ঘর গত রাত্রের মতন সুসজ্জিত ও পরিস্কার দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তখন অগত্যা তাহারা কথার অন্যথা না করিয়া "সস্ত্রীক" মীনাকে গাড়ি প্রভৃতির সহিত ছাড়িয়া দিল।

মীনা যুবক এই প্রকারে আশাতীত অব্যাহতি পাইয়া পথে যাইতে যাইতে দুইটি এক রকমের খরগোষ ক্রয় করিয়া লইয়া গেল। পরে গৃহে পৌছিয়াই মার নিকট গিয়া সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিল। তাহার মা তাহার স্কন্ধে ভর দিয়া গাড়ির নিকট "বৌকে" লইতে গেল। গাড়ির কাছে গিয়া কন্যাকে বলিল—"মা এস, অনেক দিনের পর তোমাদের উভয়কে দেখে

* ক্ষারগোলা জল জোলাপের কাজ করে।



মনে সুখ হোলো। আমি ভাব্‌ছিলাম তোমাদের কাহারও সঙ্গে দেখা হবে না; আমার ভারী অসুখ হয়েছিল বাঁচবার আশা ছিল না। ভগবানের কৃপায় কিছুদিন হইল উঠিয়া বসিতে পারিয়াছি।" এই বলিয়া সে গাড়ি হইতে "বৌকে" নামাইয়া লইয়া গেল। পরে গঙ্গাদেব একটী খরগোষ সঙ্গে লইয়া তাহার মাকে এই বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল—"যদি কোন লোক আমাকে খুঁজিতে আসে, তাহা হইলে বলিও, সে অত্যন্ত সিদ্ধি খোর—বাড়ীতে প্রায় থাকে না—দিন্‌রাত দিলারাম বাগে সিদ্ধি খাইয়া পড়িয়া থাকে। তাহারা চলিয়ে গেলে পর, তুমি এক পরাতে করিয়া আটা মাখিতে থাকিবে। আমি এই খরগোষটী লইয়া যাইতেছি তুমি অন্যটিকে সন্মুখে বাঁধিয়া রাখিয়া দিও"

এদিকে ঠগদিগের স্ত্রীরা চোর কুঠুরি হইতে "দই" বাহির করিয়া আহারের সময় তাহাদিগের স্বামীকে খাইতে দিল। তাহারা খাইতে গিয়া ক্ষারের আস্বাদ পাইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে মীনা যুবকটী তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে। তাহারা আহার পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধভরে গঙ্গাদেবের অন্বেষণে ছুটিল। অনেক অন্বেষণের পর তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল—"গঙ্গাদেব কোথায়, গঙ্গাদেব কোথায়?" তাহার পুত্র তাহাকে যাহা বলিয়া গিয়াছিল সে তাহাই তাহাদিগকে বলিল। তাহারা দিলারাম বাগে গমন করিল। ঠগদিগকে দেখিবামাত্র গঙ্গাদেব বলিয়া উঠিল—"মামা এসেছ, মামা এসেছ, এস, এস, ভাল আছ তো?" তাহারা বলিল "তুই আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া মুক্তি পাইয়াছিস। তোকে এখনি কাটিয়া ফেলিব।" গঙ্গাদেব বলিল—"আমার জীবন মৃত্যু এখন তোমাদেরই হাতে, তবে আমার এই প্রার্থনা আমার কথাটা সব শুনে নাও মামা।" ঠকেরা বলিল "তোর আবার কি কথা আছে? তুই আমাদিগকে ঠকাইয়াছিস, তোকে এখনি মারিয়া ফেলিব।" গঙ্গাদেব উত্তরে বলিল—"মামা আমি এই খরগোষ দ্বারা তোমাদের আহারের আয়োজন করিতে মাকে বলিয়া পাঠাই, পরে আহারান্তে তোমাদিগকে সব কথা বলিয়া বলিব। তখন মারিয়া ফেলিতে হয় মারিয়া ফেলিও, বাঁচাইতে হয় বাঁচাইও।" এই বলিয়া সে খরগোষটির লেজ ধরিয়া বলিল—"খরগোষ

তুই বাড়ি গিয়া মাকে বল যে আমার সাতটী বন্ধু এসেছেন তাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত কর।” খরগোষ কথা কয় শুনিয়া ঠকেরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও কৌতুহলাক্রান্ত হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ গঙ্গাদেবকে না মারিয়া এই ব্যাপারটী পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইল। গঙ্গাদেব তাহাদিগকে লইয়া বাড়িতে ফিরিল।

এদিকে গঙ্গাদেবের মা পুত্রের কথামত অপর খরগোষটী সম্মুখে বাঁধিয়া পরাতে করিয়া আটা মাখিতে আরম্ভ করিল। ঠগেরা খরগোষটিকে বাঁধা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যন্বিত হইয়া গঙ্গাদেবকে বলিল “ভাগ্নে, খরগোষটিকে আমাদের দিতেই হবে। আমরা ডাকাতি করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় না জানা থাকাতে অনেক সময়ে বাড়িতে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত থাকে না। অতএব এই খরগোষটী পাইলে আমরা ইহাকে দিয়া বাড়ীতে ঠিক সময়ে খাবার তৈয়ারি করিতে বলিয়া পাঠাইতে পারি।” গঙ্গাদেব বলিল—“মামা, এটি আমি দিতে পারিব না। তুমি আর যাহা চাবে দিব। এটি আমি পাঁচ হাজার টাকায় কিনেছি।” ঠগেরা কহিল—“এই ছয় হাজার টাকা নাও ও খরগোষ আমাদের দাও।” সুচতুর গঙ্গাদেব ছয় হাজার টাকা লইয়া খরগোষটী তাহাদিগকে দিল। তাহারা খরগোষ লইয়া স্বগ্রামে প্রস্থান করিল। সেই রাত্রেই তাহারা এক জায়গায় ডাকাতি করিতে গেল। এবং খরগোষটিকে এই বলিয়া ছাড়িয়া দিল—“খরগোষ তুই ভাবিয়া আয় স্ত্রীর নিকট গিয়া বল যে আমরা রাত্রি একটার সময় বাড়ী ফিরিব, আমাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য যেন প্রস্তুত থাকে।” খরগোষ মুক্তি পাইয়া বনে প্রবেশ করিল। এদিকে ঠগেরা ডাকাতি করিয়া রাত্রি একটার সময় ক্ষুধায় কাতর হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। বাড়ি আসিয়া দরজা অনেক ঠেলাঠেলি করিলে পর তাহাদের স্ত্রীরা শয্যা হইতে উঠিয়া কপাট খুলিয়া দিল। তাহারা বলিল—“শীঘ্র খাবার আন।” তাহাদিগের স্ত্রীরা বলিল “খাবার এখন তো প্রস্তুত নাই।” এই কথা শুনিয়া তাহারা ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে প্রহার করিয়া বলিল—“আমরা খরগোষকে দিয়ে খাবার তৈয়ারি করিয়া রাখিতে বলে পাঠিয়েছিলাম। খরগোষকি তোমাদের বলে নি?” তাহারা উত্তর করিল—“তোমরা আমাদের নিরর্থক প্রহার করিতেছ কেন খরগোষ



আমাদের কাছে আসে নাই।” তখন ঠগেরা পরস্পর বলিতে লাগিল—“ব্যাটা, আমাদের পুনরায় প্রতারণা করিয়াছে। এবার তাহাকে নিশ্চয় মারিয়া ফেলিব।” এদিকে মীনা যুবক তাহার মার ঘরে একটী মসকে আলতা গোলা জল পুরিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিল আর তাহার মাকে বলিয়া রাখিল—“ঠগেরা আসিলে আমি তোমাকে তামাক সাজিতে বলিব, তুমি তখন বলিও, আমি কি তোর চাকর যে তামাক সাজ্‌বো। আমি তখন ক্রোধের ভান করিয়া মসকে আঘাত করিব তুমি তৎক্ষণাৎ বাপ্‌রে মলুম্‌গো বলিয়া চিৎকার করিয়া মাটিতে পড়ে যেও। তাহার পর যখন তোমায় যষ্টির দ্বারা স্পর্শ করিব তখন তুমি উঠে ফের তামাক সেজে দিও।”

ঠগেরা ক্ষুধায় কাতর ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া ভোর রাত্রে গঙ্গাদেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং বলিতে লাগিল—“গঙ্গাদেব, গঙ্গাদেব, দোর খোল্, তুই আমাদের ঠকাইয়াছিস। তোকে এখনি হত্যা করিব।” গঙ্গাদেব জিজ্ঞাসা করিল—“মামা, কোন্‌দিক্ থেকে খরগোষকে বলে পাঠিয়েছিলে?” তাহারা উত্তর করিল—“কোন্‌দিক্ থেকে আবার, মুখের দিক্ থেকে?” গঙ্গাদেব বলিল—“মামা লেজের দিক্ থেকে বল্‌তে হয়, মুখের দিক্ থেকে না।” তাহারা ভাবিল সত্যই তাহারা ভুল করিয়াছে তাহাতেই খরগোষ খবর দেয় নাই। তাহারা কহিল—“তোর ওসব কথা শুন্‌তে চাইনে আমাদের টাকা ফিরিয়ে দে।” গঙ্গাদেব দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—“মামা, টাকা ফিরিয়ে নিতে হয় নিও কিন্তু এক ছিলিম তামাক তো খাও। এই বলিয়া গঙ্গাদেব তাহার মাকে এক ছিলিম তামাক সাজিতে বলিল। তাহার মা চিৎকার করিয়া বলিল—“আমি কি তোর চাকর যে তামাক সাজ্‌বো!” ইহার উত্তরে গঙ্গাদেব ক্রোধের ভান পূর্ব্বক তাহার মার গৃহে প্রবেশ করিয়া সজোরে মসকেতে তলোয়ারের আঘাৎ করিল। তাহার মা মলুম্‌গো বলিয়া চিৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। মসকের মধ্যে যে আলতাগোলা জল ছিল তাহা গড়াইয়া ঠগদিগের পদতলে আসিয়া পড়িল। গঙ্গাদেব রক্তাবৃত হইয়া একটী যষ্টি হস্তে করিয়া সেই ঘর হইতে নির্গত হইয়া ঠগদিগকে বলিল—“মামা, আমি মাকে কাটিয়া ফেলিয়াছি, দিনের মধ্যে কতবার যে মাকে মারিয়া ফেলি তার সংখ্যা নাই আবার তাঁহাকে এই যষ্টির দ্বারা স্পর্শ করিয়া বাঁচাই। এই

প্রকারে মাকে ভয় দেখাইয়া কাজ লই।" মরা মানুষ বাঁচে ঠগেরা কখন শুনে নাই। তাহারা অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহার কথা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে বলিল—"আচ্ছা ভাগ্নে তোমার মাকে বাঁচাও দেখি।" গঙ্গাদেব গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূমিতে যষ্টি আঘাত পূর্ব্বক তাহার মাকে বলিল—"মা ওঠ, তোকে প্রাণ দিলুম, এবার তো তামাক সাজ্‌বি?" তৎক্ষণাৎ তাহার মা ভূমি হইতে উঠিয়া গা ধুইয়া তামাক সাজিয়া লইয়া আসিল। ঠকেরা এই দেখিয়া গঙ্গাদেবকে বলিল—"ভাগ্নে ছড়ি গাছটা আমাদের দিতেই হবে। আমাদের স্ত্রীরা ঠিক সময়ে খাবার তৈয়ারি করে রাখে না, তোমার মার মতন তাদের প্রতি ব্যবহার করিলে হয় তো আমরা ঠিক সময়ে খাবার পেতে পারি।" গঙ্গাদেব বলিল—"মামা এটী আমি তোমাদের দিতে পারবো না যা বলো, যা কও। অনেক করে এই অমূল্য ছড়ি গাছটী নহাজার টাকায় একটী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি।" তাহারা বলিল—"না ভাগ্নে তা হবে না, এটী আমাদের দিতেই হবে। আমরা আর এক হাজার বেশী দেব, এই দশ হাজার টাকা নাও, ছড়ি গাছটী ছাড়।" চতুর শিরোমণি গঙ্গাদেব ঈষৎ হাসিয়া টাকাগুলি লইয়া ছড়িটী তাহাদিগকে দিল। ঠগেরা ছড়ি লইয়া মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধা পিপাসায় পীড়িত হইয়া গৃহে উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে খাবার আনিতে বলিল। কিন্তু তাহাদিগের আসিবার সময় জানা না থাকাতে কোন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয় নাই। তৎক্ষণাৎ ক্ষুধানলে অন্ধ হইয়া তাহারা তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে কাটিয়া ফেলিল। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদিগের মৃত দেহকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"এখন ঠিক সময়ে খাবার তৈয়ারী রাখ্‌বি তো? তাহলে বল্ বাঁচাই? তোদের একেবারে মেরে ফেলিনি এখনি ফের বাঁচাচ্ছি।" এই বলিয়া তাহারা সজোরে পূর্ব্বোক্ত যষ্টির দ্বারা "ওঠ, ওঠ" বলিয়া মৃতদেহকে আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবন কে কবে পাইয়াছে! ঠগেরা তখন বুঝিতে পারিল যে গঙ্গাদেব তাহাদিগকে এবারও ভয়ানক ঠকাইয়াছে। তাহারা দুঃখে ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া তলোয়ার লইয়া গঙ্গাদেবের উদ্দ্যেশে বাহির হইল।

এদিকে গঙ্গাদেব একটী অতি ক্ষুদ্র দ্বার বিশিষ্ট গাঢ় অন্ধকারময় গৃহে ছুরিকা লইয়া লুক্কায়িত রহিল এবং তাহার মাকে বলিল—"মা ঠগেরা যদি



এসে জিজ্ঞাসা করে গঙ্গাদেব কোথায় তাহলে বলিও যে সে এই কুঠরির মধ্যে তোমাদের ভয়ে লুকিয়ে আছে।" সন্ধ্যার সময় ঠগেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা গঙ্গাদেবের মাকে জিজ্ঞাসা করিল—"গঙ্গাদেব কোথায়, গঙ্গাদেব কোথায়?" অনেক পেড়াপীড়ির পর গঙ্গাদেবের মা কুঠুরিটী দেখাইয়া বলিল—"সে তোমাদের ভয়ে ঐখানে লুকিয়ে আছে।" কুঠুরীর দ্বারটী অতি ক্ষুদ্র। একজন ভিন্ন দুইজন লোকের পাশাপাশি প্রবেশ করিবার যো নাই সুতরাং ঠকেরা একে একে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল। প্রথম ঠগ ঢুকিবামাত্র গঙ্গাদেব ছুরিকা দ্বারা তাহার নাক কাটিয়া ফেলিল। পাছে তাহার নাক কাটা দেখিয়া অন্য ঠকেরা গৃহের মধ্যে প্রবেশ না করে, সেই ভয়ে প্রথম ঠগ কুঠুরীর মধ্যে গিয়া অন্য ঠগদিগকে ডাকিতে লাগিল। দ্বিতীয় ঠগ প্রবেশ করিলে তাহারও অনুরূপ দশা ঘটিল। গঙ্গাদেব এইরূপে একে একে সাতজনেরই নাক কাটিয়া ফেলিল। তখন তাহারা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গঙ্গাদেবকে কষ্ট দিয়া মারিবার জন্য একটী খাটিয়াতে হস্তপদ বাঁধিয়া কূপের মধ্যে ফেলিতে লইয়া গেল। রাস্তার ধারে একটী কূপের নিকট খাটিয়াটী নামাইল। তখন গঙ্গাদেব অবসর বুঝিয়া তাহাদিগকে বলিল—"মামা, আমি তো মরেছি কিন্তু তোমরা আগে নাকটা যুড়ে নাও না কেন? নাক কাটা থাকিলে তোমাদের কেউ বিয়ে করবে না। আমি তোমাদের এক উপায় বল্‌ছি তা কর্‌লে তোমাদের কাটা নাক যোড়া লাগ্‌বে। যদি মামা যার ছানা হয় নাই এমন গরুর চোনা মাখাইয়া কাটা নাক যোড়া লাগাও তাহা হইলে তোমাদের নাক যোড়া লাগিবে। আমাকে তো হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়াছ। আমার পালাবার তো যোই নাই। যদি নাক না যোড়া লাগে তাহা হইলে আমার বুকে পাথর চাপাইয়া কষ্ট দিয়া কূয়াতে নিক্ষেপ করো।" ঠগেরা ভাবিল—"একে তো মারিয়াই ফেলিব, তবে মারিবার পূর্ব্বে নাকটা যদি যোড়া দিয়ে নিতে পারি, তো কি মন্দ।" তাহারা অন্ধকারে গঙ্গাদেবকে সেই অবস্থায় রাখিয়া তাহাদিগের কাটা নাক অন্বেষন করিতে গেল। পরে কাটা নাক লইয়া গিয়া গঙ্গাদেবের কথা মত যাহার বাছুর হয় নাই এমন গরু খুঁজিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কাটা নাকে চোনা দিয়া যোড়া লাগাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু যোড়া লাগিল না।

প্রথমে তাহারা ভাবিল—"একজনের নাক অন্যের নাকে লাগাইবার দরুন যোড়া লাগিতেছে না।" অনেক কষ্টে তাহারা তাহাদিগের নাক বাছিয়া লইল, কিন্তু তবুও যোড়া লাগিল না। এবার তাহারা ভাবিল—"বোধ হয় গরুটীর বাছুর আছে সেইজন্য নাক যোড়া লাগিতেছে না।" এই প্রকারে এক গাভীর পর আর এক গাভীর চোনা লইয়া নাক যুড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নাক যোড়া না লাগিয়া চোনার স্পর্শে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল। তখন যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ঠগেরা গঙ্গাদেবকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবেই স্থির করিল।

ইতিমধ্যে এক সওদাগর পঞ্চাশটী সারিবদ্ধ উষ্ট্রের পৃষ্ঠে মাল হইয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। সে গঙ্গাদেবকে সেইরূপ হস্তপদ রুজ্জু বদ্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার এ দশা কে করিয়াছে?" গঙ্গাদেব তখনি উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইয়া বলিল—এক রাজকুমারী আমাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়াছেন কিন্তু আমি গরীব লোক হইয়া কি প্রকারে রাজকুমারীকে বিবাহ করি? তাই আমার তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু রাজকুমারী আমাকে জোর করিয়া বিবাহ করিবেন বলিয়া আমাকে এই প্রকারে বাঁধিয়া রাখিয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য সখীদের সহিত বাড়ী গিয়াছেন।" তাহার এই কথা শুনিয়া বণিক বলিল—"ওহে তুমি যদি রাজকুমারীকে বিবাহ করিতে না ইচ্ছা কর, আমার সহিত তাঁহার বিবাহ করাইয়া দিতে পার? আমি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।" গঙ্গাদেব বলিল—"আপনি যদি আমার মতন এই খাটিয়াতে শুইয়া থাকিতে পারেন তাহা হইলে রাজকুমারী আমাকে ভাবিয়া আপনাকে বিবাহ করিতে পারেন। আজ রাত্রেই কিছুক্ষণ পরে বিবাহ হইবে।" সওদাগর তাহাতেই স্বীকৃত হইল। তখন তিনি উষ্ট্র হইতে নামিয়া গঙ্গাদেবের হস্তপদের বন্ধন খুলিয়া দিলেন। এবং আপনি ঐ খাটিয়াতে শুইয়া গঙ্গাদেবকে তাঁহার হস্তপদ বাঁধিয়া দিতে বলিলেন। গঙ্গাদেব মহাহ্লাদে তাঁহাকে খাটিয়াতে বাঁধিয়া, তাঁহার উষ্ট্রে চড়িয়া মাল-সমেত পঞ্চাশটী সারিবদ্ধ উষ্ট্র হাঁকাইয়া লইয়া স্বগৃহে ফিরিল।

এদিকে ঠগেরা আসিয়া অন্ধকারে সেই বণিককে গঙ্গাদেব ভাবিয়া খাটিয়া উত্তোলন করিল। সওদাগর ভাবিল রাজকুমারীর লোক তাঁহাকে লইয়া



যাইতেছে। বলা বাহুল্য ঠগেরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া পাতকূয়াতে ফেলিল এবং তৎসঙ্গে বড় বড় পাথরও নিক্ষেপ করিল। পরে তাহারা গঙ্গাদেবের গৃহ লুট করিতে চলিল। দরজার কাছে যাইবামাত্র গঙ্গাদেব চিৎকার করিয়া উঠিল—"মামা এসেছ, মামা এসেছ, এস,এস।" তাহারা দ্বারদেশে মাল-শুদ্ধ পঞ্চাশটী উষ্ট্র ও গঙ্গাদেবকে দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইল। গঙ্গাদেব বলিল—"মামা তোমরা আমার মহোপকার করিয়াছ। ভাগ্যিস্ তোমরা আমাকে কূয়াতে নিক্ষেপ করিয়াছিলে তাতেই আমি এত উঠ্ ও জিনিষ পত্র প্রভৃতি পাইয়াছি। পাতকূয়ার ভিতরে এক দেবতা আছেন, সেখানে যে প্রবেশ করে তাহাকেই তিনি অনেক ধন দৌলৎ দেন। আমাকে হাতি ও আর আর অনেক ধন দিচ্ছিলেন কিন্তু আমি আন্‌তে পারলুম না।" এই কথা শুনিয়া ঠগেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—"ভাই আমরা বৃথা ডাকাতি করে কেন মরি, পাতকূয়ার ভিতর হইতে যদি ইচ্ছামত ধন পাই তো কি মন্দ?" তাহারা গঙ্গাদেবকে সঙ্গে করিয়া সেই পাতকূয়ার নিকট গেল এবং ধন প্রাপ্তির আশায় একে একে কূয়াতে লাফাইয়া পড়িল। গঙ্গাদেব বড় বড় প্রস্তর পাতকূয়ার মধ্যে ফেলিতে লাগিল। এইরূপে ঠগেরা বিনষ্ট হইলে পর গঙ্গাদেব তাহাদিগের গ্রাম দখল করিল এবং তাহাদিগের গৃহে সুখে স্ত্রী ও মাকে লইয়া বাস করিতে লাগিল।

শ্রীশোভনা সুন্দরী দেবী।

# সৃষ্টি। *

পূর্ব্বে এককালে যখন চন্দ্র সূর্য্য তারা কিছুই হয় নাই, এক নিবিড় অন্ধকার প্রসারিত ছিল। যেমন বালক অন্ধকারের মধ্যে গর্ভে থাকে, তেমনি যখন চন্দ্র সূর্য্য তারা পৃথিবী গর্ভের মধ্যে অন্ধকারে ছিল, তখন সেই একমাত্র স্বপ্রকাশ জ্যোতি বিরাজমান ছিলেন; তিনি সমুদয় প্রসব করিলেন। তিনি সূর্য্যকে ডাকিলেন, সূর্য্য প্রসূত হইয়া আকাশে উদিত হইল, তিনি চন্দ্রকে ডাকিলেন চন্দ্র উদিত হইল, তিনি গ্রহতারাকে ডাকিলেন, তাহারা উদিত হইয়া অসীম গগনে ভ্রাম্যমান হইতে লাগিল; জীবজন্তু তাঁহার ইচ্ছামাত্র প্রসূত হইল; এই আনন্দ ক্রিয়া কলাপে এই জগৎ সংসার আচ্ছাদিত হইল। তাঁহার সেই ইচ্ছার এখনো বিরাম হয় নাই—তিনি যখন প্রথম ইচ্ছা করিলেন, সৃষ্টি হউক সেই ইচ্ছার এখনো বিরাম হয় নাই, তাঁহার সেই ইচ্ছার স্রোত বর্ত্তমানে প্রবাহিত রহিয়াছে। তিনি কেমন জীবন্ত জাগ্রত দেবতা!—তাঁহার ইচ্ছার স্রোতে সসাগরা পৃথিবী, সমুদয় জগৎ এবং আমরা ভাসিতেছি; তাঁহার ইচ্ছার স্রোত প্রবাহিত থাকাতে এখানে আমরা তাঁহার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতেছি; তাঁহার ইচ্ছার বিরাম হইলে জগৎ সংসারের কিছুই থাকে না, প্রলয় উপস্থিত হয়। সেই জীবন্ত জাগ্রৎ দেবতা—তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম, তাঁহার ইচ্ছা, এখানে বর্ত্তমান থাকিয়া আমারদিগকে রক্ষা করিতেছে—তিনি এখানেই রহিয়াছেন। এই জ্যোতি যাহা শুভ্র জ্যোতি, তাঁহারি সত্তাতে ইহা শুভ্র হইয়াছে, তাঁহারি অধিষ্ঠানে জগন্মন্দির পবিত্র হইয়াছে; তিনি হৃদয়ে বাস করেন বলিয়া হৃদয় পবিত্র হইয়াছে। আমরা জানিতেছি যে তাঁহার জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা প্রতিক্ষণে কার্য্য করিতেছে। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা আশ্রয় দাতা; তাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার সত্তাতে ইহা স্থিতি করিতেছে।

* পূজ্যপাদ পিতামহদেবের এই বক্তৃতা ১৭৯৬ শক। ২৬ পৌষ। শনিবার প্রাতঃকালে পিতৃদেব ৺হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। পুঃ সং

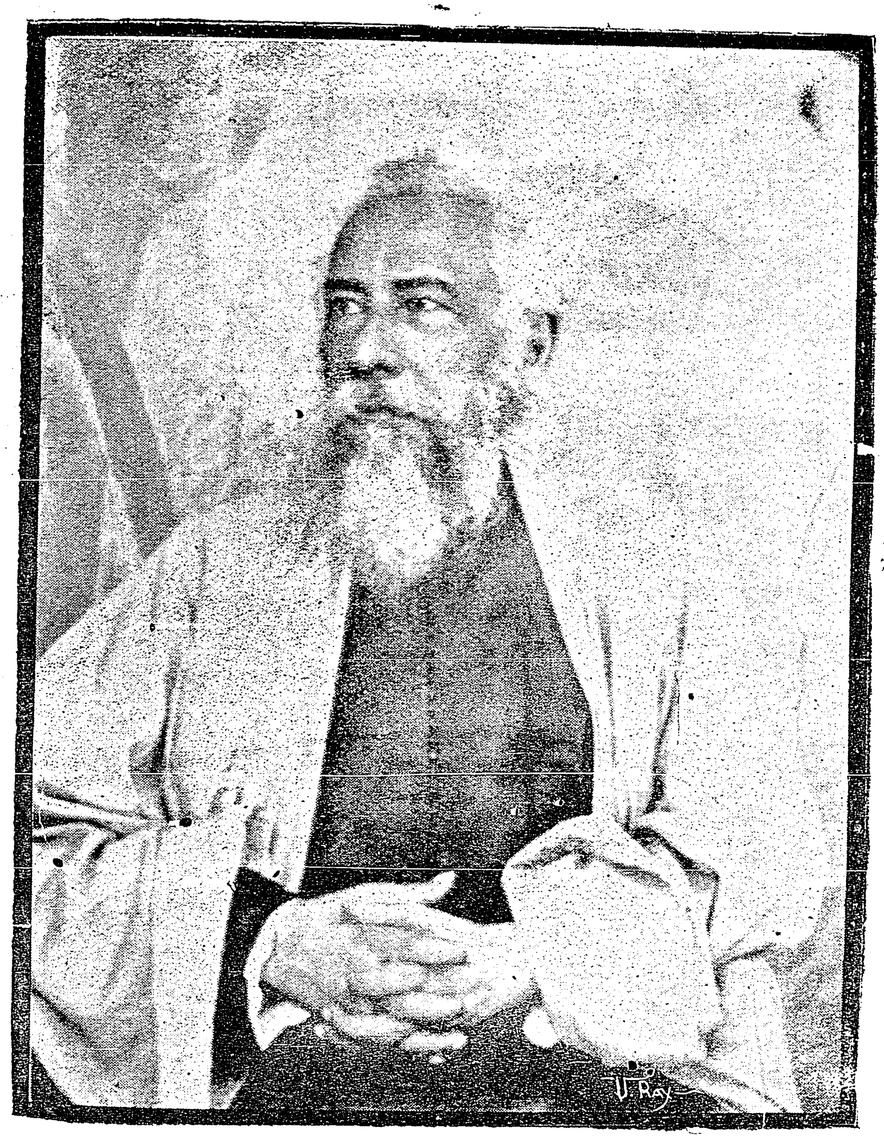

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর এক অমূল্য সত্য জানিয়াছি যে সকলে তাঁহার প্রীতি দৃষ্টির উপর চলিতেছে; কিন্তু আর কাহারো নিকট হইতে তিনি প্রীতি চান না, মনুষ্যের নিকট হইতে প্রীতি চান। জীবজন্তু তাঁহাকে প্রীতি করে না, পূজা করে না, তাঁহার কার্য্য জানিয়া শুনিয়া করিতে পারে না; এ কেবল মনুষ্যের অধিকার; মনুষ্যকে তিনি স্বাধীন করিয়া প্রীতি করিবার সাধ্য দিলেন, ধর্ম্মেতে উন্নত করিলেন; মঙ্গল ভাবে সম্পন্ন করিলেন—যে তাঁহার সৌন্দর্য্য, তাঁহার মঙ্গল ভাব দেখিয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহাকে প্রীতি করি। এই আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। হৃদয়কে পবিত্র করিয়া, মনের কলঙ্ক মলিনতা দূর করিয়া তাঁহাকে প্রীতি কর। যেখান হইতে যত আনন্দ পাইতেছি সবই তাঁহারি প্রসাদাৎ। তিনি জন্মাবধি কত প্রকার আনন্দ দিতেছেন আরো অনন্ত কাল পর্য্যন্ত কত প্রকার আনন্দ দিবেন! তোমরা ঈর্ষাদ্বেষে দুঃখী হইও না, পরপ্রীতে কাতর হইও না; আত্মপ্রসাদকে উজ্জল করিয়া প্রেমস্বরূপকে প্রীতি কর। বালকের নিকট হইতে পিতামাতা যেমন প্রীতি চান, বালকের হাস্যমুখ দেখিয়া পিতামাতা যেমন সুখী হন, তাহাকে লইবার জন্য ক্রোড় প্রসারিত করেন; তেমনি পরমেশ্বর প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন আমরা পবিত্র হইয়া প্রসন্ন চিত্তে তাঁহার প্রীতিমাখা ক্রোড়কে শীতল করিব। ইহারই জন্য সৃষ্টি যে তাঁহার আনন্দ ভাব গ্রহণ করিয়া তাঁহার শীতল ক্রোড়ে চিরকাল আত্মা শীতল হইবে। তাঁহার প্রেম চক্ষু আমাদের উপর নিপতিত দেখিয়া আমাদের প্রেম ভাবকে যেন উজ্জ্বল করি, শ্রদ্ধা ভক্তিকে প্রস্ফুটিত করি।

---

# টা ও খান।

১। চেতন পদার্থের নামের সঙ্গে 'টা' বসে, 'খান' বসে না। যেমন একটা লোক, লোকটা, একটা ঘোড়া, ঘোড়াটা, একটা পাখী, পাখীটা, একটা মাছ, মাছটা।

২। সেলাই করা কাপড়ের—যাহাতে দর্জ্জির হস্ত আবশ্যক—নামের সঙ্গে টা বসে, খান বসে না। যেমন, কোটটা, একটা কোট, একটা চাপ্‌কান, একটা পিরাণ, পিরাণটা ইত্যাদি।

৩। তাঁতে বোনা কাপড়ের নামের সঙ্গে টা এবং খান দুইই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যেমন, একখান ধুতি, একটা ধুতি, ধুতিখান ছিঁড়ে গেল, ধুতিটা পচা। কাপড়টা, চাদরটা, কাপড় খানি, চাদর খান ইত্যাদি।

৪। বাসনের নামের সঙ্গে সাধারণতঃ টা বসে। যেমন, একটা ঘটী, দুইটা কলসী, একটা থালা, একটা পেয়ালা। ইত্যাদি

৫। স্থল বিশেষে চতুর্থ নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যেমন, থালা খান।

৬। কাটিবার শাণিত অস্ত্রের নামের সাথে টা এবং খান দুই, বসে। যেমন, খাঁড়াটা, খাঁড়াখান, একটা ছুরি, ছুরিটা, ছুরিখান। ইত্যাদি।

৭। আগ্নেয় অস্ত্রের এবং যেসকল অস্ত্র দূর হইতে মারে তাহাদের নামের সহিত 'টা' ব্যবহৃত হয়, 'খান' নহে। বন্দুকটা, একটা বন্দুক, কামানটা, একটা কামান। তীরটা, ধনুকটা।

৮। চিঠি পত্র বহিটইয়ের সঙ্গে টা ও খান দুইই বসে। চিঠিটা, চিঠিখান। বইখান, বইটা। পুস্তকের সহিত 'টা' রই অধিক মিল।

৯। বাড়ী ঘর দ্বার সঙ্গে 'টা' ও 'খান' দুইই চলে।

১০। ঘৃণা, আজ্ঞা এবং সময় সময় অনুগ্রহ প্রকাশ কর্‌তে হলে 'টা' ব্যবহৃত হয়। লোকটা দুষ্ট, লোকটা ভদ্র বটে।



১১। উদ্ভিদ নামের সহিত টা ব্যবহৃত হয়। গাছটা, একটা গাছ।

১২। বিদ্যা গানটান—একটা গান, গানটা।

১৩। গুণ বাচক নামের সহিত 'টা' বসে। একটা গুণ, গুণটা, বুদ্ধিটা ধারাল। বুদ্ধিখান' নয়।

১৪। হাতখান দেহখান।

১৫। বিশেষ্যের মত ব্যবহৃত বিশেষণের সহিত 'টা' বসে 'খান' নহে।

১৬। গহনার নামের সহিত 'টা' বসে কোন কোন নামের সহিত 'খান'।

১৭। মাছের অংশ খান—কখান হল।

১৮। অংশ বুঝাইলে 'টা' ও 'খান'।

৺বলেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

# গোপালন।

( বালিকার রচনা। )

আমরা এই পৃথিবীতে যত প্রকার পশু দেখিতে পাই তন্মধ্যে গরুই আমাদের বিশেষ উপকারী। এ দেশে যে গৃহস্থের ঘরে গরু রহিল তাহার যেন গৃহে কিছুরই অভাব নাই। বাস্তবিক গরুর সামান্য জিনিশও নষ্ট করা যায় না, সকলই আমাদের কাযে আইসে। দুগ্ধ খাইয়া শিশুরা জীবিত থাকে। শিশুরা কেন সকলেই এক গাভী দুগ্ধের উপরে নির্ভর করিয়া জীবিত রহিয়াছে; দুগ্ধ খাইয়াই আমাদের শরীর বলবান ও হৃষ্ট পুষ্ট হয়, আমরা অক্লেশে কাজ করিতে পারি। এই দুগ্ধ হইতে দধি ও নবনীত প্রস্তুত হয়; এই দধি ও

নবনীত অতি শীতল ও স্নিগ্ধ গুণযুক্ত, দেখিতেও অতি তৃপ্তিকর এবং অনেক রোগেও বড় উপকারী। এই দুগ্ধে ঘৃত প্রস্তুত হয়, এই ঘৃত খাইয়া আমরা সকলেই পুষ্টি লাভ করি। ঘৃত দুগ্ধ ভাল লাগে না ইহা কেহ বলিতে পারেন না। যিনি বলেন আমার দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি কিছুই ভাল লাগে না, তিনি বোধ হয় অত্যন্ত মাংসপ্রিয়। তাঁহার হিংসা প্রবৃত্তি বিলক্ষণ আছে। এই ঘৃতের দ্বারাই তো সমুদয় রন্ধন ক্রিয়া চলিতেছে। আবার যখন মাখন হইতে ঘৃত প্রস্তুত হয় তখন ইহার সুগন্ধে গৃহ আমোদিত হইয়া যায়। কেবল যে মাখন হইতে ঘৃত হয় তাহা নহে, দুগ্ধের সর ( অর্থাৎ সারভাগ ) হইতেও অতি উত্তম ঘৃত প্রস্তুত হয়। আমরা যে সকল মিষ্টান্ন দ্রব্য আহার করি সে সমুদয়ই দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হয়। গোচোনা গোময় পর্য্যন্ত আমাদের অনেক উপকারে আসে। গোচোনাতে অনেক রোগ আরাম হয়, এবং গোময়ে দুর্গন্ধ দূর করে, সেই জন্য আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে গোবর ও কাদা একত্রে মিশাইয়া উঠান পরিস্কার করে, এবং কোন বিশেষ ক্রিয়া কর্ম্মে গোময় ও গঙ্গাজল দিয়া গৃহ ঝাঁট দেয়। ইহারা হয় তো না বুঝিয়া গৃহে গোময়ের লেপ দেয় কিন্তু বাস্তবিক ইহার গুণ আছে। গোময়ে দুর্গন্ধাদি দূর করিয়া বায়ু বিশুদ্ধ করে এবং গৃহ পবিত্র করে। আবার এই গোবর হইতে ঘুঁটে প্রস্তুত হয়; এই ঘুঁটের দ্বারা দরিদ্র লোকের কাষ্ঠের ব্যয় অনেকটা কমিয়া যায়।

আমি আর ইহার বিষয় কত বলিব। ঋষিরা এত অনুসন্ধান করিয়া তবে গাভীকে দেবী ভগবতী নাম দিয়াছেন। গাভী যথার্থই কামধেনু। গো জাতি অত্যন্ত ভারসহ বলিয়া শাস্ত্রকারেরা গাভীকে পৃথিবীর সহিত উপমা দিয়াছেন। এখন গোরুর কেহ মর্য্যাদা জানেন না। প্রাচীন কালে গাভীকে এত উপকারী বলিয়া জানিতেন যে মহারাজাধিরাজ দিলীপ আর তাঁহার পত্নী সুদক্ষিণা নিজে সমুদয় পরিচারককে বিদায় দিয়া গাভীর সেবা করিয়াছিলেন। দিলীপ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া গাভীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন গোধূলির সময় গাভী হাম্বারব করিয়া বেড়ায় তখন আমার সেই রঘু বংশের দিলীপ ও নন্দিনীর কথা মনে পড়ে। বাছুরগুলার লম্ফঝম্ফ দেখিয়া উহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতে ইচ্ছা করে। আঃ! আমি যদি গঙ্গাতীরে কোন বনের মধ্যে একটি কুটীর পাই তাহা হইলে সেই খানে



গিয়া বাস করি। আর গাভী ও বাছুরদের পালন করি। আবার যখন ইচ্ছা গঙ্গাতীরে বসিয়া প্রকৃতির শোভা উপভোগ করি। যখন আহারের ইচ্ছা হইবে তখন গাভীর দুগ্ধ পান করিব। আমার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিলে গরু দান করিতে ইচ্ছা হয়, কারণ আমার এক একটি গরু বহুমূল্য রত্নের তুল্য বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ব কালে যাগ যজ্ঞের দানে অর্থের পরিবর্ত্তে গো দান হইত। ব্রাহ্মণকে বিদায় দিবার সময় উত্তম গো দান করিতেন। তাঁহারা গরুকে এত ভক্তি ও মূল্যবান জ্ঞান করিতেন। এখনকার লোকে গরুকে ভক্তি করা দূরে থাকুক অনেকে গো হত্যা করিতে পারিলে ছাড়ে না। ইংরাজেরা গোমাংস আহার করে। তাহাদের শীতদেশ তাহারা আহার করিলে অধিক দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে কি উহা ভোজন করা উচিত? তাহা হইলে গরুর উপর কৃতঘ্নতা প্রকাশ করা হয়। কসাইরা গোয়ালারা ইহার যে দুরবস্থা করে তাহা মনে করিতেও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। একদিন আমাদের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া এক জন মুসলমান কসাই একটা গরুকে লইয়া যাইতেছিল। সেই গরুটা টানাটানি করিয়া প্রাণেরভয়ে কোন প্রকারে আমাদের বাগানে পলাইয়া আসে। গরুটি বাগানের চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে সেই কসাই কোন ক্রমে ধরিতে না পারিয়া ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল, তখন বেচারা গরু শান্ত ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মুসলমান কোচোয়ানরা উহার নিকট যাওয়াতে গরু যেন বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে শৃঙ্গের দ্বারা গুঁতাইয়া তাড়াইয়া দিল; কিন্তু হিন্দু চাকররা যখন তাহার নিকট গেল সে কিছুই বলিল না। গরুর কতদূর বুদ্ধি ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়। সে জানে যে ইহারা তাহাদের বংশাবলী হইতে সেবা করিয়া আসিতেছে। গোমাংস আহার আমাদের দেশে কোন মতেই সহ্য হয় না। গো মাংস খাইলে রক্ত গরম হইয়া শরীরে নানা ব্যাধির সঞ্চার হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। মাংস ভোজন যতটা না করা যায় ততই ভাল। বিশেষত নারীদিগের পক্ষে মোটেই ভাল নয়।

যে গরু আমাদের মাতার ন্যায় আহার দান করে, যে আমাদের চিকিৎসকের ন্যায় ঔষধ দান করে, যে আমাদের কৃষি কার্য্যের প্রধান সহায়, যে

আমাদের বাহন তাহার কি শোচনীয় এই দুর্দ্দশা। ইহার সদুপায় না করিলে আমাদের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। গরুর যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, যত্নে থাকে এই প্রকার উপায় করা উচিত।

শ্রীঃ দেবী।

---

# "সৎ সৈ"।

বংশীধ্বনি।

মূল। ৭। কিতোন গোকুল বধু কাহিনি কেহিঁ সিখদীন।
কৌনে তজীন কুলগলী হৈ মুরলী সুরলীন॥

অর্থ। ৭। কত গোকুল বধুইনা শ্যামের বংশীধ্বনি শুনিয়া কুল ত্যাগ বিরুদ্ধে পরস্পরকে শিক্ষা বা উপদেশ দিয়াছিল। আর কেইবা তাঁর বংশীধ্বনিতে বিলীন বা মুগ্ধ হইয়া কুলপ্রথা ত্যাগ করেনি?

"স্বধর্ম্মে দীক্ষিতা গোকুল দুহিতা
কত শত সতী।
মুরলীর ধ্বনি শুনি হায় ধনি।
ত্যজে কুলারীতি॥"

শব্দার্থ।

(১) কিতোন = কতইনা।
(২) কাহিনি কেহি = কে কাহাকে না।
(৩) সিখদীন = শিক্ষাদান করা বা সদুপদেশ দেওয়া।



(৪) কৌনে = কেনা।
(৫) তজীন = ত্যাগ করিয়াছিল।
(৬) কুলগলী = কুলপ্রথা = কুলরীতি।
(৭) হৈ = এই।
(৮) লীন = বিলীন = মুগ্ধ হওয়া।

বক্ষস্থল বর্ণন।

মূল। ৮। সখি সোহত গোপালকে উর গুঁজনকী মাল।
বাহর লসত পিয়ে মনৌ দাবানলকী জাল॥

অর্থ। ৮। (হে সখি!) গোপালের বক্ষস্থলে (রক্তিম) গুঞ্জিকা বা কুঁচের মালা এরূপ শোভা পাইতেছিল যেন পীত দাবানলের বহিঃ প্রকাশ হইয়াছিল।

(একদা শ্রীকৃষ্ণ দাবানল পান করিয়া প্রাণীনাশ নিবারণ করিয়াছিলেন এইরূপ একটি পৌরাণিক গল্প আছে।)

"শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোপরি রক্তিম কুঁচের সারি
শোভে অনুপম।
যেন মরি দাবানল ভেদি হৃদি অন্ত স্থল
হয় বহির্গম॥"

শব্দার্থ।

(১) গোপালকে = গোপালের।
(২) উর = উরঃ = বক্ষস্থল।
(৩) গুঁজনকীমাল = গুঞ্জিকা বা কুঁচের মালা।
(৪) বাহর = বহির্দেশে।
(৫) লসত = শোভা সম্পাদন করিতেছে।
(৬) পিয়ে = পান করিয়া।
(৭) জাল = জ্বালা = শিখা।

যুগলমূর্ত্তি।

মূল। ৯। নিত প্রতি একত হী রহত বৈস বরণ মন এক।
চহিয়ত যুগলকিশোর লখি লোচন যুগল অনেক।

অর্থ। ৯। অনন্ত আয়ু, অনন্ত স্তুতি ও অনন্ত একা গ্রতার। প্রতিনিয়ত একত্রাবস্থান সম্ভবপর হইলেও, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দর্শনার্থ বহুলক্ষ যুগল লোচনের আবশ্যক।

"আয়ূ স্তুতি মন একত্র মিলন—
অনন্ত মিলন হয়।
রাধাকৃষ্ণরূপ যুগল স্বরূপ
গ্রাহ্য লক্ষ আঁখি দ্বয়॥"

শব্দার্থ।

(১) নিত প্রতি = প্রতিনিয়ত; নিত = নিত্য।
(২) বৈস = বয়স = আয়ু।
(৩) বরণ = বর্ণ = অক্ষর = স্তুতি।
(৪) চহিয়ত = আবশ্যক।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

মূল। ১০। গোপিন সঁগ নিশ শরদকী রমতি রসিক রসরাস।
লহাচেহ অতি গতিন কী সবন লখে সব পাশ।

অর্থ। ১০। রসরাশিপূর্ণ রসিক (রাজ) শ্রীকৃষ্ণ শারদীয় রজনীতে গোপিনীদিগের সহিত নৃত্যক্রীড়া করিতেছেন। তিনি এত দ্রুত গতিতে নৃত্য করিতেছেন, যে সমস্ত গোকুল রমণীরা তাঁহাকে তাঁহাদিগের আপন আপন পার্শ্বে দেখিতেছেন।

"শরতের মধু রাতে গোপাল গোপিনী সাথে
মত্ত নৃত্য ক্রীড়া মাঝে।



দ্রুত পদ সহকারে নায়িকা মণ্ডলী ঘেরে
সবে তাঁরে হেরে কাছে।

শব্দার্থ।

(১) রসরাস = রসরাশী।
(২) লহাচেহ = নৃত্য ক্রিয়া।
(৩) সবন = নায়িকা মণ্ডলী।
(৪) লখে = দেখে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

---

# পেয়ারার জেলি।

—:*:—

উপকরণ।—পেয়ারা পাঁচ পোয়া, জল পাঁচ পোয়া, চিনি আধ সের, লালরং দু তিন ফোঁটা, নেবুর রস এক ছটাক।

প্রণালী।—মজা দেখিয়া পেয়ারা লইবে। দু দিকের বোঁটা ছাড়াইয়া চাকা চাকা করিয়া কাট। জল দিয়া ধোও। এখন আবার নূতন জল দিয়া ভিজাইয়া রাখ। রাত ভর ভিজিলে পর ইহার সমুদয় কষ্ বাহির হইয়া যাইবে। পর দিনে ঐ কষ-জল ফেলিয়া দিয়া আর একবার নূতন জল দিয়া ধুইয়া লও।

আগুনে হাঁড়ি চড়াও। পাঁচ পোয়া জল দাও। জল মিনিট সাত গরম হইলে পরে পেয়ারাগুলি ছাড়। প্রায় তিন কোয়ার্টার পেয়ারা সিদ্ধ হইলে দেখিবে পেয়ারাগুলি খুব নরম হইয়া গিয়াছে, তখন হাঁড়ি নামাইবে। এই বারে একটি নূতন মলমল কাপড়ের চারি কোণ চারি খুঁটিতে বাঁধিয়া তাহাতে ঐ পেয়ারা ঢালিয়া দাও। কাপড়ের নীচে একটি পাত্র রাখিয়া দিবে। ঐ পাত্রে পেয়ারার জল পড়িবে। সব জলটা ঝরিয়া গেলে পেয়ারার শাঁসটা কাপড় বাঁধিয়া আলাদা রাখিয়া দাও। এই শাঁস জেলিতে কাজে লাগিবে না, উহা পোয়ারার চিজ ইত্যাদি করিবার জন্য লাগিবে। জেলির জন্য আমাদের এই সিদ্ধ পেয়ারার জলীয় রসেরামাত্র দরকার। জলটা মাপিয়া দেখ কত হইয়াছে। সাড়ে চারি পোয়া জল হইয়াছে। এখন ইহাতে আধ সের দোবারা চিনি মিশাও। এখন আগুনে চড়াও। ফেনার মত গাদ উঠিলে পর ঝাঁঝরি করিয়া সব গাদ উঠাইয়া ফেলিবে। এখন ফুটিতে থাকুক। প্রায় বিশ মিনিট ফুটিবার পর নেবুর রস দিবে। আবার দশ মিনিট পরে রং দিবে। রংটুকু দিলেই টক্‌টকে লাল হয়, নহিলে ঘোর টক্‌টকে লাল হয় না। এই বারে আরো দশ মিনিট ফুটাইয়া যখন দেখিবে অনেকটা ভারী হইয়া আসিয়াছে এবং ক্রমাগত শাদা ফেনা হইতেছে তখন নামাইবে। ঠাণ্ডা হইতে দিবে। ঠাণ্ডা হইলে পর বোতলে পুরিবে। ইহাই পেয়ারার জেলি।

ভোজন বিধি।—ইহা পাঁওরুটী মাখনের সঙ্গে খাও। লুচির সঙ্গেও খাও বেশ লাগিবে।

---

# সুরভি। *

—:০:—

উপকরণ।—ছানা তিন পোয়া, শফেদা আধ পোয়া, জল পাঁচ ছটাক। এই গুলি খামিরের জন্য।

ডেলাক্ষীর আড়াই ছটাক, জাফরান চার রতি, বাদাম দশটা, চিরঞ্জি বাদাম তিন কাঁচ্চা, রস এক ছটাক, ছোট এলাচ পনেরটা, বড় এলাচ একটি, গোলাপ জল এক কাঁচ্চা, গোলাপী আতর এক ফোঁটা। এই গুলি পূরের জন্য।

চিনি এক সের, জল তিন পোয়া, দুধ এক ছটাক এই গুলি রসের জন্য।

ঘি এক সের, ডেলাক্ষীর আধ ছটাক, বাদাম কুড়িটী, পেস্তা পঁচিশটী, জাফরান আট রতি, গোলাপজল আধ ছটাক, আতর ফোঁটা তিন, ছোট এলাচ কুড়িটী, বড় এলাচ তিনটী, কিসমিস আধ ছটাক। এই গুলি মেঠাইয়ের সরঞ্জাম।

প্রণালী।—পূরের এবং মেঠাইয়ের সব বাদাম ও পেস্তাগুলি ভিজাইয়া খোসা ছাড়াও। কিসমিসগুলি বাছিয়া ধুইয়া ফেল। জাফরান গোলাপ জলে ভিজাইয়া ঢাকিয়া রাখ। বড় এলাচ ছাড়াইয়া দানা গুলিতে একটু শফেদা মাখিয়া রাখ তাহা হইলে ইহার চটচটে ভাব চলিয়া যাইবে। বড় এলাচের দানা আস্ত থাকিবে। ছোট এলাচ আধ-কোটা করিয়া রাখ।

একটি কড়াতে অগ্রে এক সের চিনি তিন পোয়া জলে গুলিয়া চড়াইয়া দাও। মিনিট দশ পরে রসটা ফুটিয়া উঠিলে, এক ছটাক দুধে এক ছটাক জল

---

* সুরভি বরাবর বলিত "মা ছানার মেঠাই হয় না?" সে যখন ঐ কথা বলিত আমার বরাবর মনে হইত একদিন করিয়া দেখিলে হয়। এতদিন পরে করিয়া দেখিলাম ছানা দিয়া করিলে মেঠাই বেশ হয়। কিন্তু এখন তো আর সে ইহজগতে নাই! তাকে তো আর খাওয়াইতে পারিলাম না! এই মেঠাইএর নাম আমার কন্যার নামে সুরভি রাখিলাম।

প্রঃ

মেশাইয়া রসের চারিধারে ঢালিয়া দিবে, তাহা হইলে যত গাদ কাটিয়া রস সাফ হইয়া যাইবে। ক্রমে ফেনার মত উঠিতে থাকিবে। সেই গুলি একটি ঝাঁঝরি করিয়া এক ধার হইতে টানিয়া জড় করিয়া উঠাইয়া ফেলিবে। যত গাদ কাটিয়া ফেলিবে চিনির রস সাফ হইয়া যাইবে। রস আরো মিনিট পনের ফুটিলে পর দুই আঙ্গুলে রস লইয়া টানিয়া দেখিবে, যখন সুতার মত হইতেছে অর্থাৎ বেশ চটচট করিতেছে তখন নামাইবে।

এবারে খামির প্রস্তুত কর। ছানা একটি বারকোষের * উপরে রাখিয়া প্রথমে হাঁতের তেলো দিয়া মাড়। বেশ মোলায়েম হইলে পর ইহাতে শফেদা মিশাও। তার পরে ক্রমে ক্রমে ইহাতে প্রায় পাঁচ ছটাক জল মিশাও। বেশ করিয়া ফেটাও। সবশুদ্ধ খামির ফেটাইতে প্রায় মিনিট দশ সময় লাগিবে।

এক খানি বড় কড়ায় এক সের ঘি চড়াও। তিন খানি ঝাঁঝরি আর একটি তাড়ু আনিয়া রাখ। মেঠাই করিবার ঝাঁঝরিটীর ছাঁদা একটু বড় বড় হইবে; তাহা হইলে ইহার বোঁদেগুলিও বড় হইবে। অন্য দুটি ঝাঁঝরির ছাঁদা ছোট ছোট হইবে, তাহা হইলে ঘি ও রস হইতে বোঁদেগুলি তুলিবার সময় ঘি ও রস বেশ ঝরিয়া যাইবে অথচ ছাঁদার ভিতর দিয়া বোঁদেগুলি পড়িবে না। মেঠাই নরম আঁচে ভাজিতে হইবে। প্রায় মিনিট সাত আট পরে ঘিয়ের কাঁচাটে ভাব একেবারে চলিয়া গিয়া ধোঁয়া উঠিতে থাকিলে, বাঁ হাতে বোঁদের ঝাঁঝরি লইয়া ঘিয়ের কড়ার উপরে চিত করিয়া ধর। তার পরে ডান হাতে খানিকটা করিয়া খামির লইয়া এই ঝাঁঝরির উপরে ছাঁকিবার মত করিয়া রগড়াইয়া দাও। দেখিবে ঝাঁঝরির ছাঁদা দিয়া ঘিয়ে শাদা লম্বা লম্বা টোপ্ টোপ্ দানা পড়িতেছে। এদিকে ঘিয়ে দানা পড়িবামাত্র আর এক জন ঘিয়ের ভিতরে তাড়ু দিয়া ঠিক কড়ার মধ্যস্থলে ঘষড়াইয়া দিবে; তাহা হইলে ঘিয়ের তলায় যে দানাগুলা পড়িবে সে গুলাও ভাসিয়া উঠিবে। এক এক খোলা ঠিক ভাজা হইতে প্রায় মিনিট তিন করিয়া সময় লাগিবে। দানার রং যেই ফিকে বাদামী হইবে এবং দেখিবে ইহার উপরি ভাগ একটু শক্ত হইয়া

* থালার ন্যায় কাষ্ঠ পাত্রকে "বারকোষ" বলে।



আসিয়াছে অথচ যেন নরম আছে, তখনি বোঁদেগুলি একটি ঝাঁঝরি করিয়া ছাঁকিয়া রসে ফেলিবে। তার পরে আর একটি ঝাঁঝরির উলটা পিঠ দিয়া দানাগুলি ভাল করিয়া রসে ডুবাইয়া দিবে।

যেই আর এক খোলা ঘিয়ে ভাজিতে চড়ান হইবে, অমনি এই রসের বোঁদেগুলি (যে গুলি রসে ডুবান হইয়াছে) রসের ঝাঁঝরি করিয়া উঠাইয়া একটি বারকোষে বা থালায় রাখিবে। থালা একটু কাত করিয়া রাখিয়া দিবে, তাহা হইলে রসটা ঝরিয়া আসিবে। এইরূপে মেঠাইয়ের সমস্ত বোঁদে প্রস্তুত করা হইল।

এখন পূর তৈয়ারি কর। বোঁদে ভাজিয়া কড়া হইতে সব ঘি ঢালিয়া মোটে এক কাঁচ্চাটাক ঘি কড়াতে রাখ। এই ঘিয়ে আগে চিরঞ্জি বাদাম ভাজিয়া উঠাও। তার পরে বড় বাদাম আড়ে চারি টুকরা করিয়া কাটিয়া ছাড়। দু এক মিনিটেই ভাজা হইয়া গেলে ঘি হইতে ছাঁকিয়া উঠাও।

এবারে আর এক খানি কড়াতে এক ছটাক রস চড়াও। মিনিট পাঁচ সাত রস নাড়িয়া শাদা চিনির মত পাক কর। এই রসে পূরের মেওয়া হাতে করিয়া গুঁড়াইয়া ছাড়। তাড়ু দিয়া নাড়িতে থাক। ক্রমে বেশ গাঢ় হইয়া আসিলে যখন দেখিবে হাতে গুলি পাকাইলে আর লাগিতেছে না তখন নামাইবে। পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যে হইয়া যাইবে। ক্ষীরের সহিত চিরঞ্জি, বাদাম, বড় এলাচ, ছোট এলাচ গুঁড়া, গোলপজলে ভিজান একটু জাফরান, ফেঁটা দুই আতর সব একত্র মিশাও। ছোট ছোট পেঁড়ার মত গোল গড়ন করিয়া গড়। কুড়িটী গড়।

পূরের ক্ষীরটা আগের দিনে করিয়া রাখিলেও ভাল হয়। তার পর দিনে ইহার সহিত বাদামআদি মিশাইলেই হইতে পারে।

বোঁদে মাখ। বোঁদের উপরে ডেলা ক্ষীরটুকু মিহি করিয়া হাতে গুঁড়াইয়া দাও। বাদাম কুচি, পেস্তা কুচি, আধ-কোটা ছোট এলাচ, বড় এলাচের আস্ত দানা ও কিসমিস মিশাও। গোলাপজলে ভিজান জাফরান গুলিয়া ঢালিয়া দাও। ভাল আতর ফোঁটা তিন মিশাও। সব একত্রে আলগোচে মিশাও।

এবারে মেঠাই বাঁধ। প্রথমে বাঁ হাতের উপরে কতকগুলি বোঁদে রাখিয়া তাহার উপরে একটি পূর রাখ। এই পূরের উপরে আবার কতক-

গুলি বোঁদে দিয়া মেঠাই বাঁধ। এক একটি মেঠাই প্রায় আধ পোয়া বা সাত কাঁচ্চা করিয়া ওজন হইবে।

ছানার মেঠাই করিতে ঘি এবং রস প্রায় সবই বাঁচিয়া যায়। ইহা খুব কমই টানে।

তিন পোয়া ছানাতে প্রায় সাত পোয়া মেঠাই হইবে।

ব্যয়।—সবশুদ্ধ টাকা দুইয়ের উপর খরচ হইবে।

---

# আলুর চপ।

## ( মাংস খণ্ড দিয়া। )

—:++:—

উপকরণ।—রাংএর মাংস এক পোয়া, আদা আধ গিরা, পেঁয়াজ এক ছটাক, শুক্না পাটনাই লঙ্কা দুটি, দই এক ছটাক, ছোট এলাচ একটি, দারচিনি সিকি তোলা, লঙ্গ তিনটী, তেজপাতা এক খানি, জল আধ সের, আলু আধ সের, গরম মশলার গুঁড়া সিকি তোলা, ডিম একটি, বিস্কুট এক পোয়া, ঘি আধ পোয়া, নুন প্রায় পোন তোলা।

প্রণালী।—মাংস ডুমা করিয়া বানাও। আট টুকরা কর। আদা, একটি পেঁয়াজ ও একটি শুক্নলঙ্কা পিষিয়া রাখ। বাকী পেঁয়াজগুলি ভাজিবার জন্য লম্বা কুচি করিয়া কাট। একটি শুক্না লঙ্কা গুঁড়াইয়া রাখ।

মাংসগুলি কাঁটা করিয়া বিঁধ। ইহাতে দই, আদা, পেঁয়াজ ও লঙ্কাবাটা মিশাও। প্রায় ছয় আনি ভর নুন এবং গরমমশলা দাও। (গরম মশলা= ছোট এলাচ দুটি, লঙ্গ তিন চারিটী, দারচিনি সিকি তোলা )।

এই মাংস আধ ছটাক ঘি ও এক পোয়া জল দিয়া চড়াও। প্রায় মিনিট পনের পরে জল মরিয়া গেলে আবার এক পোয়া জল ঢালিয়া দাও। মিনিট সাত আট পরে জল মরিয়া গেলে ঘি বাহির হইবে। এখন এই ঘিয়েতেই



মাংস কষিয়া লাল করিবে। মাংস বেশ লাল হইয়া আসিলে নামাইবে। প্রায় মিনিট সাত আট লাগিবে।

আলুগুলি জলে সিদ্ধ করিতে দাও। মিনিট কুড়ি পরে সিদ্ধ হইয়া যাইবে। আলুর খোসা ছাড়াও।

উনানে ঘি চড়াও। কুঁচান পেঁয়াজগুলি ভাজ। সিদ্ধ আলুগুলা শিলে পিষিয়া ফেল। ইহার সহিত ভাজা পেঁয়াজও পিষিয়া লও। আলুতে গুঁড়া লঙ্কা, ছয় আনি ভর নুন, ও দুয়ানি ভর গরম মশলার গুঁড়া মাখ। এখন এই আলু ষোল ভাগ কর। প্রত্যেক ভাগ চেপটা করিয়া গড়। একটি চেপটা 'চাকির' উপরে এক টুক্‌রা মাংসের পুর রাখ, তার পরে তাহার উপরে আবার আর এক 'চাকি' ঢাকিয়া দিয়া চারিধারের মুখ মুড়িয়া দাও।

একটী গাঢ় পাত্রে ডিম ভাঙ্গিয়া ফেটাও। বিস্কুট গুঁড়া একটী চেপ্‌টা পাত্রে রাখ। আলুর চপগুলি ডিমে ডুবাইয়া বিস্কুট মাখিয়া রাখ।

কড়া বা ফ্রাইপ্যানে ঘি চড়াও। বাদামী রং করিয়া বিস্কুট মাখা চপ গুলি ভাজ।

ভোজন বিধি।—ইহা ডিনারে সাইড ডিসের ভিতরে পড়িবে।

---

# দয়ে মালাই।

—:++:—

উপকরণ।—ভাল চাপ দই আধ সের, দুধের মালাই প্রায় আধ পোয়া, বাদাম পনেরটা, কিসমিস কুড়িটী, চিনি আধ পোয়া, গোলাপ জল আধ ছটাক, পেস্তা ছয়টা।

প্রণালী।—দই একটি বাটীতে রাখিয়া চামচের পিছন দিক দিয়া ফেটাইয়া লইবে। তার পরে ইহাতে মালাইও চামচে করিয়া মিলাইবে। চিনি দিবে। কিসমিস গুলি বাছিয়া ধুইয়া ইহাতে দিবে। বাদাম ও পেস্তা ভিজাইয়া, খোসা ছড়াইয়া, তার পরে মিহি লম্বা কুচি করিয়া ইহাতে দিবে।

শেষে গোলাপ জল মিশাইয়া ঢাকিয়া রাখ। বরফ কুচি দিয়া খাইতে দাও।

ভোজন বিধি।—ইহা ভাতের সঙ্গে দিতে পার। দুটিখানি ভাত দিয়া মাখিয়া খাইলে বেশ লাগে।

ব্যয়।—সব শুদ্ধ পাঁচ ছয় আনার ভিতরে হইয়া যাইবে।

---

# পুণ্য ভাণ্ডার।

## পালিশ।

সকল জিনিষেরই পালিশ চাই। তাহা নহিলে শীঘ্র খারাপ হইয়া যায়। আমাদের শরীরটীকে তৈল দ্বারা পালিশ করিলে কেমন স্নিগ্ধ থাকে। সেই রকম কাঠের জিনিষও পালিশ করিলে অনেক ভাল থাকে, কাঠ সহজে খারাপ হয় না, আর দেখিতেও সুন্দর হয়। কলিকাতায় কাষ্ঠদ্রব্য পালিশ করিবার লোক আছে। আট আনা বা দশ আনা হিসাবে রোজ দিলেই তাহারা পালিশ করিয়া যায়। কিন্তু মফস্বলে প্রধান প্রধান সহর ব্যতীত পালিশ-ওয়ালা পাওয়া যায় না। সেই কারণে আজ পুণ্যের পাঠক পাঠিকা দিগের জন্য পালিশ প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখা যাইতেছে। ইহাতে তাঁহারা অনায়াশেই স্বহস্তে তাঁহাদিগের কাষ্ঠদ্রব্যাদি (যেমন আল্‌মায়রা, বাক্স প্রভৃতি) পালিশ করিয়া লইতে পারিবেন।

### লাল পালিশ।

প্রথমে কাষ্ঠে পালিশ দিবার আগে কাষ্ঠ দ্রব্যকে "শিরীষ কাগজ" দিয়া ঘষিতে হইবে, তাহাতে কাষ্ঠের উপরকার ময়লা উঠিয়া যাইবে; তাহার পরে পালিশ দিলে বেশ ধরিবে। শিরীষ কাগজের অভাবে ভাঙ্গা কাচ দিয়াও ঐরূপ করা যাইতে পারে। এইবারে "পালিশ" প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে বলা যাইতেছে।—



আধ পোয়া গালা, এক ছটাক লোবান, এক কাঁচ্চা মুস্তগি এই দ্রব্যগুলি গুঁড়াইয়া আড়াই পোয়া বা তিন পোয়াটাক স্পিরিট পূর্ণ বোতলে ঢালিয়া নাড়িয়া রাখিয়া দিবে। যখন ঐ দ্রব্যগুলি স্পিরিটে গলিয়া যাইবে তখনি "পালিশ" প্রস্তুত হইল। দিন দুই রাখিলেই গলিয়া যাইবে। মধ্যে মধ্যে বোতলটা নাড়িয়া নাড়িয়া দিবে। লোবান দিলে "পালিশে"র জোর হয়। লোবান প্রভৃতি সকল মশলাই বেনের দোকানে পাওয়া যায়।

এইবারে "খুনখারাপি" (লাল রং বিশেষ বেনের দোকানে পাওয়া যায়।) পূর্ব্ব প্রস্তুত "পালিশে"র সঙ্গে মিশাইতে হইবে। খুনখারাপি মিশাইলে "পালিশ"এর রং লাল্‌চে হয়। তিন পোয়াটাক স্পিরিটে এক ছটাক আন্দাজ "খুনখারাপি" মিশাইবে। পালিশ বেশী লাল করিতে চাহিলে "খুনখারাপি" বেশী পরিমাণে মিশাইতে হইবে। এই যে "খুনখারাপি" মিশ্রিত "পালিশ" প্রস্তুত হইল, এখন ইহা কাষ্ঠদ্রব্যের গায়ে বেশ করিয়া মাখাও। যে নেকড়া করিয়া "পালিশ" মাখাইবে সেই নেকড়াতে অতি সামান্য একটু সর্ষা তেল ছুঁইয়া লইবে, তাহা হইলে পালিশ মাখাইবার সময় হাত সরিবে।

কাষ্ঠ দ্রব্যে "পালিশ" মাখান হইয়া গেলে তাহার পর আর একবার কেবলমাত্র স্পিরিট মাখাইতে হইবে। এই স্পিরিটের সঙ্গেও যদি একটু "পালিশ" (পূর্ব্বে যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে) মিশাইয়া লও তাহা হইলে ভাল। তিন পোয়াটাক্ স্পিরিটে এক ছটাক আন্দাজ মাত্র পালিশ মিশাইলেই চলিবে। এইরূপে কাষ্ঠদ্রব্যাদির বেশ লালচে চক্‌চকে পালিশ হইবে। পালিশ এর দ্বারা পুরাণ দ্রব্যও নূতন বলিয়া বোধ হইবে।

### কাল পালিশ।

কাল পালিশে "খুনখারাপি" দিলে চলিবে না। "আইভারি কালী" দিতে হইবে। "আইভারি কালী" ধর্ম্মতলায় রংএর দোকানে পাওয়া যায়। একটু "পালিশে" ("খুনখারাপি" বাদে পূর্ব্বে যেরূপ "পালিশ" প্রস্তুত হইয়াছে) একটু "আইভারি কালী" দিয়া ঠিক কাল রং ফলাইয়া লইতে হইবে। উহাই কাষ্ঠ দ্রব্যে মাখাইবে। পরে "পালিশ" আর সর্ষা তৈল দিয়া কাষ্ঠ দ্রব্যটী ক্রমাগত মাজিতে হইবে, তাহা হইলে কাল বেণ্ট্‌উড্ চৌকীর যেমন পালিশ হয় সেই রকম চক্‌চকে কাল পালিশ হবে। কাল পালিশে সর্ষা তেল দিয়া

পালিশ না করিলে কাষ্ঠদ্রব্য ভাল রূপ পালিশ হবে না। সকল রকম পালিশের পূর্ব্বেই "শিরীষ কাগজ" দিয়া কাষ্ঠদ্রব্য ঘষিয়া পরিস্কার করিয়া লইতে হইবে। "আইভারি কালী"র অভাবে কাল ভুষা দিলে চলে। কিন্তু "আইভরি কালী" দিলে যেমন হয় ইহাতে তেমনটী হয় না।

শ্রীঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

---

# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

—০:০:০—

**সাহিত্য** (ফাল্গুন ১৩০৭)—"জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা" প্রবন্ধে লেখক সংক্ষেপে ও সুগম করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছেন। "পণ্ডিত প্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায়" প্রবন্ধে তাঁহার রচিত প্রাণস্পর্শী গীতগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইতে বাকী থাকে না। এমন সহজ ভাবে অথচ ছন্দে ছন্দে অকৃত্রিম মনোভাব ব্যক্ত করিতে আধুনিক সুশিক্ষিত ও মার্জিত কবিগণও সমর্থ কি না জানি না।

**সাহিত্য** (চৈত্র ১৩০৭)—মহাপুরুষ রাণাডের সম্বন্ধে মহামতি বালগঙ্গাধর তিলকের কথার অনুমোদন করিয়া আমরাও বলি "একটী বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন ও পালন কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য যেরূপ বুদ্ধি ও কার্য্য দক্ষতার আবশ্যক, রাণাড়ে মহোদয়ে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার যথোপযুক্ত বিকাশ সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।" মহোদয় রাণাড়ের প্রতিকৃতির পার্শ্বে য়ুরোপীয় স্বাধীন দেশের মহাপুরুষ বিসমার্ক প্রভৃতির প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া তুলনা করিলে সহজেই মনে হয় যে সেই সকল পুরুষসিংহেরা স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু ভোগ করিয়া কেমন সগৌরবে বসিয়া আছেন আর আমাদের অধীন দেশের রাণাড়ের ন্যায় মহোদয়গণ অদৃষ্টক্রমে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া যেন জর্জরীভূত। যেন করিবার আকাঙ্ক্ষা অনেক কিন্তু অধীনতার শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকায় কোন কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। "উন্মাদ" একটী মর্ম্মস্পর্শী কবিতা; রচনা সরল, সহজে গল্পের মত পড়া যায়। "মন্দির পথে" গুজরাতী চিত্র, রচনায়



শিল্প নিপুণ্য আছে। "এমাসের বহি" "জীবজন্তু" পুস্তকের সমালোচনা। বস্তুত "জীবজন্তু" আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের পাঠোপযোগী। বাঙ্গলায় এরূপ গ্রন্থের বড়ই অভাব ছিল।

**নবপ্রভা** (ফাল্গুন ১৩০৭)।—ফাল্গুন সংখ্যাই নবপ্রভার প্রথম সংখ্যা। দুই জন কৃতবিদ্য সম্পাদক ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংখ্যায় প্রবন্ধ অনেক গুলি কিন্তু সকল প্রবন্ধই প্রায় দুই এক পৃষ্ঠায় শেষ। ইহার উপর আবার "উদ্বোধন" পত্রের "আহার" প্রবন্ধটী উদ্ধৃত হইয়াছে। "দৈনিক ঘটনা সংগ্রহে" "নবপ্রভা"র নূতনত্ব দেখিতে পাইলাম। অবশ্য প্রথম সংখ্যা প্রকাশে অনেক সময় এইরূপই হইয়া থাকে। তাড়াতাড়িতে ঠিকটা মনের মত করিয়া তুলা যায় না। "স্বর্গীয়া মহারাণী" সুলিখিত প্রবন্ধ। কিন্তু একটী কথা এই যে স্বর্গীয়া মহারাণীর বিশুদ্ধ জীবন কথা লিখিতে গিয়া লেখক যে প্রবন্ধের শেষাংশে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন তাহা যথাস্থানে করা হয় নাই। যে প্রবন্ধে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র আলোচিত হইবে সেখানে এ সকল কথা বলিলে শোভনীয় হইত। স্বামী বিবেকানন্দ "আহার" প্রবন্ধে আহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত সকল স্থানে আমাদের মতের ঐক্য নাই। মাংসাহার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে আমরা এক মত। তিনি বলেন "মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষ ভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্ম্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ, আর যাকে খেটেখুটে এই সংসারের দিবারাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাঝে মাঝে মাংস খেতে হবে বৈ কি।" আমাদের মতও তাহাই যে যাঁহাদিগকে অষ্টপ্রহর ঘোরতর সাংসারিক কর্ম্মে লিপ্ত ও ব্যস্ত থাকিতে হয় যেমন আজকালকার সমাজে ব্যারিষ্টর, ডাক্তর প্রভৃতি কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি কিম্বা যেমন যুদ্ধোপজীবী সৈনিক পুরুষ, তাঁহাদিগের সহজেই মাংসাহারে রুচি হয় এবং তাঁহাদের পক্ষে মাংসাহার অনুপযোগী নহে। নিরামিষপ্রধান দেশ হিন্দুস্থানেও ক্ষত্রিয়দিগের মাংসাহারের সমর্থন করিয়া এক প্রবাদ প্রচলিত আছে।—

হালুয়া মণ্ডা খায়।
ক্ষত্রী বিগড় যায়॥

অর্থাৎ হালুয়া মণ্ডা প্রভৃতি ঘৃত পক্ক স্নিগ্ধ দ্রব্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরই উপযোগী খাদ্য। আর ক্ষত্রিয় যদি বেশী হালুয়া মণ্ডা খায় ত ক্ষত্রিয় বিগড়াইয়া যায় অর্থাৎ এইরূপ আহারে ক্রমে তাহার ক্ষাত্র বিক্রম লুপ্ত হওয়া সম্ভব। স্বামীজী আরেক স্থলে বলিতেছেন "ঘি তেল গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ" তাঁহার এরূপ বাক্যে আমরা কিছুতেই সায় দিতে পারি না। ঘৃত পান ও তৈল সেবনকে সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া বিবেকানন্দ সুবিবেচনা শক্তির পরিচয় দেন নাই। বস্তুতঃ গরম দেশে ঘৃত পানের উপকারিতা অনেক। শরীরকে স্নিগ্ধ রাখিতে, পুষ্ট করিতে, শরীরের শ্রীবৃদ্ধি ও মেধাবৃদ্ধি করিতে এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে গব্য ঘৃতের তুল্য দ্রব্য আর নাই বলিলে হয়। আয়ুর্ব্বেদে গব্য ঘৃতের যেরূপ প্রংশসা আছে এমন আর অন্য কোন বস্তুর আছে কি না সন্দেহ। আমরা বাঙ্গালীরা যদি পশ্চিমী হিন্দুস্থানীদিগের মত আমাদের দেশে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতের বিশেষ প্রচলন করি ও তাহাদিগের মত নিয়মিত ব্যায়াম করি তাহা হইলে বাঙ্গালীর শরীর হইতে অনেক রোগ দূরে পলায়ন করে। স্বামী বিবেকানন্দ তিনি এমন যে নিরীহ খাদ্য পাঁওরুটী তাহার উপরেও অযথা রোষ প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি বলিতেছেন—"আবার ঐ যে পাঁওরুটী উনিও হচ্ছেন বিষ, ওঁকেও ছুঁয়ো না, এক দম।" তিনি কোন্ যুক্তি বা প্রমাণ বলে এ কথা বলিতেছেন আমরা জানি না। কিন্তু শত শত সুস্থকায় ব্যক্তি পাঁওরুটী মাখন নিত্য খাইতেছেন কৈ কাহাকেও "পাঁওরুটি খাইয়া শরীর খারাপ হয়" বলিতে শুনি নাই। পাঁওরুটি আবার এত লঘু যে অতি রোগীরাও দুধে ভিজাইয়া পাঁওরুটি সেবন করিলে তাহাদিগের কোন অপকার করে না জানি। ডাক্তর কবিরাজ সকলেই এ কথা স্বীকার করেন। বোধ হয় "বামুনের দোকানের পাঁউরুটি" কে লক্ষ্য করিয়াই তিনি ইহা বলিয়া থাকিবেন। অবশ্য যেখানকার সেখানকার পাঁউরুটিতে অধিক পরিমাণে তাড়ি প্রভৃতি মিশ্রিত থাকায় তাহাতে অপকার হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তাই বলিয়া কারিগরকে ছাড়িয়া পাঁওরুটির উপর অযথা দোষারোপ করা যায় না।

**অন্তঃপুর** ( চৈত্র ১৩০৭ )।—গত মাঘ মাসের অন্তঃপুর পত্রিকায় যে "পেয়ারার জেলি'র প্রস্তুত প্রণালী বাহির হইয়াছিল, আমরা গত মাসের



পুণ্যের মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় তাহা ঠিক নহে বলাতে "অন্তঃপুর" আমাদের উপর অযথা রাগ করিয়া দু দশটা কটু কথা শুনাইতেও ছাড়েন নাই। আমরা তাহাতে দুঃখিত নহি। অন্তঃপুর পত্রিকায় "পেয়ারার জেলি" বলিয়া যে খাদ্য পাক বাহির হয় তাহা যে বাস্তবিক পেয়ারার জেলি নহে এবং অন্তঃপুরের প্রণালী অনুসারে করিলে তাহাতে কখনই যে "পেয়ারার জেলি" প্রস্তুত হইতে পারে না আমরা তাহাই বলিয়াছিলাম এবং এখনো বলিতেছি। বৃথা বাদানুবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

পেয়ারার জেলি আমাদের বা অন্তঃপুর লেখিকার উদ্ভাবিত জিনিষ নহে যে একটা যে সে রকম মনগড়া প্রণালী লিখিয়া দিলেই চুকিয়া যাইবে। "গোয়াভা জেলি" বা পেয়ারার জেলি অনেকেই খাইয়াছেন। যাঁহারা না খাইয়াছেন তাঁহারা কোন খাদ্যদ্রব্যের দোকান হইতে "Guava Jelly" ক্রয় করিয়া খাইয়া দেখিতে পারেন। দোকানে যাহা বিলাতী বোতলে "Guava Jelly" বলিয়া বিক্রয় হয় তাহা প্রকৃত পেয়ারার জেলি। কিন্তু যাহা সর্ব্ব-সাধারণে পেয়ারার জেলি বলিয়া পরিচিত সেই প্রকৃত পেয়ারার জেলির প্রস্তুত প্রণালী না লিখিয়া যদি কেবলমাত্র পেয়ারা ও চিনির পাক করিয়া তাহার অন্যায় পূর্ব্বক নাম দেওয়া হয় পেয়ারার জেলি তাহা হইলে সকলকে বঞ্চিত করা হয়।

পেয়ারার জেলিতে যে রস আবশ্যক তাহা জলের ন্যায় তরল। তাহাতে পেয়ারার শাঁস থাকিবে না। সেই জলীয় তরল রসকে জমাইতে হইবে। যেমন মাংসের জেলিতে স্বচ্ছ মাংসরসকে বরফের সাহায্যে জমান হয় সেইরূপ পেয়ারার জেলির রসও বরফের পরিবর্ত্তে অগ্নির দ্বারা জমাইতে হইবে। কিন্তু অগ্নির উত্তাপে যতই কেন জমাইতে চেষ্টা কর না কিছুতেই জমিবে না যদি ঐ পেয়ারার রসে অম্লরস ( যেমন নেবুর রস ইত্যাদি ) না পড়ে। পেয়ারার জেলি দেখিতে অনেকটা স্বচ্ছ লাল কাচের মত দেখায়। উহাতে পেয়ারার শাঁস থাকিলে ঐরূপ স্বচ্ছ দেখাইত না। কিন্তু অন্তঃপুর লেখিকা কেবল পেয়ারা-গুলি চিনিতে পাক করিয়া স্বেচ্ছামত তাহার নাম দিয়াছেন "পেয়ারার জেলি।" তিনি ইহার "পেয়ারার পাক" বা অন্য কোন নাম দিলে আমাদের কোনই কথা বলিবার থাকিত না। আমরা নিম্নে অন্তঃপুর লিখিত

প্রণালী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "পেয়ারার জেলি—প্রথমতঃ পেয়ারাগুলিকে ছাড়াইয়া একটু সিদ্ধ করিয়া নরম করিয়া লইবে। পরে একটা সরু নেকড়ায় ছাঁকিয়া বীচিগুলি ফেলিয়া দিবে। শাঁসটার সহিত চিনি মিশাইয়া জ্বাল দিবে। ফুটিতে ফুটিতে থক্‌থকে হইলে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া বোতলে রাখিবে।" এক্ষণে পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের কথা ঠিক কি না। প্রকৃত "পেয়ারার জেলি" কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা আমরা এই সংখ্যায় পুণ্যের পাঠকগণের গোচরার্থে প্রকাশ করিয়াছি।

পূর্ণিমা (চৈত্র ১৩০৭)।—"মৃত্যুর পর" প্রবন্ধ পূর্ণিমার ভাঁড়ার ঘর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেখান থেকে যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিতেছেন সবই ভাঁড়ার ঘরে আনিয়া পুরিতেছেন। এবারে "মৃত্যুর পর" প্রবন্ধে লেখক রামানুজ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কেন যে দিলেন বুঝিলাম না। বাজে আধ্যাত্মিকতা পূর্ণিমার একটী রোগে পরিণত হইয়াছে। এ রোগের জন্য ঔষধ সেবন বিধেয়। নিম্নে আমরা পূর্ণিমার চিত্র দিতেছি—এক "কালী" শব্দ আছে। পূর্ণিমা এই "কালী"কে বিচ্ছেদ করিয়া ক+আ+ল+ঈ তে পরিণত করিবেন। এবং এই ক, আ, ল, ঈ এই চারিটি অক্ষরে তিনি নিজের মন-গড়া চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড পুরিবেন তবে ছাড়িবেন। হয়ত তিনি বলিবেন ক অর্থে জল, বিষ্ণু ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপে কয়টি অক্ষরই তিনি ইচ্ছামত আজগবী অর্থ সমূহে প্রপূরিত করিবেন। এই বাজে আধ্যাত্মিকতার বন্যায় শাস্ত্রের বিশুদ্ধ সত্য সমূহ আজকাল ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা প্রকৃত সত্য ছাড়িয়া পূর্ণিমার মত শাস্ত্র বাক্যের কৃত্রিম ব্যাখা করিতে পারি না বলিয়াই পূর্ণিমা আমাদিগের কথা "বালকের কথা" বলিয়া পরিহাস করিয়া থাকেন এবং কখন কখন "পাপে পড়িবেন" ইত্যাদি বাক্যে ভয় প্রদর্শন করিতেও ছাড়েন না। কিন্তু আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তারস্বরে বলিতেছি যে তাঁহারা বুঝেন না যে তাঁহারা ঋষিদিগের বিশুদ্ধ সামগ্রীগুলির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া যেরূপ ভাবে "পাঁটাকাটা" করিতেছেন তাহাতে ঋষিদিগের সজীব মন্ত্রাদির প্রাণ একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়া মহান অনর্থের ভাগী হইতেছেন।

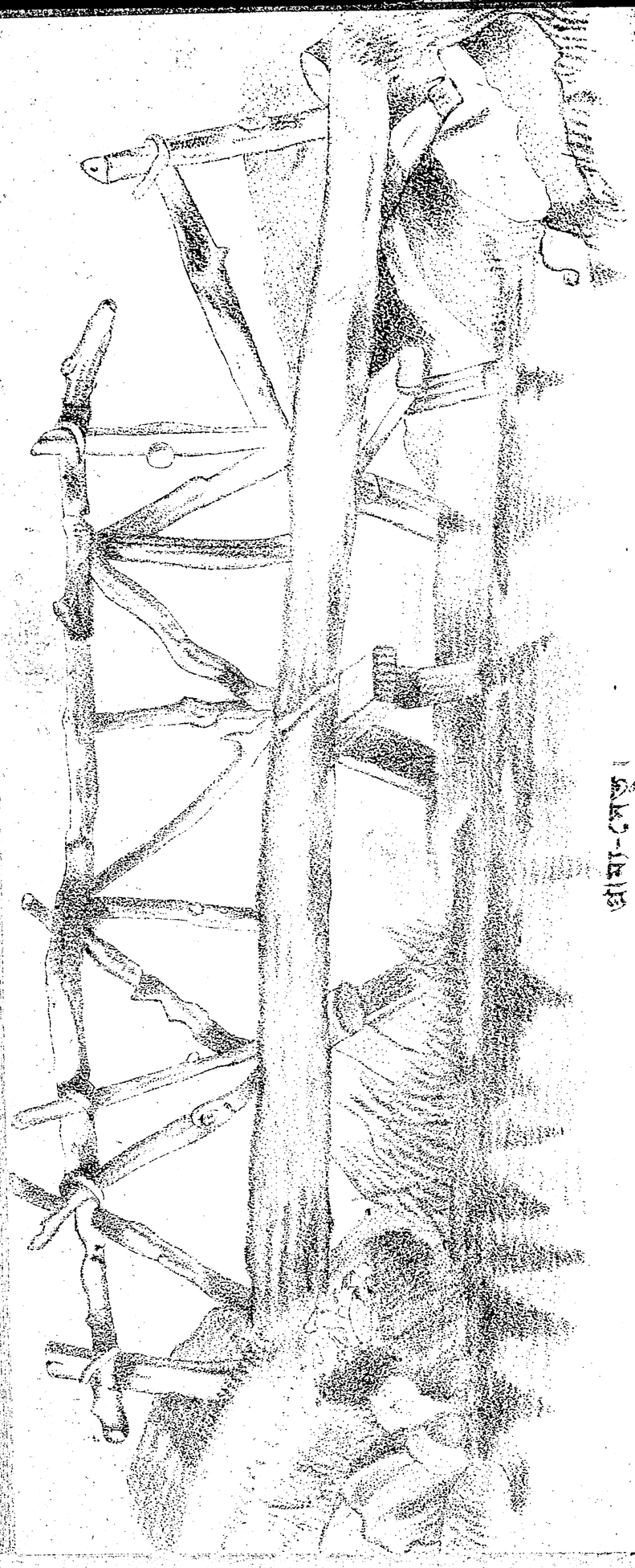

গ্রাম্য-সেতু।

Pratibha Tagore
22nd July 1879

পুণ্য

পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে

## হাবিলদার কন্দর্প সিংহের ভালবাসা।

( ফরাসিস্ গ্রন্থকার ভ্যালোয়ার গ্রন্থ হইতে। )

আমার বেশ স্মরণ হয়, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এই অদ্ভুত ঘটনাটি কানপুর সহরে ঘটিয়াছিল। সেখানকার বৃদ্ধেরা এখনও গল্প করে, সেই ব্যাপারটি লইয়া সেই সময় কত হুলস্থুল পড়িয়া যায়। এখনও সেই তরুচ্ছায় পথ দিয়া যাইতে যাইতে লোকে মৃদুস্বরে,সেই কথা বলাবলি করে।

সে দিন সন্ধ্যার সময়, কেন জানি না, আমি অত্যন্ত বিষন্ন হইয়াছিলাম! তামাকু সেবন করিয়া সেই বিষাদের ভাবটা তাড়াইবার চেষ্টা করিলাম—তামাকটা অত্যন্ত কটু বোধ হইল; মুখে রুচিল না।, ঘরের দরজা জান্‌লা দিয়া চারিদিক হইতেই যেন একটা অবসাদের বায়ু বহিতেছিল। এমন সময়ে দ্বারের নিকট একটা পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। বিরক্ত ভাবে উঠিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমার বন্ধু কন্দর্প সিং হুড়মুড় করিয়া ব্যস্ত ভাবে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। তাঁর ভাব দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। কেননা, তাঁর ওরূপ প্রকৃতিই নহে। তিনি স্বভাবতই একটু ঢিমে চালের লোক। তিনি

ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন ;—"আ বাঁচলুম, তুমি ঘরে আছ !"

আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপারটা কি ?"

—"এমন কিছু না—আমার ভয় হচ্ছিল পাছে তুমি বাহিরে গিয়া থাক, এখন তোমাকে দেখ্‌তে পেয়ে অত্যন্ত সুখী হলেম।"

—"এসো ভাই, বোসা। ভাগ্যি তুমি এলে ; ঠিক সময়ে এসেছ। আমার মনটা বড়ই খারাপ হয়েছিল। এখন তোমার সঙ্গে দু দণ্ড কথা কয়ে বাঁচ্‌ব।"

আমরা দুজনে বসিলাম।

*

* *

কন্দর্প সিংহ অশ্বারোহী সৈন্যদলের একজন হাবিলদার। যুবা বয়স ; লোকটা একটু কল্পনা-প্রিয়। তিনি কল্পনা করিতেন, সহরের তাবৎ রমণী তাঁর জন্য উন্মত্ত ; তার উপর আবার যখন এক ছিলিম চরোশ টানিতেন, তখন তো আর কথাই ছিল না। তখন তিনি যার পর নাই, গলগল ভাব ধারণ করিতেন। আর মনে করিতেন, কোন্ রমণী তাঁর সেই মনোমুগ্ধকর ভাব দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে !

কন্দর্প সিংহ দেখিতে মন্দ নহে ; মুখে বেশ রক্তের আভা আছে ; ওষ্ঠাধর রক্তিমাভ ; ঘন সন্নিবিষ্ট গুম্ফরাজি ; বন্দুক-নিন্দিত নাসিকা ; জ্বল্‌জ্বল্ নেত্রদ্বয়। যখন তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার দেহে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না, মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না, তাঁহার মনে কোনও উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে ; কেবল মনে হইল, তিনি যেন একটু শ্রান্ত ক্লান্ত। কিন্তু কন্দর্প সিংহের সেই সদর্প নারী-বিজয়ী ভাবখানাও যেন আর দেখিতে পাইলাম না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি সংবাদ ?"

—"সংবাদ আর কি ভাই—এই দেখো, কানপুর থেকে আস্‌চি।"

—"কানপুর থেকে ?"

—"হাঁ, কানপুর থেকে, ঘোড়ায় চড়ে, ২০ ক্রোশ রাস্তা খুব ছুটিয়ে এসেছি।"



—"খুব ছুটিয়ে ? তবে কি তুমি পলাতক হয়ে এসেছ ?"

—"হাঁ, প্রায় তাই।"

—"ব্যাপারটা কি, তবে, বল। শোনা যাক্ কি হয়েছে। তোমার টাকা কড়ি সম্বন্ধে "……

—"টাকাকড়ির বিষয় হলে তো বাঁচ্‌তুম—ওরকম তুচ্ছ বিষয়ের জন্য নাকি কারও মাথাব্যথা হয়।"

—"দূর কর ছাই ! শীঘ্র বলে ফ্যালো না। তবে কি ?—তুমি বুঝ্‌তে পারচ না, আমার কতটা কৌতূহল তুমি উদ্রেক করেছ। কোন মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপার ?"

—"মারামারি কি জন্য ?"

—"তা বটে, মারামারি করে তোমার ভালটা কি, তবে যদি মনে করে থাকেন ঐ এক আমোদ—তা ছাড়া, কখন কি ঘটে তা তো।"—

—"না, মারামারির ব্যাপার কিছুই না।"

—"তবে কি ?—মাথামুণ্ডু !—তবে কি ?"

—"এখন ভাই তামাসা রেখে দেও।"

—"আমি তামাসা কচ্ছিই বটে !"

—"তা ভাই কে জানে, আজকালের যে রকম ধরণ—আমার যা হয়েছে তা আমিই জানি।"

—"তা এসো ভাই দুই এক ছিলিম টানা যাক্—তা হলে তোমার।"—

—"না, ভাই, আজ এক ছিলিমও না।"

—"তবে সত্যই দেখেছ একটা কি গুরুতর ব্যাপার হয়েছে। আমি তোমাকে এমন ভাবিত হতে কখনও দেখি নি।"

—"আমি অতি নির্বোধ, তাই কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নে ; তাই তোমার কাছে আজ দৌড়ে এলুম। তোমার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তুমি বোধ হয় এই ঘটনার কিছু অর্থ বলতে পারবে। সেই ঘটনাটা আমার মনে রাতদিনই জাগ্‌চে।"

—"বল, আমি শুন্‌চি ; আমি ভাই খুব মন দিয়ে শুন্‌ব, তার জন্য ভেবো না।"

*
* *

"প্রথমেই তোমাকে একটি কথা বলি; আমার ভাই একটি বান্ধবী আছে"...

—"হুঁ! এই দুর্ব্বলতাটুকু আমার কাছে প্রকাশ করবে কি না, প্রথমে আমার একটু সন্দেহ ছিল।"

—"কিন্তু তুমি যদি এই রকম ক'রে ঠাট্টা কর!".....

—"না ভাই, হাবিলদার সাহেব, আর না; এই আমি মুখ বন্ধ করলুম। এখন বল।"

—"তা, আমার এই বান্ধবীটি অতি চমৎকার দেখ্‌তে; আর, তার প্রতি আমার যে ভয়ানক আসক্তি জন্মেছে, এ কথাও তোমার কাছে স্বীকার করচি।

তিন দিন হল, আমরা একটু ছুটি পেয়েছিলুম; ছুটির সময়টা কি করে কাটাব কিছুই স্থির করতে না পেরে, আমি, আর আমাদের পল্টনের একজন সুবেদার আমার বন্ধু, আমরা দুইজনে আমাদের বারিক থেকে বেরিয়ে পড়লুম। বেরিয়ে নদীর ধার দিয়ে বরাবর চল্‌তে লাগলুম। চল্‌তে চল্‌তে রাত্তির হয়ে পড়ল। অন্ধকার ক্রমেই বাড়তে লাগ্‌ল। তাতে আবার এই শীতকালে নদী থেকে কুয়াশা উৎপন্ন হয়ে সে অন্ধকারকে যেন আরও গাঢ় করে তুল্লে। সে এমন নিরেট অন্ধকার যে তাতে যেন ছুরি বসে।"

—"আমার বন্ধু, তুলা সিং শীতের হাওয়ায় একটু ক্লিষ্ট হয়ে আমাকে বল্লেন; "ওহে, তোমার কি এতই গ্রীষ্ম বোধ হচ্চে যে এই কন্‌কনে শীতে নদীর ধারে না বেড়াইলেই নয়? আমার তো এ বেড়ানটা বড় ভাল লাগ্‌চে না; এসো, এক কাজ করা যাক, ঐ দোকানে গিয়ে এক ছিলিম গাঁজা টানা যাক্।"

—"না, তা হবে না; আমায় দুলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে হবে।" আমার সেই বান্ধবীটির নাম দুলিয়া। "তুমি কি আমার সঙ্গে আস্‌বে?"

—তুলাসিং বলিলেন "আচ্ছা চল। একজন রূপসীর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটাতে কার না ভাল লাগে।"

সহরের প্রান্ত দেশে সেই তরুণীর নিবাস। বরাবর সেই দিকে আমরা



চলিতে লাগিলাম।

যদিও অনেকটা পথ; কিন্তু সেখানে একবার পৌঁছিতে পারিলে, আগুন পোহাইয়া পথক্লেশ দূর করা যাইবে এই আশায় ভর করিয়া শীঘ্রই গম্য স্থানে উপনীত হওয়া গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের আশা সফল হইল না।

দুলিয়া বাড়িতে নাই। বাহিরে গিয়াছে।

ভৃত্য বলিল "ঠাকরণ সহরে গেছেন—সেখানে তাঁর নিমন্ত্রণ আছে। বোধ হয় রাত্তিরটা সেই খানেই কাটাইবেন।

—এই কুসংবাদ শ্রবণ করিরা তুলা সিং বলিয়া উঠিলেন "সর্ব্বনাশ, তা হলে তো দেখ্‌ছি কোন আশা নাই—চল, তবে সেই গাঁজার দোকানে যাওয়া যাক্।"

—আমি বলিলাম "অন্য রাস্তা দিয়ে না গিয়ে, চল যে পথের দুই ধারে গাছের সারি দেখা যাচ্ছে সেই ছায়াপথ দিয়ে যাওয়া যাক্—ঐটেই সোজা পথ—ঐ পথ দিয়ে গেলে শীঘ্র পৌঁছন যাবে।

তাই যাওয়া গেল।

ঘোর অন্ধকার। তাতে ঘন কুয়াশা। পঞ্চাশ কদম যাইতে না যাইতেই দেখি আমার বন্ধু অদৃশ্য হইয়াছেন। তিনি ডাহিনে গেলেন, কি বামে গেলেন, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তবে এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় জানিলাম, আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের মধ্যে একটা কি ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে।

তাঁর নাম ধরিয়া ডাকিলাম কোন উত্তর নাই।

তাঁর কথা আর না ভাবিয়া আমি সেই দোকানের উদ্দেশে চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ কি একটা যেন আমার পায়ে ঠেকিল। জিনিসটা কি মাথা হেঁট করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম: একটা মড়া-খেগো পথের কুকুর?—না, একটা পাথর?—না, মানুষ? না জানি কি!—কিন্তু এটা যে নড়িতেছে। নেত্র বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে লাগিলাম। একি, এ যে একটা স্ত্রীলোক! পথের ভিখারিণীর ন্যায় বৃক্ষের তলায় বসিয়া আছে; যেন শীতে ক্লেশ নাই—বিজনতায় ভয় নাই—আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ নাই।

—"এখানে কি কচ্চ ঠাকরণ? কোন অসুখ করেছে?"

—ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল—"না।"

—"খোলা জায়গায় নিদ্রা যাবার এ তো উপযুক্ত কাল নয়।"

—"এখানেই হউক, অন্যত্রই হউক, আমার কি আসিয়া যায়?"

—"এই ঘোর রাত্রি, ঘন অন্ধকার—কঠোর শীত কাল—এই সময়ে এই স্থানে কেন একাকিনী? এমন অদ্ভুত ব্যাপার তো"……

—"সকল সময়ই আমার পক্ষে সমান।"

—"যদি ঠাকরণ অনুমতি করেন, আমি আপনার বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি"—একটু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস সহকারে আমি এই কথা বলিলাম।

—তিনি বলিলেন—"আচ্ছা।"

এবং তৎক্ষণাৎ তিনি ভূমি হইতে উত্থান করিলেন এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

বলিতে কি, এই অদ্ভুত ঘটনার প্রথম হইতেই আমার মনে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। এই দুরন্ত শীতে কোথায় থর থর করিয়া কাঁপিব, না আমার ললাট হইতে ঘর্ম্ম বিন্দু ঝরিতে লাগিল।

আমি কি ভাবিব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সকলই অদ্ভুত—স্বপ্নময়। বাহিরে কুয়াশা, অন্তরেও কুয়াশা, এ স্ত্রীলোকটি কে? এখনও তো ইহাঁর মুখ দেখিতে পাই নাই। দেখিলে কি বিস্ময়ানন্দ উপস্থিত হইবে? কণ্ঠস্বর যেরূপ মধুর, মুখশ্রীও কি সেইরূপ সুন্দর হইবে?

এই উপন্যাসোপযোগী ঘটনাটির পরিণাম না জানি কি হইবে?

—না জানি, কোথায় গিয়া ইহার শেষ হইবে! সুখের আশায় হৃদয় উথলিয়া উঠিল, সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা ক্রমশই প্রবল হইয়া উঠিল—এক কথায়……আরে নির্ব্বোধ!

—"হাবিলদার সাহেব, অমন করে আপনাকে ধিক্কার দিচ্চ কেন?"—আমি বলিয়া উঠিলাম। কন্দর্প সিংহ উত্তর করিলেন "কেন, তা আমিই জানি। কথাগুল শুনে যাও, একটু পরে তুমিও জান্‌তে পারবে।"

স্ত্রীলোকটি পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতেছিলেন; আমি অবাক্ হইয়া অন্যমনস্কভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলাম। অবশেষে একটা অট্টা-



লিকার সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ……কিন্তু মুখ কি করিয়া দেখা যায়?—একে অন্ধকার, তাতে কুয়াশা—তাতে আবার মুখ কতকটা কাপড়ে ঢাকা। বুঝ্‌তেই তো পার ভাই, মুখটাই হচ্চে প্রধান জিনিস।

—পাঁচ মিনিট পরে, তিনি থামিলেন। যদি জিজ্ঞাসা কর সেটা কোন্ রাস্তা, আমি তো তখন কিছুই জানিতে পারি নাই; কিন্তু আমি আর কোন বিষয় না ভাবিয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

—"এই আমার বাড়ি, ভিতরে আসবার ইচ্ছা আছে?"

এইরূপ প্রস্তাব হইবে, আমি কখন প্রত্যাশা করি নাই, আর, এমন প্রশান্তভাবে তিনি আমাকে এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আমি আগ্রহের সহিত তাহাতে সম্মত হইলাম।

আমার কৌতূহল, যার পর নাই, উদ্রিক্ত হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম, যাহাই অদৃষ্টে থাক্ ইহার শেষ দেখিতে হইবে। উঁহার মুখ না দেখিয়া আমি উঁহাকে ছাড়িতেছি না।

সেই অপরিচিতা স্ত্রীলোক বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। একটা তীব্র শব্দ বাটীর অভ্যন্তরে প্রতিধ্বনিত হইল, কবাট খুলিয়া গেল। দ্বার দেশের দুই ধারে দুইজন ভৃত্য শোকের উপযোগী শুভ্র বস্ত্রে আবৃত হইয়া আপাদমস্তক আবৃত হইয়া প্রদীপ্ত মশাল হস্তে দণ্ডায়মান।

অপরিচিতা আমার সম্মুখ দিয়া রাজরাণীর ন্যায় সদর্প পদক্ষেপে চলিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনুসরণ করিতে আমাকে ইঙ্গিত করিলেন।

মসালের আলোকে দেখিলাম, তাঁহার সমস্ত দেহ শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত।

—মুখও শুভ্র অবগুণ্ঠনে প্রচ্ছন্ন।

—"তুমি তো ভাই আমাকে চেনো, স্বয়ং যম এলেও আমি ভয় করি না। কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমার গা কেমন শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু আমি অতি কষ্টে সাহসে ভর করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

যে ঘরে আমাকে লইয়া গেল, সে ঘরটি আস্‌বাবে সুসজ্জিত। পুরু মখ্‌মলের আস্তরণ ভূতলে বিস্তৃত—তাহার উপর লেশমাত্র পদশব্দ শোনা যায় না। একটি ঘড়ির উপর আমার চোখ্ পড়িল, দেখিলাম দ্বিপ্রহর রাত্রি

অতীত হইয়াছে।

কর্ত্রীর ইঙ্গিতমাত্রে, ভৃত্যেরা বড় বড় মোমের বাতি ঘরে জ্বালাইয়া উপ-ছায়ার ন্যায় নিঃশব্দে চলিয়া গেল। সেই ক্ষীণপ্রভ, চঞ্চল-শিখা দীপাবলী মৃদু আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল।

আমি আর সেই অপরিচিতা রমণী! ঘরে আর কেহই নাই!

আমি স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে হইল না। অপরিচিতা ইঙ্গিত করিয়া একটি সিংহাসনে তাঁহার পার্শ্বে আমাকে বসিতে বলিলেন এবং তাহার পরেই তাঁহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন।

তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া আমি একেবারে বিমোহিত হইলাম, আমার নেত্র যেন ঝলসিয়া গেল। এই প্রদীপ্ত মুখচ্ছবি দেখিবামাত্র আমার পূর্ব্বানুভূত ভয় কাল্পনিক বলিয়া মনে হইল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সে সমস্ত কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ভাইরে, কি আর বল্‌ব—তাকে দেবী বল্‌তে পার, দানবী বল্‌তে পার—তুমি যা ইচ্ছা তাকে বল্‌তে পার—কিন্তু এমন সুন্দরী রমণী আমি জীবনে কখন দেখি নাই!

এখন জান্‌তে চাও, আমাদের মধ্যে কি হল? তোমার দিব্য, আমি কিছুই জানি না। এই পর্য্যন্ত মনে আছে, তাঁহার হস্ত যখন পীড়ন করিলাম, তখন মনে হইল যেন মর্ম্মর প্রস্তর চাপিয়া ধরিয়াছে। আরও মনে পড়ে, যে নেত্রের দৃষ্টি অমন মধুর, সে নেত্র যেন স্থির ও অচল ছিল; কিন্তু তিনি এমন একটি কোমল দৃষ্টির সহিত স্বাভাবিক ভাবে আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন, যে আমার মনে হইল তিনি যেন আমাকে ভালবাসিয়াছেন। এইরূপ মনে হওয়ায় আমি তখনই জানু পাতিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম। এইরূপ ভাবে কতকক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। কিন্তু তখন মনে হইয়াছিল, চির জীবন বুঝি এইরূপ ভাবেই থাকিব। আমি আনন্দে মরিয়া যাইতেছিলাম—এক অজ্ঞাত অপূর্ব্ব উন্মত্ততা আসিয়া এই জগতের সীমা ছাড়াইয়া যেন আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে। হঠাৎ ঘড়িতে একটা বাজিয়া উঠিল।

এই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘড়ির রুক্ষ নিনাদ শ্মশানের হুঙ্কার বলিয়া মনে



হইল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম, কেন তা জানি না। পিছনের দেয়ালের দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, যে সকল বড় বড় আয়না ছিল সমস্ত সাদা কাপড়ে আবৃত হইয়া গিয়াছে—বিচিত্র বর্ণের পর্দাগুলি সাদা হইয়া গিয়াছে—এবং মোমের বাতিগুলি আস্তে আস্তে নিবিয়া যাইতেছে।

এই ছায়াবাজির খেলা দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলাম, আমার সেই অপরিচিতা রমণীকে খুঁজিতে লাগিলাম—জন প্রাণী কেহই নাই! ভৃত্যেরা?—তারাও নাই! আমি দ্বারের দিকে ছুটিলাম!.....

রাস্তার ধারের দিকের দরজাটা খুলিয়া গেল—আমি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম—এই ভুতুড়ে বাড়ির মধ্যে কি করিয়া প্রবেশ করিলাম, কি করিয়াই বা সেখান হইতে বাহির হইলাম এখন কিছুই বুঝিতে পারি না।

* * *

অত্যন্ত ঘাম হইয়াছে; কপালের ঘাম মুছিব মনে করিয়া রুমাল বাহির করিতে গেলাম, দেখি, রুমাল নাই।

এই অদ্ভুত ব্যাপারটার রহস্য কি, জানিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল; মুক্ত বায়ুতে আসিয়া আমার মনেরও চাঞ্চল্য অনেকটা দূর হইল; তখন আমার তলবারটা খাপের মধ্য হইতে বাহির করিলাম এবং সেই রহস্যময় অট্টালিকার দেয়ালের উপর তলবার দিয়া খুব একটা গভীর রেখাপাত করিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিলাম এবং যে রাস্তার উপর বাড়িটি অবস্থিত তাহাও মনে করিয়া রাখিলাম।

তুমি তো ভাই বুঝ্‌তেই পারচ, এতটা হাঙ্গামের পর একটু বিশ্রাম—একটু বিজনতার আবশ্যক। তাই আমার গৃহে প্রবেশ করিলাম।

তার পর দিন, তুলারাম সিংকে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা যখন বলিলাম, সে এক তুড়িতে সব উড়াইয়া দিল। আমি বলিলাম সেই বাড়িতে আমি তাকে লইয়া যাইব, সে আমাকে পাগল ঠাওরাইল। যা হোক্ অনেক বলায় সে আমার সঙ্গে যাইতে অবশেষে সম্মত হইল। আমি ইতিপূর্ব্বে একটি ছুরপনেয় চিহ্ন দিয়া আসিয়াছিলাম, সুতরাং সে বাড়ি চিনিতে এখন আমার আর কোন কষ্ট হইল না।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই বাড়িতে পৌছিয়া দেখিলাম, জান্‌লা খড়খড়ি সমস্ত আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ—কবাটের কব্জায় মরিচা ধরিয়াছে; সমস্ত রকম-সকম দেখিয়া একটা পোড়ো বাড়ি বলিয়া মনে হইল। দরজায় ঘা দিলাম ভিতর হইতে কোন উত্তর নাই। অবশেষে বিরক্ত ও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া খুব সোর-সরাবৎ আরম্ভ করিলাম। তাহা শুনিয়া পাশের বাড়ির একজন লোক আপন বাটীর জান্‌লা খুলিল। এবং আমাকে বলিল;—

—"কাকে খুঁজ্‌চেন?"

—"এই বাড়িতে একটি স্ত্রীলোক থাকেন"—

—"দুই বৎসর হইল তিনি মারা গিয়াছেন; সেই পর্য্যন্ত এই বাড়ি খালি পড়ে আছে।"

—"অসম্ভব!"

—"যদি বাড়িটা খরিদ করবার অভিপ্রায়ে এসে থাকেন তো ১২ নম্বরের বাড়িতে যান; সেখানে একটি ভদ্রলোক থাকেন, তিনি সমস্ত সন্ধান বলে দিতে পারবেন।" এই উপকারটুকু পেয়ে আমি তাঁকে সেলাম করলুম, তিনি আবার জান্‌লা বন্ধ করলেন। আমি তখনই সেই ১২ নম্বরের বাড়িতে গেলাম। কোন রকম করে এই রহস্যটার উদ্ভেদ করিতেই হইবে।

আমরা দুই বন্ধু সেইখানে উপস্থিত হইলে পর ঐ পোড়ো বাড়িটা খরিদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তাহাতে, অমুক অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আমাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন।

—"সওদাটা খুব ভাল; আর বাড়িটা মধ্যে গিয়ে যদি একবার দেখেন"—

—"বাড়ির মধ্যে গিয়েছি।"

—কি! ভিতরে গিয়াছেন!" এই কথা বলিয়া সবিস্ময়ে আমার দিকে ফিরিলেন; "আমি নিজেই যে এই ছয় মাস তার চৌকাঠ মাড়াইনি—আর, সে বাড়ির চাবি আমার কাছে—আমার সিন্ধুকে বন্ধ· ··তবে যদি····· মাপ করবেন মহাশয়, আপনি বুঝি গৃহকর্ত্রীর মৃত্যুর পূর্ব্বে গিয়েছিলেন?

—"কাল রাত্তিরে আমি সেখানে গিয়েছি—কিছু না হবে তো দুই ঘণ্টা ধরে একটি সুন্দরী রমণীর সঙ্গে একত্র ছিলুম।

অমুক—সহসা আমার বন্ধুর দিকে একবার তাকাইলেন—অর্থাৎ আমি



প্রকৃতিস্থ কি না সে বিষয় নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন।

তাঁহার ভ্রম আমি বুঝিতে পারিলাম, এবং তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য বাড়ির তন্নতন্ন বিষয় বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিলাম।

—"আমি বুঝেছি মশায়, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস কচ্ছেন না, কিন্তু আমি ইহার একটা প্রমাণ দিতে পারি। সেই বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় আমার রুমাল সেখানে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। যদি সেইখানে গিয়া সেই রুমালটা আবার পাই—তাহলে আপনি কি বলেন?

—"কি আর বল্‌ব,—তাহলে আপনি যে দাম বল্‌বেন সেই দামেই বাড়িটা আপনাকে বিক্রী করব।"

—তুলারাম সিংহকে চুপি চুপি বলিলাম—"অমনি দিলেও লই না।"

অমুক—আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন—আমরা একত্র সেই বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অমুক—মাকড়শার জালে ঢাকা দ্বার-লগ্ন তালার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জয়োল্লাস প্রকাশ করিলেন।

—"এখন ফিরে যাবেন?"

—"না—এখনও না!"

—"কিন্তু এই দরজা ছয় মাস ধরে খোলা হয় নি।"

—"আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বল্‌চি, আমি কাল এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছি।"

অবশেষে আমরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

সমস্তই পোড়ো বাড়ির মত। দেয়াল ছাতা-ধরা; মেঝে ধুলোয় ভরা; ছাদ ফুটো-ফাটা; সিঁড়ি পর্য্যন্ত ঘাসে আক্রান্ত। কিন্তু সেই বড় দালান-ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রথমেই আমার রুমালটা নজরে পড়ল। রুমালটা সেই সিংহাসনের উপর ছিল!·····

—"যা ঘটেছিল সমস্তই তো তোমাকে ভাই বল্লুম, এখন তোমার কি মনে হয় বল দেখি?"

—"হাবিলদার, তোমাকে কি কখন নিশিতে পায়?"

—"তা তো আমি কখনও টের পাই নি।"

—তুমি কি·····কি করে বল্‌ব?····· তোমার বন্ধুর সঙ্গে একত্র যখন

বারিক থেকে বেরিয়েছিলে— দুই এক দম্……?

—"উঁহুঁ—তা তো কৈ মনে হচ্ছে না।"

—"আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মনে করে দেখ দিকি। তুমি চীৎ হয়ে শুয়েছিলে কি না? চীৎ হয়ে শোয়ার দরুণ তুমি এই রকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে থাক্‌বে। সেই স্বপ্নের ভাবটা এখনও তোমার মনে থেকে যাচ্ছে না।"

ইহার ছয় মাস পরে হাবিলদার কন্দর্প সিংহ ভারতবর্ষের কোনও সীমান্তবর্ত্তী বন্যজাতির সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েন। আমার প্রশ্নের উত্তর আর পাইলাম না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

---

# বর্ণভেদে জীবরক্ষা।

——:++:——

হংসা শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স দেবস্ত্বাং প্রসীদতু॥

যিনি হংসকে পবিত্র শুভ্রবসনে আচ্ছাদিত করিয়াছেন, যাঁহার আদেশে শুকপক্ষী হরিৎবসন লাভ করিয়াছে এবং যিনি ময়ূরকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন, সেই পরমদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বর্ণভেদে যে জীবরক্ষা হয়, তাহা আর ভারতবাসীকে বিস্তৃত ভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ভারতবাসী প্রত্যেক পদে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতেছেন। বেদে দেখা যায় যে শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়ের প্রভেদ করা হইয়াছে—শ্বেতকায় আর্য্য এবং কৃষ্ণকায় অনার্য্য। আর্য্যদিগের প্রাণপণ চেষ্টা অনার্য্যদিগের সমূলে বিনাশ, আবার অনার্য্যদিগের প্রাণপণ চেষ্টা আর্য্যদিগের বিনাশ সাধন। বলা বাহুল্য যে উন্নত আর্য্যগণ অনার্য্যদিগেরই বিনাশ সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তবে, উহারই মধ্যে যে সকল অনার্য্য হয় তো আর্য্যদিগের মত শ্বেতকায় অথবা আর্য্যদিগের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের



আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিল, কতকস্থলে বা আর্য্য ভ্রম করিয়া, এবং অধিকাংশ স্থলে অনার্য্যদিগকে অধীনে রাখিলে নিজেদেরই উপকারের সম্ভাবনা বলিয়া আর্য্যেরা সেই সকল অনার্য্যদিগকে বিনাশ হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে "History repeats itself" অর্থাৎ ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন হয়—এক সময়ে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, বহুকাল পরে আবার সেই প্রকার ঘটনা সমূহের পুনরভিনয় দৃষ্ট হয়। বৈদিক কালে আর্য্য ও অনার্য্যের, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের জীবনসংগ্রাম ঘটিয়াছিল, আজ তাহার সহস্র সহস্র বৎসর পরেও সেই জেতা ও বিজিতের জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। আমাদিগের জেতা ইংরাজদিগের অধিকাংশই শ্বেতকায় এবং বিজিত ভারতবাসীর অধিকাংশই কৃষ্ণচর্ম্ম। কাজেই সেই আবার শ্বেতচর্ম্ম ও কৃষ্ণচর্ম্মে সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। তবে যে সকল ভারতবাসী ইংরাজের ন্যায় শ্বেতচর্ম্ম ও ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও ভাষা প্রভৃতি অনুকরণ করেন, তাঁহারা স্বভাবতই অনেকস্থলেই জীবনসংগ্রামের হাত এড়াইয়া জেতার প্রাপ্যের টুক্‌রোটাক্‌রা পাইয়া থাকেন। অনুকরণ যত সম্পূর্ণ হইবে, ভারতবাসী জেতা ও বিজিতের মধ্যে জীবনসংগ্রামের হাত ততই এড়াইতে সক্ষম হইবে। আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ ভাষা, নাম ধর্ম্ম এবং সর্বাগ্রে চর্ম্ম, এই সকলে যিনি ইংরাজের যত অনুকরণ করিতে পারিবেন, তিনি তত জীবনসংগ্রামের অতীত হইয়া সংসারের সুখ সকল উপভোগ করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই—ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের সম্মুখে ঘটিতেছে। এই দুইটী দৃষ্টান্ত হইতে বর্ণমাহাত্ম্য সুন্দর উপলব্ধ হইবে আশা করি।

এই বর্ণবৈষম্য আমরা অবশ্য পছন্দ করি না, কারণ ইহার ফলে আমাদিগকে অনেক স্থলে বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু বলিলে কি হইবে—প্রকৃতিতে যে বর্ণভেদ ওতপ্রোত আছে। ইংরাজদিগের এক প্রকার রং, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের অন্য প্রকার রং। অবশ্য এই বর্ণের তারতম্যবশতই বলিতে গেলে আদিম অধিবাসীদিগের সমূলে বিনাশ সাধন হইয়াছে, কিন্তু তাহার উপায় কি? কাঁচা জিনিষের রং এক প্রকার, পাকা জিনিষের রং আর এক প্রকার। বর্ণবৈষম্য না থাকিলে আমরা কাঁচা ও

পাকা জিনিষের প্রভেদ বুঝিতে পারিতাম না এবং সুতরাং জগতের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইত। সামাজিক বর্ণবৈষম্য ভাল কি মন্দ তাহা এস্থলে বিচার করিতেছি না, তবে প্রকৃতিতে যে বর্ণবৈষম্য আছে এবং বর্ণবৈষম্য জন্যই যে অনেকস্থলে সামাজিক বৈষম্য, সেইটুকুই বলিতে চাহি। তবে মোটের উপর এইটুকু বলিলে দোষ হইবে না বোধ হয়, যে বৈষম্যের ফলেই জগতের এই বিচিত্রতা ও উন্নতি। বৈষম্য না থাকিলে সকলই একাকার হইয়া যাইত, এবং সুতরাং জগতসংসারের অস্তিত্বেরই অভাব ঘটিত।

যাইহৌক্, আমরা সামাজিক বর্ণভেদ বিষয়ে বর্ত্তমানে হস্তক্ষেপ করিব না; প্রকৃতিতে সত্য সত্য যে বর্ণপ্রভেদ দেখিতে পাই, রংয়ের পার্থক্য দেখি, এবং তাহাতে যে প্রকারে জীবরক্ষা হয় তদ্বিষয়েই আলোচনা করিব। জীবনসংগ্রাম বল, পরিবৃত্তিই বল আর বর্ণভেদই বল, মূলে ভগবানের ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছার অতীত হইয়া এক নিমিষও পড়িতে পারে না। সেই ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছাতে প্রলয়ের অন্ধকার ভেদ করিয়া এই সূর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল—"না ছিল এসব কিছু আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি, ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল জয় জয় মহিমা তোমারি।" আবার সেই ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছাতে সূর্য্যকিরণের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণবৈচিত্র্যও আবির্ভূত হইল। ভগবান যে এক ইঙ্গিতে কত কার্য্য সাধিত করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে? যে মাধ্যাকর্ষণের বলে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি অসংখ্য জগতের পরিভ্রমণ নিয়মিত হইতেছে, তাহারই ফলে ওজনেরও কার্য্য নিয়মিত হইতেছে, আবার ঔষধ বল, যন্ত্রাদি বল, সকলই ওজনের দ্বারা নিয়মিত হইয়া মানবের রক্ষাসাধনে নিরত রহিয়াছে। সেইরূপ ভগবানের বর্ণভেদের এক ইঙ্গিতে কত কার্য্য সাধিত হইতেছে! আমরা তো প্রত্যক্ষই করিতেছি যে পুষ্প কীট, পশুপক্ষী প্রভৃতিকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ঈশ্বর সংসারের কীট মর্ত্ত্য মানবের চক্ষুকে অন্তত ক্ষণকালের জন্য সংসার হইতে ফিরাইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ডার্বিন, ওয়ালেস প্রভৃতি মহাপুরুষ প্রমাণাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন যে এই বর্ণভেদ জীবসমূহের জীবন রক্ষার হেতুও বটে।

জড় পদার্থেও আমরা বর্ণভেদের বিশেষ পরিচয় পাই। বলা যায় না যে সূক্ষ্মভাবে ইহাদের মধ্যের প্রাণ বিরাজমান কি না। হীরক প্রভৃতি যে জলের



সংঘর্ষণে কয়লার পরিণতি তাহা সিদ্ধান্ত—ইহা হইতে কি বলা যায় না যে কোন অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য ভগবানের ইচ্ছায় কয়লা নিজের সুবিখ্যাত কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলের শ্বেত পরিচ্ছদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা অবশ্য সামাজিক বর্ণভেদের ন্যায় জড়পদার্থেরও বর্ণভেদ আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিলাম। প্রাণন কার্য্যের ফলে যে বর্ণবৈচিত্র্য উৎপাদিত হয় তদ্বিষয়েরই আলোচনা করিব—এক কথায়, বর্ণবৈচিত্র্যের ফলে জীবের অভিব্যক্তি কিরূপে সাধিত হইতেছে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য।

ধরিতে গেলে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের জীব প্রাণপঙ্ক জীবাদি। তাহার মধ্যে যে বর্ণভেদ কতদূর কার্য্য করিতেছে, সে বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। জীব যতই উন্নতির পথে অভিব্যক্ত হইবে, ততই স্বভাবত তাহাদের বর্ণপ্রভেদও বিশেষরূপে আকৃতিমান হইবে এবং সুতরাং আমাদেরও চক্ষুগোচর হইবে ও আমাদের তদ্বিষয়ে আলোচনা ও পরীক্ষার সুবিধা হইবে। জীবাদি অভিব্যক্তিকালে দুইটী পথ অবলম্বন করিয়াছে দেখা যায়—এক, জীবাদি হইতে চিংড়ী, কাঁকড়া, কচ্ছপ প্রভৃতি সাগরিক জীবের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান মানবের অভিব্যক্তি; দ্বিতীয়, জীবাদি হইতে পত্র পুষ্প প্রভৃতির মধ্য দিয়া মানবের অভিব্যক্তি। এই উভয়ের সন্ধিস্থল সিদ্ধান্তরূপে এখনও নির্ণীত হইতে পারে নাই। পুষ্প পত্র হইতেই আমাদের আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। এই দুর্বাঘাস ও মুতা ঘাসের যে বর্ণপ্রভেদ আছে তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়। মুতাঘাসের বর্ণ দুর্বা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হরিৎ। আমরা ইহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে গরু ছাগল প্রভৃতি সহজে মুতা খাইতে চায় না, তবে অবশ্য নেহাৎ দুর্বাতৃণ না পাইলে খাইতে বাধ্য হয় অথবা দুর্বাঘাসের সঙ্গে মিশাইয়া দিলেও খাইতে যে বিশেষ আপত্তি করে তাহা নয়। মুতার শিকড়ের রস কবিরাজী মতে ধারক, বোধ হয় সেই কারণে তৃণভোজী পশু দুর্বার কাছে ইহা পছন্দ করে না। ইহাও বোধ হয় অনেকেরই লক্ষ্যস্থলে আসিয়াছে যে বিড়াল কুকুর প্রভৃতি মাংসভোজী পশুগণ উদরাময় হইলেই তাড়াতাড়ি মুতার ঘাস চিবাইয়া খায়। আমরা বুঝিতেছি যে, যে কারণেই হউক ভগবানের ইচ্ছা মুতা ঘাসের রক্ষা সাধন; তাহার উপায় হইল বর্ণ-

প্রভেদ। মুতা যদি তৃণভোজী পশুদের সম্মুখে আপনার পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার রক্ষা সাধন নিশ্চিত। এখন দুর্বাঘাস ও মুতাঘাস দেখিতে প্রায়ই একপ্রকার, মুতাঘাস একটু লম্বা চওড়া ও অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর হরিদ্বর্ণ। এখন দুর্বাঘাসের মধ্যে মুতা রোপণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে অল্পদিনের ভিতর মুতা খুব বড় হইয়া উঠে ও দুর্বা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পরিচয়যোগ্য বর্ণ ধারণ করে। ফলে এই দাঁড়ায় যে একদিকে গরু ও ছাগলে দুর্বাঘাস খাইয়া তাহাকে হীনবীর্য্য এবং জীবনসংগ্রামে অক্ষম করিয়া তুলে, অপর দিকে মুতাঘাস সেই অবসর পাইয়া দুর্বাঘাসের প্রাপ্য রসে পরিপুষ্ট হইয়া যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই তৃণচারী পশুদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করত নিজের রক্ষা ও বংশবিস্তৃতি সাধন করে। আমি দেখিয়াছি যে এই উপায়ে আমাদিগের বাটীর একটী মাঠে দুর্বাঘাস সমুদয় মরিয়া গিয়া মুতাঘাসের মাঠ করিয়া রাখিয়াছে।

সচরাচর ঘাস পাতা প্রভৃতির বর্ণ অনেকটা এক প্রকার হওয়াতে বর্ণ-বৈষম্য ও তাহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ হয় না এবং তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিতেও তত সুবিধা হয় না। কিন্তু ফুলের বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়া কে না মুগ্ধ হইয়াছে? বসন্তকালে যখন পর্বতের গায়ে ফুলেরা কার্পেট বিছাইয়া খেলা করে, তখন কাহার প্রাণ না তাহা দেখিয়া উদাস হয়, কে না তখন তুচ্ছ ধূলিময় সংসারের বিষয়ে বন্ধন মুহূর্ত্তের মধ্যে কাটিয়া মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে চাহে? কিন্তু মনের অপূর্ব আস্বাদপ্রদ এই বর্ণবৈচিত্র্যও সাধিত হইয়াছে এক বিশেষ প্রণালী অবলম্বনে—সেই প্রণালী মূলত জীবনসংগ্রাম। ইহা সকলেই জানেন যে ফুল হইতে ফল হয়, ফলের বীজ হইতে গাছ হয়। সুতরাং ফুলগুলি প্রকৃত পক্ষে বংশরক্ষার প্রথম উপায়, সন্তান-উৎপাদক ইন্দ্রিয় মাত্র। ফুলের ভিতর হইতে শুঁড়ের মত কতকগুলি শুঁয়া দেখা দেয়, সেই শুঁয়ার উপরে পরাগের থলি থাকে। আর, সেই শুঁয়ার সমষ্টির ভিতরে বীজ-যোনি এবং সেই বীজযোনির উৎপত্তিস্থলে বীজগর্ভ থাকিতে দেখা যায়। যে সকল ফুলে শুঁয়া-রূপ লিঙ্গ ও বীজযোনি পাশাপাশি থাকে, তাহাদের বিষয়ে বিশেষ ভাবিবার থাকে না, শুঁয়ার পরাগ একটু নাড়া পাইলেই যোনিতে পড়িয়া বীজের জন্মদান করে। কিন্তু কয়েকজাতীয় ফুলের লিঙ্গ ও



যোনি পৃথক্ পৃথক্ সময়ে যৌবনোপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন একই জাতীয় এক ফুলের পরাগ অপর ফুলের যোনিতে প্রজাপতি প্রভৃতি কীট পতঙ্গ দ্বারা লইয়া যাওয়া আবশ্যক হয়। আর যে জাতীয় ফুলের স্ত্রী ও পুরুষ-ভেদ পৃথক্ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, বলা বাহুল্য যে সে ফুলের সন্তানোৎপাদন জন্য পতঙ্গাদির সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

এখন দরকার হইল পুরুষ ফুলের পরাগ-বীর্য্য স্ত্রীপুষ্পের যোনিতে নিষেক—ইহারই জন্য জীবনসংগ্রাম প্রণালীর সাহায্যে এই বর্ণবৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি। রজনীগন্ধা, কামিনী প্রভৃতি শ্বেত পুষ্প সকল অধিকাংশই রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয়। ইহারা যে কেন সাদা হইল, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই বটে, কিন্তু আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে কোন কারণ বশত জীবন-সংগ্রামের ফলে সাদা হইয়াছে। এখন এই সাদা ফুলের স্থায়িত্ব ইচ্ছা করিলে ইহার বংশবৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। রাত্রিতে আঁধারের ছায়ার ভিতর সাদা রঙ্গের ফুলগুলি নীল আকাশের মধ্যে তারকারাজির ন্যায় পরিদৃষ্ট হয় এবং রাত্রিচর ধেপ্‌সো তসরে পোকার (moth) দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তসরে পোকা সাদা ফুল সমূহের বংশ বৃদ্ধির সহায়তা করে। যদি সেই শ্বেতকায় পুষ্প সমূহের কোনটী কোন কারণে অন্য বর্ণ লাভ করে, তাহা হইলে হয়তো তসরে পোকাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না এবং সুতরাং সেই বিভিন্ন বর্ণের পুষ্পের বংশবৃদ্ধির অভাবে বিলোপসাধনেরই সমূহ সম্ভাবনা। আবার যদি সেই পুষ্পটীর বর্ণ এরূপ হয় যে তসরে পোকা ব্যতীত অপর কোন জাতীয় পোকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইলে বংশবৃদ্ধি হইবার এবং সুতরাং সেই বিভিন্ন বর্ণের বিশেষ শ্রেণীর আবির্ভাব হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। গোলাপ ফুলের ন্যায় টুকটুকে লাল ফুলগুলি প্রজাপতিদের প্রিয় এবং হলদে রঙ্গের ফুলগুলি মক্ষিকাদেরই প্রিয় হইতে দেখা গিয়াছে। লাল ফুলগুলির গর্ভ-নিষেক পক্ষে তসরে পোকার ক্ষুদ্র শুঁড়ে কিছু হয় না, প্রজাপতিদের লম্বা শুঁড় কাজে লাগে। ভগবানের নিয়মে কাজেরও সুবিধা—তসরে পোকাদের লালফুলের উপর বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না, আবার প্রজাপতিদেরও সাদা ফুলে বসিয়া তসরে পোকার উপযুক্ত কার্য্যে বৃথা সময় নষ্ট করিতে হয় না। এমন অনেক ফুল আছে যাহাদের গর্ভধারণ হইলেই

বর্ণ বদলাইয়া যায় —গর্ভনিষেকে সাহায্যকারী কীট গুলি আর সেই গর্ভি
পুষ্পে না বসিয়া অন্য পুষ্পে চলিয়া যায়—প্রকৃতির কি চেষ্টা যে একবি
সময় ও পরিশ্রম কাহারও ব্যর্থ না যায়! তবেই দাঁড়াইতেছে যে জীব
সংগ্রামে যে পুষ্পের যে বর্ণ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাতেই আমরা অপর্য্য
তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।

কীট পতঙ্গের বর্ণবৈচিত্র্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা—জীবনসংগ্রামে
কীট সমূহের বর্ণবৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে, তাহাতেই আমরা কত না আশ্চ
হই। কিন্তু ডার্বিন, ওয়ালেস প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক প্রচারের পূর্ব্বে এ
অপূর্ব্ব বিজ্ঞানকথা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল বলিলেও চলে। আমা
বেশ মনে পড়ে যে ছেলে বেলায় আমরা যখন ভোরে বাগানে ফুল তুলি
যাইতাম, তখন পাতার নীচে, ফুলের ভিতরে সবুজ, লাল, সাদা প্রভৃ
মাকড়সা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম এবং পাঁচজনকে ডাকিয়া দেখাইতা
তখন এই রকম বুঝিয়াছিলাম যে বিভিন্ন বর্ণের মাকড়সা ভগবান সৃষ্টি করি
ছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কারণ অথবা প্রণালী আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছি
অভিব্যক্তিবাদ তখন এতটা প্রচলিত হয় নাই যে তাহা আমাকে কেহ বুঝা
দিবার ভার গ্রহণ করিবে। এখন পাশ্চাত্য মহাত্মাদিগের কৃপায় সে প্রণা
অবগত হওয়াতে বুকের উপর হইতে যেন শত মণ ভারী পাথর খসিয়া গিয়াছে
মাকড়সাদিগের এইরূপ বিভিন্ন বর্ণের আচ্ছাদন পাইবার মূল কারণ জীব
সংগ্রাম। জীবনসংগ্রামে যে কোন উপায়ে বাঁচা দরকার। বাঁচিতে গেলে
দুর্বলের পক্ষে সবলের অনুকরণ আবশ্যক; বলপূর্ব্বক শীকার করিয়া অথবা
কৌশল দ্বারা স্বীয় বাসায় শীকার আনয়ন করিয়া আহারের বন্দোবস্ত
আবশ্যক। মকমলে ফুলের পাতার পেট ও পিট লাল, কিন্তু পাতার ধারে
একটী সাদা রেখা। তাহার ঠিক ধারে ছোট মাকড়সা বসিতে দেখিয়াছি,
তাহার পিট সাদাটে (দুধের মত সাদা নয়), ফুলের ধারের সঙ্গে একই রেখা
দেখায় এবং পেট রক্তাভ, ফুলের পাতার পিঠের লালের সঙ্গে একেবারে
মিশাইয়া যায়। আমি সহজে দেখিতে পাই নাই, জোরে পাখার বাতাস
দেওয়াতে যখন একটু নড়ে উঠ্‌ল, তখন বুঝিতে পারিলাম যে এটী একটী
মাকড়সা। এই যে ফুলের পাতার অনুকরণ, ইহাতে দুইটী পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য



ল হইতেছে—এক, পাখীতে ফুলের পাতা ভাবিয়া সহজে ধরিতে যাইবে
, দ্বিতীয়ত মাছি প্রভৃতি মাকড়সার শীকার সকল ফুলের পাতা ভ্রমে নিজে
াসিয়া ধরা দিবে,। এইখানে একটী সমস্যা আমার মনে উদিত হইতেছে
হা বলিয়া রাখি। অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেন যে অনুকরণের ফলে অথবা
ন্য কোন কারণে এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধন এক আধ বৎসরের কর্ম্ম নহে,
কোটী কোটী বৎসরের, অন্তত সহস্র সহস্র বৎসরের সঞ্চিত। কিন্তু আমি
জ্ঞাসা করি যে এই মকমলে ফুল প্রতি শীত ঋতুতে নূতন করিয়া রোপিত
য়, তখন এই মাকড়সার অথবা তাহার পূর্ব্বপুরুষের পরিবর্ত্তন সঞ্চয় করিবার
বকাশ কোথায়? যখন সেই ফুল গাছসমেত তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়
সেই গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুকালে সেই প্রকার মাকড়সার অস্তিত্ব দেখা যায়
া কেন? আমার বোধ হয় যে এইরূপ অনুকরণজনিত পরিবর্ত্তন লাভ
করিতে খুব বেশী সময় দরকার হয় না—বহুরূপীর ন্যায় অন্যান্য কীটপতঙ্গেরও
বোধ হয় কতকটা নিজের বর্ণপরিবর্ত্তনের ক্ষমতা আছে।

অনেক মাকড়সার শরীরের গঠন পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত দেখিয়াছি। এইরূপ
পরিবর্ত্তন অবশ্য অস্থিপরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে এবং অস্থিপরিবর্ত্তন যুগ-
যুগান্তরের কমে স্থায়ী হইতে দেখা যায় নাই। কাল ছোট পিঁপড়ের শ্রেণীতে
একটী মাকড়সাকেও যাইতে দেখিয়াছি—কিছুতেই চেনা যায় না, চলনে
একটু পার্থক্য দেখিয়া ধরিলাম। বাঙ্গালী সাহেবী শ্বেতচর্ম হইলেও এবং
সাহেবী পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও চলনচালনে একটু যেমন খোঁচ থাকিয়া
যায়, পিপড়ার মাঝে মাকড়সারও তদ্রূপ। অনুকরণে এতদূর সাদৃশ্য লাভ
করিয়াছে যে সন্দেহ দূর করিবার জন্য মাকড়সাকে একটা কাঠির
আগায় তুলিয়া ধরিতে হইয়াছিল, যখন তিনি স্বরচিত জালের সিঁড়ি অবলম্বনে
অবতরণ করিলেন, তখন সন্দেহ দূর হইল। আমরা যে দেশবিদেশে গিয়া
কীটতত্ত্বের অনুসন্ধান করিব, সে আশা করা বৃথা—এদেশে এমন সভা আজও
হয় নাই যাহা হইতে সাহায্য পাইতে পারি, আর গবর্ণমেণ্টের নিকটেও
সাহায্য প্রত্যাশা করা বৃথা, কারণ তাহার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা এদেশে
নাই। কাজেই আমাদিগকে বাগান, পুকুর, মাঠ এই সকলে অনুসন্ধান
সীমাবদ্ধ করিতে হয় এবং এই সকল স্থানে মাকড়সা প্রভৃতি ধরিয়া অনুসন্ধানের

কিছু সুবিধা দেখা যায়। মাকড়সার জাল প্রস্তুত করিবার আবার চমৎকারিত্ব কত—জাল এমন স্থানে করিয়া অনেক মাকড়সাকে তাহার মধ্যস্থলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি যে প্রথমে হঠাৎ বোধ হয় যে এরূপ ভাবে নিজেকে প্রকাশ করিয়া লাভ কি। পরে বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে গাছের অথবা যে বস্তুর উপর তন্তু রচনা করিয়াছে, সূর্য্যকিরণের প্রতিফলনে ঠিক সেই গাছের ফুলের কুঁড়ি অথবা সেই বস্তুর ন্যায় মাকড়সাকে দেখায়, ঠিক এরূপ স্থানে বুঝিয়া তাহারা তন্তু রচনা করিয়া মধ্যস্থলে বসিয়া থাকে। মাকড়সা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের বর্ণবৈচিত্র্য যে আত্মরক্ষার জন্য অনুকরণপ্রিয়তা হইতে উৎপন্ন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কীট পতঙ্গের অনুকরণপ্রিয়তা ও তজ্জন্য বর্ণবৈচিত্র্য বুঝিতে গেলে একবার কলিকাতার যাদুঘর দেখিয়া আসিতে বলি। অনেক দিন অবধি ভাবিতাম যে যাদুঘরের পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবসমূহকে অভিব্যক্তিবাদের প্রমাণ স্বরূপে সজ্জিত করিয়া রাখা উচিত। সেদিন গিয়া দেখি যে ঠিক আমার মনের মত করিয়া সাজান হইয়াছে, তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণকে যথেষ্ট ধন্যবাদ। এখন যাদুঘরে গেলে অভিব্যক্তিবাদ অতি সহজে বুঝা যায়, কেবল পুঁথিগত বিদ্যা মাত্রে পর্য্যবসিত হয় না। যাদুঘরে যেখানে প্রজাপতি আছে, সেইখানে একরকম পোকা রাখা হইয়াছে, তাহারা ঠিক পাতার মত এবং শুষ্ক কাঠির মত অনুকরণ করে—অনুকরণ এতদূর যায় যে অনেক সময়ে পাতা কিম্বা শুষ্ক ডাল থেকে তাহাদিগকে বাছিয়া লওয়া যায় না। এই অনুকরণের কারণ কেবল ভক্ষক পক্ষীদিগের হইতে আত্মরক্ষা এবং ফলে বর্ণবৈচিত্র্য। পত্রক কীট আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় একপ্রকার গঙ্গা ফড়িং (আমি বলি দুর্বাফড়িং বলাই ভাল—ইংরাজীতে Grasshopper বলে) আছে তাহার ডানা ঠিক সবুজ পাতার মত এবং একটা শুঁড়ের মত আছে, তাহা দেখিতে শুষ্ক পাতার ডাঁটার মত। এক প্রকার শলভ দেখা যায়, তাহা দেখিতে ঠিক পাতার আকৃতিবিশিষ্ট। একপ্রকার প্রজাপতি আছে, তাহার ডানার পৃষ্ঠভাগ পক্ষীদিগের অভক্ষ্য প্রজাপতির ডানার অনুকৃতি, আবার ডানার নিম্নভাগ ঠিক মৃত পত্রের ন্যায় দেখিতে হয়। তাহার নাম দিলাম মৃতপত্রক। কলিকাতার যাদুঘরে একজোড়া মৃতপত্রক প্রজাপতি



রক্ষিত হইয়াছে। যে পাতায় সচরাচর এই প্রজাপতি মধ্যাহ্নকালে যে ভাবে ডানা উলটাইয়া বিশ্রাম করে, ঠিক সেই ভাবে সেই গাছের ডালে বসাইয়া কাচের বাক্সে রাখা হইয়াছে এবং সেই ডালের গায়ে একটা কাগজে চিহ্নিত করা আছে যে কোন্‌টা প্রজাপতি। আশ্চর্য্য এই যে আকৃতিসাদৃশ্য এত অধিক যে সেই লেখা না থাকিলে কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না যে কোন্‌টা প্রজাপতি। বিশ্রাম কালে পাছে পাখীতে খাইয়া ফেলে, এই কারণে জীবন-সংগ্রাম ও পরিবৃত্তি প্রণালী অবলম্বনে এই বর্ণবৈচিত্র্য ও তজ্জন্য জীবরক্ষা। অধিকাংশস্থলে দেখি প্রাণের ভয়ে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় এবং তাহাও অভক্ষ্য নিরীহ কীটের অনুকরণে। আবার কোন কোন স্থলে নিরীহ কীট তীক্ষ্ণ-বিষ কীটসকলের অনুকরণ করিয়া ভক্ষকদিগেকে ভয় দেখাইতে প্রবৃত্ত হয়। যাদুঘরে দেখিয়াছি একপ্রকার নিরীহ কীট মৌমাছির অনুকারী; একপ্রকার নিরীহ কীট কাল বোল্‌তার অনুকারী। এই সকল অনুকরণ যে প্রাণভয়ে ও জীবরক্ষার কারণে হয়, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। এই মনে কর যে প্রজাপতি পাখীরা খায় না, তাহার শুয়াঁপোকা হয়তো ভক্ষ্য, সে অবস্থায় শুঁয়াপোকা যদি গাছের পাতার অনুকরণ করিতে পারে, তবে প্রাণরক্ষার অনেকটা সম্ভাবনা—আর দেখিতেও পাই যে সেই সকল শুঁয়াপোকা সবুজ বর্ণের। আবার যে পত্রক ও শুষ্কশাখ কীটদ্বয়ের কথা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাদের পুরুষগুলো ছোট ও অবিকাশিত, কিন্তু স্ত্রীগুলো বড় ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত, কারণ-শাবকের রক্ষার জন্য তাহাদের এরূপ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

জলচর কীটসকলের মধ্যেও এইরূপ অনুকৃতির প্রাবল্য দেখা যায়। সমুদ্রের নিম্নতম স্তরে তারকামৎস্য পাওয়া যায়—ইহারা নামে মৎস্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাগরিক কীট। এই তারকামৎস্য স্বভাবতই সাদা, কারণ সাদা না হইলে, জলের রঙ্গের সহিত এক না হইলে নিজের ভক্ষ্য পাওয়া দুর্লভ এবং অপরের ভক্ষ্য হওয়া সম্ভব। ইহাদের উপকারিতা অবশ্য আমরা আজও বিশেষ জানিতে পারি নাই, তবে উপকারিতা আছে বলিতে বাধ্য, নচেৎ ভগবান বাঁচাইবার উপায় করিয়া দিতেন না। মেডুসা নামীয় সাগরিক কীট স্বচ্ছ কাচের ন্যায়, বলা বাহুল্য ইহাও আত্মরক্ষার উপায়। কাঁকড়া গুলোর রং কাদার মত। আমরা সুন্দরবন অঞ্চলে দেখিয়াছি যে কাদার ভিতরে

কাঁকড়া থাকিলে কিছুতেই সহজে দেখা যায় না।

কীট পতঙ্গ হইতে উন্নত জীব সরীসৃপ প্রভৃতির মধ্যেও যথেষ্ট বর্ণবৈচিত্র্য দেখ যায় এবং সুতরাং তাহার কারণ ও প্রণালীও একই হইবে—ভগবানের রাজ্যে একই নিয়ম একই শ্রেণীতে কার্য্যকর হইবে—সমগ্র চেতন রাজ্যে বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ জীবরক্ষা এবং প্রণালী জীবনসংগ্রাম ও পরিবৃত্তি বলিয়া বোধ হয়। গোক্ষুরা সাপের ফণায় যে গরুর ক্ষুরের দাগ, ওয়ালেস বলেন যে তাহা শত্রুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য। তাহা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তদুপরি আমার বোধ হয় যে তাহা আত্মরক্ষার উপযোগী অনুকরণ। বোলপুরের ভুবনডাঙ্গায় বুনো খেজুর গাছের ঝোঁপ বিস্তর আছে, সেই সকল ঝোঁপের গর্ত্তের ভিতরে অনেকস্থলেই প্রায় গোক্ষুরা সাপ বাস করে। সেই খেজুর গাছের ফল আধপাকা অবস্থায় গৃহজাত আধপাকা খেজুরের মত বর্ণবিশিষ্ট কিন্তু পাকিলে একেবারে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। একবার মধ্যাহ্নকালে ঐরূপ আধপাকা খেজুর তুলিতে যাওয়া গিয়াছিল। যে ঝোঁপের কাছে যাওয়া হইয়াছিল, তাহারই নিম্নে গর্ত্তের ভিতর একটী প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ ফণা তুলিয়া ফোঁস ফোঁস করিতেছে। শব্দের কারণে আমাদের দৃষ্টি সেই দিকে গিয়াছিল, নচেৎ আধপাকা ও কৃষ্ণবর্ণ পাকা ফলের সহিত এমনই মিলাইয়া গিয়াছিল যে আমরা প্রথমে সাপের অস্তিত্বই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। নাউডগা সাপ অনেকে দেখিয়াছেন কি না জানি না—দেখিতে ঠিক নাউয়ের ডগার মত। আমরা একবার শীতকালে সুন্দরবন অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, মাঝিরা নৌকা গুণ টানিয়া লইয়া চলিতেছে, আমরাও পদব্রজে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছি। পথের মধ্যে দূরে দেখি যে প্রকাণ্ডকায় একটা কুমীর রোদ পোহাইতেছে, দেখিয়া কিছু পশ্চাৎপদ হইলাম। আমাদের পাশে আটদশ হাত দূরে একটা গাছ লতার ডালপাতায় আচ্ছাদিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমরাও পশ্চাৎপদ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছি, আর সম্মুখে ছিপের মত বেগে একটা নাউডগা সাপ মাটিতে পড়িয়া নদীগর্ভে চলিয়া গেল। তাহাকে আমরা ঝুলিতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নাউ-ডগা সাপ দেখি নাই বলিয়া তাহাকে সাপ বলিয়া বুঝিতে পারি নাই, লতার অংশ বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলাম। গিরগিটি, টিকটিকি গুলো দেখিয়াছি যে যে স্থানের অধিবাসী, প্রায় সেই স্থানেরই বর্ণের অনুকরণ করে। বহুরূপীর



সম্বন্ধে তো কথাই নাই—স্থানের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের তারতম্য দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে বহুরূপীর শরীর এরূপ ভাবে গঠিত যে তাহাতে স্থানের প্রতি-বিম্ব পড়ে এবং প্রতিবিম্ব পড়িলেই বর্ণতারতম্য হয়। হইতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত যে আত্মরক্ষার অথবা জীবনসংগ্রামের কোন সম্বন্ধ নাই তাহা বলিতে পারি না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জীবজন্তু যতই উন্নত হইতে থাকে, ততই তাহাদের বর্ণ প্রভৃতি চিহ্ন সকল পরিস্ফুট হইতে থাকে। সরীসৃপ হইতে পক্ষীতে পৌঁছিলেই এই বিষয় বিশেষ বুঝা যাইবে। পক্ষীদিগেরই বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ উপভোগ করি, প্রবন্ধেব শিরোদেশে আশীর্ব্বচনও তাহা ব্যক্ত করিতেছে। বালহাঁস প্রভৃতি বালুচর পক্ষীর রং ঠিক বালুকার বর্ণের সহিত মিশিয়া যাইবার উপযোগী। পদ্মার চরে শীতকালে বড় বড় বিল দেখা দেয়। তাহার ধারে সন্ধ্যাবেলায় বালহাঁস আসিয়া বাস করে। এমন শত শত বালহাঁস একটা বিলের চারি পাশে বসিয়া নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিয়া-ছিল, অথচ আমরা তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে পারি নাই; অবশেষে আমরা তাহাদের নিকটে অনেকটা অগ্রসর হইলে তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া দিল। যে দেশে গাছপালা বেশী, সেই দেশের অনেক পাখীর রং সবুজ যেমন তোতাপাখী। আবার চড়ুই পাখীদের পুরুষের রং এক প্রকার, স্ত্রীর রং অন্য প্রকার। পুরুষ চড়ুইয়ের রং অনেকটা গাছের ছালের সঙ্গে এবং স্ত্রী চড়ুইয়ের রং অনেকটা মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার উপযোগী। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে পুরুষ চড়ুই গুলো অধিকাংশ সময় দলে দলে গাছের ডালে ডালে বেড়ায়, তারি মধ্যে দুই একটী স্ত্রীচড়ুই দেখা যায়, কিন্তু স্ত্রী চড়ুইদিগকে অধিকাংশ সময়ে দলে দলে মাটিতে ধূলায় ও শুষ্ক ঘাসের মধ্যে খেলা করিতে দেখা যায়, তারি মধ্যে দু একটী পুরুষ চড়ুই দেখা যায়। চড়ুই পাখীদের বাসা প্রায় শুষ্ক ঘাসে নির্ম্মিত হয়, ডিম্বে তা দিবার কালে বোধ হয় অলক্ষ্য থাকিবার উপায় স্বরূপেও স্ত্রী চড়ুয়ের রং মাটি অথবা শুষ্ক ঘাসের সহিত নিশিয়া যায়। পেচক, চামচিকা প্রভৃতি নিশাচর পক্ষীর বর্ণ রাত্রের অন্ধকারে মিশাইয়া যাইবার উপযোগী, তাহাতে তাহাদের আহার যোগাইবার সুবিধা হয়। লক্ষ্মী-

পেচার সাদা রং চাঁদিনী যামিনীর উপযোগী। কাদাখোঁচা, টিট্টিভ প্রভৃতি পক্ষীগণ প্রায়ই পচা তৃণ পরিপূর্ণ কর্দ্দমক্ষেত্রের মধ্যে বিচরণ করে, তাহাদের বর্ণও তদুপযোগী। ইংরাজদিগের স্নাইপ শীকার করা একটা মস্ত বাতিক, এই শীকারের প্রধান সমস্যা শুনিয়াছি যে অনেক সময়ে বালির মধ্যে তাহাদিগকে দৃষ্টিগোচর করা যায় না। স্নাইপ-শীকার এরূপ কঠিন না হইলে বোধ হয় এতদিনে স্নাইপবংশ ধ্বংশ হইয়া যাইত। অষ্ট্রীচের (উট পাখী) গলার রং ঠিক বালির রং কিন্তু তাহার গায়ের পালকের রং অপেক্ষাকৃত ছায়াটে ও কালো। অষ্ট্রীচ যখন বালির ভিতর বসে, তখন সেই গর্ত্তের ছায়ার রংয়ের সহিত মিশিবার জন্য গায়ের রং একটু ছায়াটে হওয়া দরকার; গলাটা যেমন বাহির হইয়া থাকে, তাই গলা বালির রং ধরিয়াছে। অহি পক্ষীর (snake bird) ঠোঁট, গলা এবং পাশের ডানার রং সর্পের অনুকরণে রচিত—তাহা না হইলে সর্প শীকার অনেকটা অসম্ভব হইত। যাদুঘরে সজ্জিত পক্ষীকুল আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে জলচর পক্ষীর পেটের দিক সর্ব্বদাই সাদা ও জলের সবর্ণ হয়, যাহাতে মাছ প্রভৃতি খাদ্যজীব ভয় পাইয়া না পলায়ন করে। বক পেঙ্গুইন প্রভৃতি পক্ষী সকলও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। রাত্রিচর বকের রং অনাবশ্যক বলিয়া সাদা হয় নাই, কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে অন্ধকারের উপযোগী বর্ণলাভ হইয়াছে। হল্‌দে চূড়া বিশিষ্ট কাকাতুয়ার চূড়ার কারণ সম্বন্ধে কেহ কিছু বলেন নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় যে এই চূড়াতে ঐ কাকাতুয়ার আবাসবৃক্ষের পত্র বা ফলের সাদৃশ্য আছে। সময়ে সময়ে প্রতিযোগী বর্ণেও জীবরক্ষা হয়। দলবদ্ধ জীবজন্তুর জীবনরক্ষার পক্ষে প্রতিযোগী বর্ণ সহায়তা করে। কাক দিবাচর হইলেও কাল হইয়া সকলেরই এবং তাহাদের পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তাহাতে শত্রুর আবির্ভাব দেখিলেই পরস্পরকে সহায়তা করে। আমি দেখিয়াছি যে এক মালী একটা গাছ হইতে কাকের বাসা ভাঙ্গিয়াছিল, পরে তাহার বাগানে কাজ করা দুরূহ হইয়াছিল। মালী বাহির হইলেই বাগানের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের সকল কাক একত্র হইয়া কা কা রবে গগন ফাটাইয়া দিত এবং মালীর মাথায় ঠোকরাইয়া রক্তপাত পর্য্যন্ত করিতে ক্ষান্ত থাকিত না। প্রতিযোগী বর্ণের ঠিক দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও তাহার একান্ত অভাব নাই। চিলের রং পাটকিলে



হইবার আমি অন্য কারণ দেখি না—বোধ হয় হিমালয়ের বরফের সাদা রংয়ের প্রতিযোগী অথচ তথাকার মাটির উপযোগী রং এই পাটকিলে। চিলগুলো ঈগল পক্ষীর অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। ঈগল, পেচা ও চিল একই জাতীয়—যেমন বাঘ ও বেড়াল। সময়ে ঈগল হৈমবান পর্ব্বত ছাড়িয়া নীচে গরমদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল, তাহারই ফলে বোধ হয় চিল হইয়াছে। কাকের কাল রং যে কেবলই স্বদলকে সাবধান করিবার জন্য তাহা নহে; বোধ হয় তাহাতে আত্মগুপ্তি হয়—কোকিল গাছের ভিতর থাকিলে কে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে? ইহাও বর্ণপ্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত বলিয়া বোধ হয়। পেচার চক্ষু অন্ধকার সহ্য করিতে পারে না। তাহাও অবস্থা বিশেষ জীবনসংগ্রামের ফলে হইয়াছে বোধ হয়। আমি চুয়াডাঙ্গায় এক রকম ছোট জাতীয় পেচা দেখিয়াছি, তাহারা লম্বাচওড়ায় সালিখ পাখীর মত। তাহারা খুব ঘনপত্র গাছের ডালে বসিয়া দিনের বেলায় মানুষকেও ঠোকরাইতে ভীত হয় না। তাহাদের চক্ষু পেচকাকৃতি অনেকটা ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু গায়ের রং সমানই আছে। বোধ হয় এই রং পূর্ব্বে হিমালয়েও যেমন কাজ দিয়াছিল, তেমনি নিম্নদেশেও কাজ দিতেছে। হিমালয়ের কৃষ্ণভল্লুকও বোধ হয় বর্ণ-প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত। সুমেরুবৃত্তের সিন্ধু ঘোটকও বর্ণপ্রতিযোগিতার অপর দৃষ্টান্ত তাহার বর্ণ সিংহের ন্যায় ধূসর।

এখন কথা হইতেছে যে জীবদিগের শরীরের গঠনের সঙ্গে বর্ণবৈচিত্র্যের কোন সম্বন্ধ আছে কি না। আমার বোধ হয় আছে। তাহা না হইলে এক এক জাতীয় পক্ষী প্রভৃতি জীবের একই স্থানে একই বর্ণ দেখা যায় কেন? সকল ময়নারই সেই কানের নীচে হলদে, সেই ডানার একটু খানি সাদা। চূড়াওয়ালা কাকাতুয়ার সব সাদা, কেবল চূড়াটুকু হলদে। পশুদেরও এইরূপ শরীরের ভাঁজে ভাঁজে বর্ণবৈচিত্র্য তাহা লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়। প্রত্যেক বাঘেরই দেহের একই অংশে একই প্রকার ডোরা, আর সেই ডোরাগুলি ঠিক পাঁজরায় পাঁজরায় হইয়া থাকে। যখন এই প্রকার এক প্রকার জন্তুর সর্ব্ব অবস্থায় এক বর্ণ আবার তাহারই অপর শ্রেণী জন্তুগুলির সকল অবস্থায় একই বর্ণ, তখন অস্থিগঠনের সহিত বর্ণবৈচিত্র্যের যোগ একেবারে অস্বীকার করা যায় না। গৃহপালিত জীবজন্তুতে বর্ণের এরূপ

সমানভাব থাকা দেখা যায় না, কেবল স্বাধীন বন্য জন্তুতেই দেখা যায়—তাহাতই বর্ণের উপকারিতা বুঝা যায়।

বর্ণবৈচিত্র্য সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে সকল কথা বলিয়া আসিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটীই পশুরাজ্যেও সমভাবে প্রযুজ্য। সুমেরুবৃত্ত বৎসরের অধিকাংশ কাল বরফে আবৃত। আমরা স্বভাবত অনুমান করিতে পারি যে তথাকার জীবজন্তু শ্বেতকায় হইবে। ফলেও তাহাই দেখি। শ্বেত ভল্লুক তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আরও আশ্চর্য্য এই যে সুমেরুবৃত্তের শৃগাল, খরগোস প্রভৃতি কয়েকটী প্রাণী শীতকালে বরফপাত কালে শ্বেতবর্ণ ও গ্রীষ্মকালে নিজেদের স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে—ইহাতে বর্ণবৈচিত্র্যের উপকারিতা কেমন প্রত্যক্ষ হইতেছে। মরুভূমির জীব সমূহের বর্ণ প্রায় একপ্রকার—উষ্ট্র, সিংহ, মরুচারী হরিণ, ইহাদের সকলের রং প্রায় একই প্রকার। প্রজাপতি প্রভৃতি কীটের সম্বন্ধে বলিয়া আসিয়াছি যে খাদ্যশ্রেণী অখাদ্যশ্রেণীর অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। পশুদের মধ্যে গন্ধগোকুল নামক ভোঁদড় জাতীয় জীবের নিকটে কোন শীকারী পশু অথবা মনুষ্য তীব্র গন্ধযুক্ত বিষাক্ত তরল পদার্থ ছুড়িবার ভয়ে সহজে অগ্রসর হয় না। Skunk নামক জন্তু তাহারই অনুকরণে নিজের বাহ্যিক আকার গঠিত করিয়া শীকারীর মনে ভীতি উৎপাদন করে। অলস (sloth) নামক জীব যে গাছের ডালে বসিয়া থাকে, তাহার রেখা প্রভৃতির সঙ্গে নিজের বাহ্যিক আকার এমনি মিলাইয়াছে যে ব্যারণ ভন স্লেক বলেন যে তিনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও এই জীবকে তাহার বাসবৃক্ষে পরিচিহ্নিত করিতে পারেন নাই। আফ্রিকার জিরাফ যেরূপ লম্বা লম্বা শুষ্কতৃণপূর্ণ মাঠের উপকণ্ঠবর্ত্তী ভগ্নশাখ বৃক্ষের অরণ্যে বাস করে, তাহার গাত্রবর্ণও ঠিক তদুপযোগী। বাঘের দৃষ্টান্তে বর্ণবৈচিত্র্যের উপকারিতা স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। সুন্দরবনের বাঘের গায়ে ডোরা ডোরা দাগ। জ্যোৎস্নারাত্রে মধ্যাহ্নকালে হরিণ প্রভৃতি পশু জলখেতে নদীতীরে আসে। তাহাদিগের শীকারার্থে যে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে ওত করিয়া বাঘ বসিয়া থাকে, তাহাতে এরূপ ডোরা দাগ না হইলে তাহার আহার সংগ্রহ অসম্ভব হইত—ঠিক যেন একটী করিয়া শুষ্ক ঘাসের দাগ আর তাহার পরেই সেই ঘাসের ছায়ারূপী কাল দাগ। আবার চিতাবাঘ ভগ্নশাখ গাছে গাছে বেড়ায়, সুতরাং তাহার ডোরা দাগের প্রয়োজন



নাই; ভগ্নশাখার অগ্রভাগের ন্যায় গোল গোল দাগ আবশ্যক এবং তাহাই সে লাভ করিয়াছে। আসিয়ার মরুচারী বন্য গর্দভের বর্ণ ধূসর ও রেখাশূন্য, আফ্রিকার জেব্রার গাত্র রেখাময়—বলা বাহুল্য যে অবস্থার উপযোগিতা অনুসারে উভয়ের বিভিন্ন পরিচ্ছদ হইয়াছে। আফ্রিকার সুপ্রসিদ্ধ গোরিলার বর্ণ কাল—জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তাহাদের পরিপার্শ্বের সহিত আপনাদিগকে মিলাইয়া লওয়া আবশ্যক বিধায় এই কৃষ্ণবর্ণ। আমার বোধ হয় যে সকলেরই যথাপরিমাণে আত্মরক্ষার জন্য আত্মগুপ্তি আবশ্যক। গোরিলাগণ যেরূপ ভীষণ অরণ্যে বিচরণ করে, তাহার উপযোগী কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ নহে। মহিষ ও শূকর কাদায় পড়িয়া থাকে, তাই তাহাদের বর্ণ কাদার রং। পরিপার্শ্বের সহিত উপযোগিতানুসারেই যে জীবজন্তুদিগের গাত্রবর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়, যাদুঘরে রক্ষিত একটী সিংহ হইতে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। সিংহের উরুভাগে উপরিস্থ ধূসরবর্ণের নিম্নে অতি দুর্লক্ষ্যভাবে রেখা আছে দেখা যায়। তাহাতেই বুঝা যায় যে সময়ে সিংহ সুন্দরবনের বাঘের উপযুক্ত অবস্থা ও স্থানে বাস করিত, কিন্তু পরে ঘটনাচক্রে তাহাকে মরুবাসী হইতে হইয়াছে। যাদুঘরের এই সিংহটীর ঘাড়েও আবার কেশর নাই। অনেকে বলেন যে সংগ্রামকালে ঘাড়ে ব্যাঘ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই কেশর, কিন্তু আমার বোধ হয় যে রৌদ্র হইতে রক্ষা পাইবার উপায় এই কেশর। নচেৎ কুকুর বল, ব্যাঘ্র বল, অধিকাংশ সংগ্রামশীল জন্তু পরস্পরের গ্রীবাতেই সবলে দশনাঘাত করে, তবে তাহাদেরই বা কেশর হয় না কেন?

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে এটুকু বুঝিতে বাকী নাই বোধ হয় যে অধিকাংশস্থলেই অবস্থার উপযোগিতা অনুসারে বর্ণবৈচিত্র্য এবং তাহার ফলে আশ্চর্য্যরূপে জীবরক্ষা সাধিত হইতেছে। অনেক স্থলে হয়তো আমরা বর্ণবৈচিত্র্যের ঠিক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না কিন্তু তাহার যে উপকারিতা আছে তাহা যেন অন্তরে অন্তরে সায় পাই। মানবের মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্যের ফলে যে সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং তাহাতে কোন জাতির পৌষমাস ও কোন জাতির সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় তাহার আভাস প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দিয়া আসিয়াছি। আমি এ বিষয়ে আর অধিক বলিব না—কেবল সামাজিক বর্ণভেদের সাহায্যে সমাজরক্ষা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া

ক্ষান্ত হইব। সেই বৈদিক পুরাকালে অনার্য্যজাতি আর্য্যদিগের বর্ণবিভাগের মধ্যে আসিয়া এবং তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়া সমূল ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল। মধ্যে পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়া স্বীয় কর্ম্মের মর্ম উপলব্ধি করিলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া তথাকার কতকগুলি শূদ্রকে ক্ষত্রিয় করিয়া দিলেন এবং তাহারা উন্নত অধিকার পাইয়া উন্নতি করিতে লাগিল। তিতুমিরের লড়াইয়ে যখন দাড়িগোঁফ বিশিষ্ট মুসলমান দেখিলেই ইংরাজেরা বন্দী করিতে লাগিল, তখন মুসলমানেরা অনেকে দাড়িগোঁফ ফেলিয়া গলায় পৈতা পরিয়া "মুইহাঁদু" বলিয়া পরিচয় দিয়া রক্ষা পাইয়াছিল। অল্পদিন হইল যুগীজাতি পৈতা ধারণ করিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয় এবং ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উপাধিতে স্বনাম বিভূষিত করে—বলা বাহুল্য যে এতদিন সমাজ যেরূপ হেয় দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিত, ক্রমে ব্রাহ্মণভ্রমে তাহাদিগকে আর হেয় দৃষ্টিতে দেখিবে না এবং তাহারাও ক্রমে অজানত ব্রাহ্মণের অধিকার ও সম্মান লাভ করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারিবে আশা হয়। আর একথা বলিয়া দিতে হইবে না যে মুসলমানের রাজত্বে হিন্দুরা মুসলমানী আদবকায়দা অবলম্বন করিয়া অনেকস্থলে রক্ষা পাইয়াছিল এবং ইহাও বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্বে হিন্দু মুসলমান উভয়েই ইংরাজী পোষাক ও আদবকায়দা অবলম্বন করিয়া নানা স্থলে সম্মান ও সুখ লাভ করিয়া স্বদেশভক্ত ভারতসন্তান অপেক্ষা সর্ব্বরকমে রক্ষা লাভ করিতেছেন। এইরূপ অনুকরণে সুখলাভের দৃষ্টান্ত থাকিলেও আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে মোটের উপর সামাজিক জীবের স্ববর্ণ রক্ষাতেই লাভ।

পরিশেষে একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অনেক জীবতত্ত্ববিদ্ ময়ূরের প্যাকমের এবং আরও নানা পশুপক্ষীর বর্ণবৈচিত্র্য যৌবন-সঞ্চারিত বর্ণবৈচিত্র্য বোধ করেন, জীবনসংগ্রামজনিত বোধ করেন না। সত্য কথা বলিতে কি, আমি এই কথার প্রকৃত মর্ম ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তুমি বলিবে যে ময়ূরের প্যাকম ও তাহার বর্ণবৈচিত্র্য দ্বারা তাহাদিগের শোভা বৃদ্ধি ও স্ত্রীসংগ্রহের উপায় করিয়া দিতেছে কিন্তু তাহাদের জীবনরক্ষার সহায়তা করিতেছে না। আমি বলি যে ইহাতে শোভাবৃদ্ধি হেতু



যদি স্ত্রীসংগ্রহের উপায় হয়, তাহা হইলেই কি বংশবৃদ্ধি ও তদ্দ্বারা তাহাদের অস্তিত্বরক্ষারও উপায় হইতেছে না? বংশবৃদ্ধি দ্বারা অস্তিত্বরক্ষার কথা আসিলেই বলা বাহুল্য যে তাহা জীবনসংগ্রামের অধীনে আসিয়া পড়িল। বর্ণবৈচিত্র্যের একটু আধটু বৈলক্ষ্যণ্যে যে ভাল বা মন্দ স্ত্রী পাইবে না তাহাকে বলিতে পারে? এইরূপে যেদিক্ দিয়াই দেখি সকলেতেই জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়া, মৃত্যুর মধ্য দিয়া উন্নতির কার্য্য দেখি, অমৃতের সোপান নিত্য নব-নব রচিত হইতে দেখি। আমাদের ভীত হইবার কথা নাই—মঙ্গলময় ভগবান গায়ের প্রতি রেণুতে, প্রতি ইচ্ছার প্রতি অংশে, প্রতি ঘটনায়, প্রতি নিমেষে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া জগত সংসার নিয়মিত করিতেছেন—মাভৈ রবে গগন ভেদ করিয়া তাঁহারই জয়জয়কার কর। যিনি জীবনসংগ্রাম পাঠাইয়াছেন, যিনি পরিবৃত্তিকে নিয়মিত করিতেছেন, যাঁহার ইঙ্গিতে বর্ণভেদে জীবরক্ষা সাধিত হইতেছে, এবং বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়া আমাদের মনপ্রাণ শীতল হইতেছে, তাঁহারই চরণে অহমিকা সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া আপনাকে নিবেদন করিয়া দাও এবং নিশ্চিন্ত হও, জগতের মঙ্গলচক্র তোমার নিকটে স্বপ্রকাশ হইবে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

# স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত। *

—:++:—

সমুজ্জ্বল সাহিত্যের রম্য উপবনে,
নয়নের তৃপ্তিকর যে ক'টী কুসুম,
আপন সৌরভে ভরে ছিল ফুটে গাছে,
পড়িল ঝরিয়া ক্রমে কাল আবাহনে।

হীনবল বাঙ্গালী মোরা দীন সম্বল,
তাও দেব একে একে করিছ হরণ;
অনন্ত জগতে শুধু আছে আমাদের,
একটী নিশ্বাস আর এক বিন্দু জল।

তমিস্রা কুহেলিময় শুষ্ক ইতিসাসে,
যে দীপ্ত রজত শশী সুধাংশু ঢালিয়ে,
শিখাইল বাঙ্গালীরে করিতে আদর,
কোথা সে 'রজনী' আজি গেছ কোন দেশে।

বিবিধ অমূল্য সব রত্ন অলঙ্কারে
সজ্জিত মা বীণাপাণি; তারি সনে মিলি
তোমার রচিত সেই হেম কণ্ঠহার
শোভিবেক চিরদিন ভারতী দেবীরে।

* গত সংখ্যা 'পুণ্যে' শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত রজনী কান্ত গুপ্তের যে প্রতিকৃতি খানি যে ফটো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে উহা আমার অকৃত্রিম সুহৃদ Amature photographer শ্রীযুক্ত বাবু অচ্যুত কুমার নন্দী বি, এ মহাশয় স্বহস্তে তুলিয়া দিয়াছিলেন। এই সুযোগে আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

লেখক।



অধম বাঙ্গালী মোরা কেমনে তোমার,
গাহিব না জানি চির বিদায়ের গীত;
না ফুটে লেখনীমুখে হৃদয়ের ভাষ,
দুদিন আবেগ ভরে শুধু হাহাকার।

শ্রীহরিহর শেঠ।

---

# ধ্রুবাঙ্ক।

—:++:—

ধ্রুবাঙ্ক কি? ইহা কি প্রকাশ করে? ধ্রুব ও অঙ্ক এই দুই শব্দ যোগে ইহা সিদ্ধ হইয়াছে সুতরাং ইহার অর্থ নিশ্চিত বা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা। অঙ্কগুলি তো চিরকাল নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে—এক সংখ্যাকে পূর্ব্বেও এক বলিত এখনও এক বলে এবং পরেও এক বলিবে। ভিন্ন দেশবাসীর মধ্যে এই রীতির কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না সুতরাং সংখ্যাগুলি যেমন একভাবে অবস্থান করিতেছে প্রাকৃতিক জগতের কোন পদার্থই সেপ্রকার অবস্থান করে না—জগৎ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন নাই; জগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে—জগৎ নশ্বর, সংখ্যা অবিনাশী; এই কারণেই ভারতের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্য্য তাঁহার বীজগণিতের প্রারম্ভে অঙ্ক বা গণিতের সহিত ঈশ্বরের সাদৃশ্য প্রখ্যাপন করিয়া উভয়কে নমস্কার করিয়াছেন—

উৎপাদকং যৎ প্রবদন্তি বুদ্ধেঃ।
অধিষ্ঠিতং সৎ পুরুষেণ সাংখ্যৈঃ।
ব্যক্তস্য কৃৎস্নস্য তদৈকবীজং।
অব্যক্তমীশং গণিতং চ বন্দে॥

যাহা বুদ্ধির উৎপাদক সাংখ্যমতাবলম্বীগণ যাহাতে সৎপুরুষের অধিষ্ঠান

দেখিতে পান যিনি এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র বীজ বা মূলাধার সেই অপ্রকাশিত বা নিরাকার ঈশ্বরকে ও গণিতকে বন্দনা করিতেছি।

পুরাকালে ছন্দেরই অধিক প্রচলন ছিল। ইহার দুইটী প্রধান কারণ দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথম অল্প কথায় অধিক ভাবের প্রকাশ দ্বিতীয় আবৃত্তির সুগমতা; ইহাতেই অতীত বিষয় সহসা বিস্মৃত হয় না—দেখ বেদ যাহাকে বৈদিক ভাষায় ছন্দ বলে, তাহাও শিষ্য পরম্পরায় কেবলমাত্র মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং স্বীয় আদিম মৌলিকতা অবিকৃত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। দেখ এত বড় যে রামচরিত তাহাও এক সময়ে গীত হইয়াছে। ছন্দ পূর্ব্বপুরুষগণের মনকে স্বীয় মনোহর ভাবে আকর্ষণ না করিলে হয় তো আমরা কিম্ভুত কিমাকার একটা সজীব পদার্থ হইতাম। এই যে অঙ্ক ও জ্যোতিষশাস্ত্র যাহাতে প্রমাণ দ্বারা উপপত্তিতে উপস্থিত হইয়া অঙ্কফল প্রকাশ করিলে ছাত্রের অনায়াস বোধগম্য হইতে পারে সেই শাস্ত্রদ্বয়েও নিয়মগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। এ স্থলে ছন্দে সংখ্যা প্রকাশ করিতে হইলে দুইটী প্রথানুযায়িক তাহা প্রকটিত করিতে পারা যায়—প্রথমতঃ যদি ছন্দের মাধুর্য্যে কোন ব্যতিক্রম না ঘটে তাহা হইলে সংখ্যার স্পষ্ট নামোল্লেখ দ্বারাই তাহা প্রকাশ করা-হয়—যেমন

ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহ বাদিতে।
সপ্তাব্দ শতযুক্তেষু গতেষ্বব্দেষু পঞ্চসু।
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্‌যু পঞ্চশতাসুচ।
সমাসু সমতীতাসু শকনামাপি ভূঁভুজাং॥

সম্বৎ সোরহসৌ একতীসা। করৌ কথা হরিপদ ধরি সীসা॥

প্রায়স্তৃতীয় গোনর্দ্দাদারভ্য শরদাং তদা।
দ্বেসহস্রে গতে ত্রিংশদধিকংচ শতত্রয়ং॥ ইত্যাদি

দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি পরস্পর অসংলগ্ন সাংকেতিক কথার সমাবেশ দ্বারা সংখ্যা প্রকাশিত করা হয়—

শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥



এই ছন্দের মধ্যে উক্ত চারি শব্দের সহিত পরস্পরের অর্থ বিষয়ক কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না বটে কিন্তু ইহার নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক সমষ্টি দ্বারা যাহা লব্ধ হয় তাহার সহিত "শকে"র বিশেষ সম্বন্ধ আছে। প্রথম দৃষ্টে ইহা প্রলাপ বাক্য বলিয়া বোধ হয় কিন্তু একটু অভিনিবেশ দ্বারা উক্ত ছন্দ হইতে সময় অবধারণোপযোগী উপকরণ লাভ করিয়া থাকি। উহার প্রত্যেক শব্দ দ্বারা যে অঙ্ক লব্ধ হইয়া থাকে তাহাই উক্ত শব্দগুলির ধ্রুবাঙ্ক ইহা হইতেই সেই শব্দগুলির "ধ্রুবাঙ্ক" নামকরণ হইয়াছে—

পদেতে মাপিলে ছায়া যত পা হইবে।
দ্বিগুণ করিয়া তাহে চৌদ্দ মিশাইবে॥
পক্ষ গ্রহ কর এই ধ্রুবাঙ্কে হরিবে।
লব্ধ দণ্ড স্থিত পল তাহাতে পাইবে॥

এইরূপে সংখ্যা প্রকাশ করা ভারতবর্ষেই অধিক প্রচলিত দেখা যায়। আমাদের দেশে গুরু মহাশয়েরা যখন শিষ্যদিগকে অঙ্ক শাস্ত্র শিক্ষা আরম্ভ করান তখন দেখা যায় যে তাঁহারা প্রথমে নিম্ন সংকেতগুলি ছাত্রদিগকে আবৃত্তি করিতে বলেন—একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ, পঞ্চ বাণ, ছয়ে ঋতু, সাত সমুদ্র, আটে অষ্ট বসু, নয়ে নবগ্রহ, দশে দিক্। দশ অবধি এই প্রকার শিক্ষা দিয়া 'একের পিটে এক এগার' আরম্ভ করান। ছেলেরা মনে মনে ভাবে এ আবার কি? কিন্তু তাহাদের কোমল মনে ইহা বদ্ধমূল হইয়া যায় যে চন্দ্র বলিলে এক বুঝিতে হইবে, বসু বলিলে আট বুঝিতে হইবে, গ্রহ বলিলে নয় সংখ্যা বুঝিতে হইবে। কাল ক্রমে যখন তাহারা কৌতুহলী হইয়া উক্ত বিষয়ে অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করে তখন তাহারা স্বীয় শিক্ষার সত্যতা লাভ করিতে পারে। আমরা সকলেই ত দেখিতেছি চন্দ্র এক, পৃথিবী এক—এই উভয়ের দ্বিতীয় দেখিতে পাই না সুতরাং আমাদের মনে উক্ত শব্দদ্বয় দ্বারা একের অধিক বস্তু কোন মতে প্রকাশ হয় না অতএব তাহারা এক সংখ্যার প্রকাশক হইল অর্থাৎ চন্দ্র ও পৃথিবীর ধ্রুবাঙ্ক এক হইল। এই প্রকারে অন্য ধ্রুবাঙ্কেরও সত্যতা ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

কোন কোন শব্দের দুই ধ্রুবাঙ্ক দৃষ্ট হয়। এ প্রকার অবস্থায় অধিক লোকে যে ধ্রুবাঙ্কটী ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই প্রচলিত হইয়া যায়। যেমন

ছন্দ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে সাগর, সমুদ্র, উদধি, অর্থে ৪ সংখ্যা ধরা হইয়াছে, কিন্তু ভাষা লেখকগণ উহা দ্বারা ৭ সংখ্যাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। গণিত শাস্ত্র-মতে নেত্র অর্থে দুই সংখ্যা বুঝায় এবং প্রাকৃতিক জগতও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ধ্রুবাঙ্কের বিশেষ বিবরণ গ্রন্থের অভ্যন্তরে দ্রষ্টব্য।

গণকেরা ছন্দে আর এক প্রকারে সংখ্যা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে ব্যঞ্জন বর্ণকে সংখ্যার আধার রূপে স্বীকার করা হইয়াছে—ক হইতে ঝ পর্য্যন্ত একাদি ক্রমে নয় সংখ্যার প্রকাশক; ট হইতে ধ পর্য্যন্ত নয় সংখ্যা বুঝায়; ঞ ও ন শূন্য জ্ঞাপক; প হইতে ম পর্য্যন্ত একাদি পাঁচ সংখ্যা বুঝায় এবং য হইতে হ পর্য্যন্ত আটটী বর্ণ ক্রমান্বয়ে ৮ সংখ্যা জ্ঞাপন করিয়া থাকে—

কাদয়োঽঙ্কাষ্টাদয়োঽঙ্কাঃ পাদ্যাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যাদয়োঽষ্টৌ মতাঃ প্রাজ্ঞৈর্গণকৈ র্বুদ্ধিমত্তরৈঃ॥

গণকেরা ইহা স্বীয় সুবিধার জন্য করিয়া থাকিবেন; ইহাতে ধ্রুবাঙ্কের ন্যায় প্রাচীনতা লক্ষিত হয় না, প্রত্যুত ইহাতে আরবী ভাষায় সংখ্যা প্রকাশক প্রণালীর অল্প আঘ্রাণ পাওয়া যায়, যেহেতু হিব্রু ও আরবী ভাষায় বর্ণ-মালার অক্ষর দ্বারা সংখ্যা প্রকাশ করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। অধিকাংশ তাজক (সংস্কৃত জাতক শব্দের আরবী রূপান্তর) গ্রন্থে এই নব প্রকারে সংখ্যা প্রকাশক নিয়ম সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে; সুতরাং যাঁহারা নব্য ফলিত জ্যোতিষ ও তাজক গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে এই উভয় প্রণালীর জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। কেহ কেহ মধুর সংলগ্ন কথার দ্বারা সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন—

৫ ৮ ৬ ১
"মোদচ্ছায়া মিতায়াং শরদি শরদৃতাবাশিনে কালযুক্তে।"

অর্থাৎ শীতল ছায়াযুক্ত শরৎকালে অথবা ১৬৮৫ সংখ্যাযুক্ত বৎসরে শরৎ ঋতুতে আশ্বিন মাসে।

আবার কেহ কেহ পরস্পর অসংলগ্ন কথার যোগেই সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন

"তরু খর জয় ভয় নৃপ তনু খানি নাড্যা ভাস্করাদি বারেষু"

কিন্তু ইহাতেও পাশ্চাত্য রীতির সহিত পার্থক্য রক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে



পরবর্ত্তী বর্ণের সংখ্যা পূর্ব্বের বাম দিকে অবস্থিত থাকিয়া সংখ্যাটীকে ক্রমে দশবৃদ্ধ করিয়া দিতেছে, কিন্তু হিব্রু আদি ভাষায় তাহা পূর্ব্বের সহিত যুক্ত হইয়া যায়; অতএব পাশ্চাত্য গণনায় গণকের উপর যোগ করিবার ভার আসিয়া পড়ে। ভারতবর্ষে দশকাদিক্রমে সংখ্যার স্থাপন প্রচলিত থাকায় অতি শীঘ্র অভীষ্ট সংখ্যা লব্ধ হয় কিন্তু পাশ্চাত্য মতে সেই স্থলে যোগের কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

আরবী বর্ণমালা নিম্নলিখিত ছন্দযুক্ত কথায় প্রকাশিত রহিয়াছে। ইহার শেষের ছয়টী বর্ণ বাদ দিলে বাকী ২২টী হিব্রুর বর্ণমালা জ্ঞাপন করিবে। ইহার দ্বারা ক্রমান্বয়ে সংখ্যাও প্রকাশিত হইতেছে। হিব্রু ভাষার বর্ণমালা দ্বারা ৪০০ চারি শত সংখ্যা অবধি প্রকাশিত হইতে পারে। আরবী ভাষার অতিরিক্ত ছয় বর্ণ দ্বারা আর ৬০০ ছয় শত অধিক অর্থাৎ এক সহস্র পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে।

অব্‌জদ্ হাউঅজ্ হুত্তি কলেমন্।
সাআফস্ কোরশৎ সখ্‌থজ জজ্জগ॥

কোন সংখ্যা প্রকাশ করিতে হইলে সেই সংখ্যার প্রকাশক বর্ণমালা গুলি দক্ষিণ হইতে বামে স্থাপন করিতে হয় এবং এইরূপে স্থাপিত বর্ণমালা গুলির নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ করিলে অভীষ্ট সংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়—যেমন ১২৭৫ প্রকাশ করিতে হইলে প্রথমে ১০০০ সংখ্যার প্রকাশক বর্ণ "গ", তারপর ২০০ সংখ্যার প্রকাশক বর্ণ "র", তারপর ৭০ সংখ্যার প্রকাশক বর্ণ "আ" ও সর্ব্ব শেষে ৫ সংখ্যার প্রকাশক বর্ণ "হ" লিখিয়া যে শব্দ পাইলাম তাহাই সহজ কথায় উক্ত সংখ্যার প্রকাশক হইল কিন্তু ছন্দে এ প্রকার শব্দ শ্রুতি-কটু হয় বলিয়া মধুর কথায় তাহা ব্যক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত দেখা যায়—"ফৌতে অকবর সাহ" এই বাক্যটী দ্বারা যেমন অকবর বাদসাহের মৃত্যু জ্ঞাপন করিতেছে সেইরূপ ইহার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ করিলে তাঁহার মৃত্যু সময়টীও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। বর্ণমালার সংখ্যা যোগ করিলে ১০১৪ হিজরী হয়। বর্ণের মস্তকে উল্টা রেফ দিলে হিব্রু সংখ্যা সহস্র গুণিত হয় যেমন—অ = ১০০০, ব = ২০০০, জ = ৭০০০।

নিম্নলিখিত তালিকার দুই তিন বর্ণ দেবনাগরের এক বর্ণ দ্বারা লিখিত

হিব্রু ও আরবীর বর্ণমালা।

| ক্রমিক সংখ্যা | বর্ণমালা | জ্ঞাপক সংখ্যা | ক্রমিক সংখ্যা | বর্ণমালা | জ্ঞাপক সংখ্যা | ক্রমিক সংখ্যা | বর্ণমালা | জ্ঞাপক সংখ্যা | ক্রমিক সংখ্যা | বর্ণমালা | জ্ঞাপক সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | অ | ১ | ৮ | হ | ৮ | ১৫ | স (সে) | ৬০ | ২২ | ত (তে) | ৪০০ |
| ২ | ব b | ২ | ৯ | ত (তোয়) | ৯ | ১৬ | (আ অয়েন) | ৭০ | ২৩ | স (সোয়াদ) | ৫০০ |
| ৩ | জ | ৩ | ১০ | য় | ১০ | ১৭ | ফ (ফে) | ৮০ | ২৪ | খ (খে) | ৬০০ |
| ৪ | দ | ৪ | ১১ | ক | ২০ | ১৮ | স (সীন্) | ৯০ | ২৫ | জ (জোয়াদ) | ৭০০ |
| ৫ | হ | ৫ | ১২ | ল | ৩০ | ১৯ | ক q | ১০০ | ২৬ | জ (zoy) | ৮০০ |
| ৬ | ব v | ৬ | ১৩ | ম | ৪০ | ২০ | র | ২০০ | ২৭ | জ (জাল) | ৯০০ |
| ৭ | জ z | ৭ | ১৪ | ন | ৫০ | ২১ | শ | ৩০০ | ২৮ | গ (গয়েন) | ১০০০ |



হইলেও আরবী ভাষায় সেগুলি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ। নিম্নে উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি—কোরাণ শব্দ ১৯ সংখ্যক ক দিয়া লিখিতে হইবে। "অল্লাহু অকবর" এস্থানে উভয় অ ১ম বর্ণ, হু র হ ৫ম বর্ণ, ক ১১শ বর্ণ, ব ২য় বর্ণ। "অল্লা তালা" র অ = ১ম বর্ণ, 'ল্লার' আ = ১বর্ণ, 'তা' র আ = ১৬শ বর্ণ, ত = ২২শ বর্ণ, লার আ = ১ম বর্ণ। "গজল" এর গ = ২৮শ বর্ণ, জ = ৭ম বর্ণ। "আফ্তাব" = সূর্য্য; ইহার আ = ১ম বর্ণ, ত = ২২শ বর্ণ, ব = ২য় বর্ণ। "মাহতাব" = চন্দ্র, ইহার হ = ৫ম বর্ণ। মসলা = প্রবাদ, ইহার স = ১৫শ বর্ণ। "শহর" = নগর, ইহার হ = ৫ম বর্ণ। রহম = দয়া, ইহার হ = ৮ম বর্ণ। সখী = দাতা, ইহার স = ১৮শ বর্ণ, খ = ২৪শ বর্ণ। সদর = সম্মুখ (আমাদের সদর মফস্বল) ইহার স = ২৩শ বর্ণ। মৌসমেসরমা = গ্রীষ্মকাল, ১ম স = ১৮শ বর্ণ, ২য় স = ১৫শ বর্ণ। শেখ সাদির তুঁই আসিয়ারা খতাবখ্শো বস = তুমিই একমাত্র পাপীদের দোষ ক্ষমাকারী; এস্থানে 'আসিঁয়ারা'র স = ১৫শ বর্ণ। তখ্ত তাউস = মৌরসিংহাসন, ইহার প্রথম দুই ত = ২২শ বর্ণ, ৩য় ত = ৯ম বর্ণ আর উ = ৬ষ্ঠ বর্ণ, স = ১৮শ বর্ণ। "জঙ্গল সোহরা বিয়াবানফিরি" এই গানের স = ২৩শ বর্ণ। 'শহজাদে আলম' ইহার জ = ৭ম বর্ণ, আ = ১৬শ বর্ণ। খত = পত্র, ইহার ত = ৯ম বর্ণ। গুলিস্তান = ফুলবাগান, ইহার স = ১৮শ বর্ণ ত = ২২শ বর্ণ। লফজ = কথা, ইহার জ = ২৬শ বর্ণ। "দম্দমো মেদম নহিঅব থৈর মাগো জান কি। আয় জফর অব হো চুকী শমশের হিন্দোস্তানকি॥" সৈন্যে জীবনী শক্তি নাই এখন প্রাণ ভিক্ষা কর। ওহে জফর হিন্দুস্তানের বাদশাহী শেষ হইয়াছে। জফর = দীল্লীর শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহের গৃহিত নাম nom de plum ইহার জ = ২৫শ বর্ণ। মুসাফির = পর্য্যটক, ইহার স = ২৩শ বর্ণ।

"অঙ্কস্য বামাগতিঃ" অঙ্কের বাম দিকে গতি হয় অর্থাৎ একক সংখ্যার বামে দশক স্থাপিত হয়, দশকের বামে শতক স্থাপিত হয় ইহাই সংখ্যা স্থাপনের নিয়ম সুতরাং ছন্দে ব্যবহৃত শব্দের ধ্রুবাঙ্কও ক্রমান্বয়ে এই নিয়মানুসারে স্থাপিত করা উচিত। এই নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায় না। প্রথম শব্দের ধ্রুবাঙ্ক একক সংখ্যার স্থান অধিকার করিল তারপর শব্দের ধ্রুবাঙ্ক দশক ইত্যাদি রূপে স্থাপিত হইয়া সংখ্যাটী সিদ্ধ করিল—শাকে বিহীনে শশিপক্ষথৈকে" প্রচলিত নিয়মানুযায়িক ইহা দ্বারা আমরা ১০২১ শকাব্দ

প্রাপ্ত হইতেছি ; ১২০১ হইবে না।

Sir William Jones সাহেব হিন্দুদিগের ধ্রুবাঙ্ক দ্বারা অভীষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করা সম্বন্ধে প্রশংসাবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখন নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র ভূমিকার উপসংহার করিব।

Nothing can be more ingenious than the memorial verses, in which the Hindus have a custom of linking together a number of ideas, otherwise unconnected and of chaining, as it were, the memory by a regular measure: thus by putting teeth for 32, Rudra for eleven, season for six, arrow or element for five, Veda or age for four ; Ram fire quality for 3 eye or Cumar for two, and earth or moon for one, they have composed verses to express the number of stars in each of the twenty-seven asterism.

শ্রীকানাই লাল ঘোষাল।

---

# কৃতজ্ঞতা। *

আমাদিগের জীবনের এক দিন গত হইয়াছে এবং আমরা রজনীর সমাগম লাভ করিয়াছি। কিছুকাল পরেই আমরা সকলে গভীর নিদ্রাতে অভিভূত হইব ; তখন নিদ্রান্বিত হইয়া বন্ধু বান্ধব জগৎ ও ঈশ্বর সমুদয়ই বিস্মৃত হইব। অতএব নিদ্রা আমাদের উপর যে পর্য্যন্ত রাজত্ব না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এবং উত্তমরূপে আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখি যে ঈশ্বরপ্রেমে আমাদিগের মন কত অগ্রসর হইয়াছে। আমরা কি আমাদিগকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া গণ্য করি? এবং যদি গণ্য করিয়া থাকি তাহা হইলে কি লোকের অনুরোধ লঙ্ঘন করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে প্রাণপণে যত্নবান হই? পরমেশ্বর যিনি পিতার পিতা মাতার মাতা ও গুরুর গুরু তাঁহার কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত কি ক্ষুদ্র সাংসারিক বাধা অতিক্রম করিতে শক্ত হই? এই সকল গম্ভীর ও গুরুতর বাক্য নিদ্রার পূর্ব্বে মনে মনে আলোচনা করা উচিত। আমরা ঈশ্বরের নিকটে অগ্রসর হইয়াছি অথবা তাঁহা হইতে দূরবর্ত্তী হইয়াছি প্রতিদিনই যেন ইহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি। যদি দূরবর্ত্তী হইয়া থাকি তাহা হইলে তন্নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক আত্মাকে উন্নত করিবার চেষ্টা দেখিব এবং যদি অগ্রসর হইয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের আত্মপ্রসাদই আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া তাঁহার পথে অগ্রসর হইতে ক্রমাগতই আদেশ করিবে। আমরা যেন আত্মপ্রসাদ হইতে বিমুখ না হই, আমরা যেন আত্মপ্রসাদপ্রবর্ত্তক ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন না হই। বৃক্ষ যদিও মূল ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারে তথাপি আমরা মনুষ্য হইয়া কি প্রকারে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারি। ভ্রাতৃগণ! যিনি আমাদিগের সাক্ষীস্বরূপ হইয়া সকলেরই আত্মারূপ মন্দিরে

---

* ১৭৮২ শক ১৮ ভাদ্র শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ সেনের বাটীতে রবিবার রাত্রিকালীন উপাসনার পরে প্রপঠিত।

স্থিতি করিতেছেন সেই ঈশ্বর হইতে কেনইবা আমরা বৃথা বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা পাই, কেনইবা আমরা লজ্জা ভয় প্রযুক্ত ঈশ্বরের সম্মুখবর্ত্তী হইতে শঙ্কিত হই। যিনি আমাদিগকে সুখে রাখিবেন বলিয়া বিচিত্র শক্তি সহকারে নানাপ্রকার সুখজনক দ্রব্য প্রেরণ করিতেছেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য হইল না কিন্তু তাঁহার সেই সমুদয় দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত হইল! হে পরমাত্মন! তুমি যে আমাদিগকে কত প্রকার সুখে সুখী করিয়াছ কতপ্রকার আনন্দোপভোগের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছ, তাহা আমরা কিপ্রকারে বর্ণনা করিব,—তাহা বাক্যেতে বলা যায় না তবে আমি তাহা কি প্রকারে ব্যক্ত করিব! তুমি আমাদের চিরকালের সখা তথাপি আমরা তোমাকে হৃদয় মন্দিরে স্থান দিই না। আমাদের মত অকৃতজ্ঞ, আর কে আছে। যে পিতা আমাকে সর্ব্বস্ব দান করিতেছেন তাঁহাকেই পিতারূপে স্বীকার করিতে ও সমাজে একপ্রাণ হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতে লোকলজ্জা লোকভয়ে ভীত হই, পরিবারের একটুকু কোপদৃষ্টির নিমিত্ত সেই পিতার পিতাকে পরিত্যাগ করি। হে পরম পিতঃ পরমেশ্বর! আমি যেন লোকলজ্জা ও লোকভয়ে ভীত না হইয়া তোমাকে হৃদয় সন্নিধানে ধারণ করিয়া তোমাকেই মৃত্যুর সময় পাথেয় করি। আমি কি দেখিতেছি? তোমাকেই যে সর্ব্বত্র প্রকাশমান দেখিতেছি; তোমারই উজ্জ্বল জ্যোতিদ্বারা এই রাত্রি পরিপূরিত হইয়াছে। আমি তোমারই ভাব সর্ব্বত্র প্রকাশ দেখিতেছি। যখন তোমার প্রসন্ন মুখ আমার উপরে বিকীর্ণ রহিয়াছে তখন সাংসারিক বিপদ্ রাশিও আমার মনকে নত করিতে পারে না। আমার মনের ভাব এখন এই প্রকার যেন তোমার নিমিত্তে ধন প্রাণ মান সমুদায়ই বিসর্জ্জন দিতে পারি। হে জগদীশ্বর! যেন আমার মন এই ভাব সকল সময়েই ধারণ করে এবং লোকনিন্দা লোকভয় সকল পদতলে স্থাপন করিয়া তোমার উপাসনাতে ও তোমার কার্য্যে দৃঢ়ানুরাগ স্থাপিত করে। যদি তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলাম তখন কি তোমার ইচ্ছার বিপরীতে আমরা লোক কার্য্য সমাধান করিব? কখনই নহে। হে অমৃতলোক নিবাসী অমৃতের পুত্র সকল আমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর যে, যদিও সূর্য্য চন্দ্রের বিনাশ দশা উপস্থিত হয় যদিও নক্ষত্র তারা গ্রহ মণ্ডলী সকলেই নির্ব্বাণ



দশা প্রাপ্ত হয় তথাপি আমি সেই সর্ব্বমঙ্গলদাতা করুণানিধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে নিরস্ত হইব না, তথাপি তাঁহার মহিমা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে বিরত থাকিব না ও তাঁহার কার্য্যে লোকভয়ে ভীত হইব না এবং সকল সময়েই নির্জনে ও সজনে প্রেমরসে আর্দ্র হইয়া তাঁহারই মহিমাকে মহীয়ান করিব।

৺হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

---

# সুরা দেবী।

কিঙ্খাপের কুসুম-কোমল শয্যার উপর সুরা দেবী আলুলয়িত কেশে উপবিষ্টা। অধরৌষ্ঠে সাদর সম্ভাষনী হাসি, নয়নের কোণে ঢুলুঢুলু জড়ভাব, রক্তিম গণ্ডস্থলে চুম্বনের রেখার মত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া পড়িয়াছে। মান অপমান, জাতি কুল ভুলিয়া ভক্ত সেবকেরা চারিপার্শ্বে ঘিরিয়া বসিয়াছে। ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ দেবীর পাদমূলে স্তূপাকৃত স্বর্ণমুদ্রা। সেই স্বর্ণোজ্জ্বল্যের মধ্য হইতে সুরাদেবীর রঞ্জিত পদতলের অস্ফুট রক্তিমা সন্ধ্যার স্বর্ণ-লাবণ্য-উজ্জ্বল রক্তিম মেঘখণ্ডের মত শোভা পাইতেছে। এই বাহ্য-সৌন্দর্য্যে বিষহৃদয়া সুরাদেবী ভক্তদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। তিনি তাহাদের প্রাণে অতি ধীরে ধীরে বিষ সেচন করিতেছেন। মুগ্ধ ভক্তেরা মনে করিতেছে, ইহা বিষ নয়—অমৃত।

রজনী সুরাদেবীর শৈশব সহচরী—শয্যাপ্রান্তে বসিয়া বিবশা সুরাদেবীকে চামর ব্যজন করিতেছে। ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা সুরা লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে এক একবার রজনীর পানে চাহিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন। ভক্তেরা ভাবিতেছে—দেবী প্রসন্না। প্রথম যৌবনের মত সে আধোহাসি ভাব দেখিয়া পাষাণও গলিয়া যায়—মুগ্ধ ভক্ত যে সে ছলনায় ভুলিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি!

সুরাদেবী বাল্যকালে সুরপুরীতে দেব কন্যাগণের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইতেন—নন্দন কাননে ফুল পাড়িয়া, ফল ছিঁড়িয়া যথেচ্ছা বিচরণ করিতেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার কুটিল স্বভাব অল্পে অল্পে প্রকাশ হইতে লাগিল। শচী দেখিলেন, সুরা দেবভূমিতে মৃত্যুর প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নশীল। ইন্দ্রের নিকট এ সংবাদ প্রকাশ করিয়া তিনি সুরাকে সুরলোক হইতে দূর করিয়া দিলেন। সেই দিন সখী রজনীকে সঙ্গে লইয়া সুরা মানবের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

স্বর্গের পরিত্যক্তাকে মানবেরা সহজেই আশ্রয় দান করিল। দলে দলে সুরার ভক্ত সেবক জুটিতে লাগিল। মোহাচ্ছন্ন ভক্তের রক্তে ফোঁটা পরিয়া সুরা দেবী ধরণীতে অকাল-মৃত্যুর প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই অবধি তাঁহার ভক্তেরা অকাল-মৃত্যুর পূজা করিয়া আসিতেছে। সুরাদেবী মৃত্যুর প্রণয়িনী।

৺বলেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

---

# বিলাতী কুমড়ার রসেদার হালুয়া।

উপকরণ।—লাল বিলাতী কুমড়া পাঁচ ছটাক, মেঁওয়া আধ পোয়া, চিনি তিন ছটাক, জল তিন পোয়া, ছোট এলাচ দুইটা, লঙ্গ তিন চারিটা, দারচিনি সিকি তোলা, সর মালাই আধ পোয়া, পেস্তা আধ ছটাক, বাদাম বারটা, কিসমিস কুড়িটা, ঘি এক ছটাক।

প্রণালী।—কুমড়ার খোলা ছাড়াইয়া ডুমা ডুমা বানাও। তারপরে ধুইয়া রাখ। মেওয়া হাতে করিয়া গুঁড়াও। পেস্তা ও বাদাম ভিজাইয়া তাহার খোসা উঠাইয়া রাখ। পেস্তা বাদাম লম্বা কুচি কুচি করিয়া কাট।

একটি কলাই-করা কড়ায় আধ সের জল চড়াও; তাহাতে কুমড়াগুলি সিদ্ধ করিতে ছাড়। মিনিট পনের মধ্যে সিদ্ধ হইয়া যাইবে। তারপরে কাপড়ে



চাপিয়া ইহার জল বাহির করিয়া ফেল। শিলে কুমড়াগুলা পিষিয়া লও।

এক পোয়া জলে তিন ছটাক চিনি দিয়া কড়া চড়াইয়া দাও। মিনিট পনেরর মধ্যে রস খুব গাঢ় হইয়া আসিবে। খুন্তি দিয়া কড়াতে রসটার বিচ মারিয়া গাঢ় কর। এক ছটাক ওজনের দুখানি মালাই সর এই রসে ডুবাইয়া মাত্র আলাদা আলাদা দুটি থালার মত পাত্রে পাতিয়া রাখ। একটুপরে ঠাণ্ডা হইলে দেখিবে মালাই দুখানি চিনির রসে বেশ খট্‌খটে হইয়া গিয়াছে। তখন মালাই দুখানি আলাদা আলাদা রাখিবে।

এইবারে আর একটি কড়াতে এক ছটাক ঘি চড়াও। ইহাতে দারচিনি, লঙ্গ এবং ছোট এলাচ ছাড়। বেশ মশলার গন্ধ বাহির হইলে কুমড়া ছাড়িবে। কুমড়া তিন চার মিনিট নাড়িয়া সেই ঘিয়েতেই কড়ার এক ধারে মেওয়া ছাড়িবে এবং খুন্তি দিয়া কুমড়া এক ধারে ঠেলিয়া রাখিবে। মেওয়া দু তিন মিনিট নাড়িয়া তারপরে ক্রমে কুমড়ার সঙ্গে মিশাইয়া ফেল। প্রায় মিনিট পাঁচ ছয় হিলাইতে হিলাইতে যখন ঘি বাহির হইবে তখন রসের কড়াতে এই সমস্তটা ঢালিয়া দাও। নাড়িতে থাক। কুচান বাদাম ও পেস্তা এবং কিসমিস-গুলি ঢালিয়া দাও। মিনিট সাত আট পরে যখন চিনির সহিত মিশিয়া গাঢ় হইয়া জমিয়া আসিবে তখন নামাইবে।

এবারে পূর্ব্ব প্রস্তুত একখানি রস-মাখা সরের উপরে কুমড়ার পাকটা ঢালিয়া দাও এবং সরের উপরে বেশ সমান করিয়া চাপড়াইয়া দাও। প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু হইবে। এখন উহার উপরে আর একখানি সর বসাইয়া দাও। ঠাণ্ডা হইলে বরফির আকারে কাটিয়া খাইতে দিবে।

গুণাগুণ।—বড়ই সুস্বাদু। খাইতে লাল কুমড়া বলিয়া চেনা যায় না।

---

# আলুমেখেলা।

## ( কাণ্ট্রি কাপ্টেন। )

উপকরণ।—খুব ভাল মটনের রাংএর মাংস আধ সের, আলু আটটী, ঘি আধ পোয়া, নুন প্রায় পোন তোলা, আদা এক তোলা, শুক্নালঙ্কা পাঁচ ছয়টী, হলুদ এক গিরা, পেঁয়াজ আধ পোয়া, জল আড়াই পোয়া, দই এক ছটাক।

প্রণালী।—মাংসটাকে মাঝারি ধরণে ( অর্থাৎ একেবারে ছোট টুকরা না হয় যেন ) খণ্ড খণ্ড করিয়া কাট। আলুগুলার খোসা ছাড়াইয়া চার টুকরা করিয়া কাট। ধুইয়া আলুগুলায় সিকি তোলা নুন মাখিয়া রাখ।

আদা, শুক্নালঙ্কা, হলুদ ও অর্দ্ধেক গুলি পেঁয়াজ একত্র মিহি করিয়া পিষিয়া লও।

বাকী পেঁয়াজগুলি লম্বা দিকে কুচি কাটিয়া রাখ।

ঘি চড়াও। আলুগুলি বেশ বাদামী রংএর ভাজাভাজা হইলে উঠাও। তারপরে সেই ঘিয়ে পেঁয়াজ কুঁচাগুলি লাল করিয়া ভাজিয়া উঠাও। এখন মাংসে মশলা মাখিয়া উহাতে ছাড়। আধ পোয়া জল দাও নুন দাও। খুন্তি দিয়া নাড়িতে থাক। প্রায় মিনিট কুড়ি কষা হইলে পর দই দাও। আবার নাড়িয়া নাড়িয়া কষ। যখনি হাঁড়ির গায়ে লাগিয়া যাইবে তখন বরাবর জলের ছিটা মারিয়া কষিতে থাকিবে। দই দিবার পর প্রায় আর কুড়ি মিনিট কষিবে; তবে মাংসের রং ঘোর লাল হইবে। ঘিয়ের উপরে থাকিলে নামাইবে।

এইবারে মাংস বাসনে সাজাও। বাসনে মাংস ঢালিয়া দিয়া তাহার উপরে পেঁয়াজ-ভাজাগুলি ছড়াইয়া দাও। ইহার উপরে আলুগুলি গোলাকারে সাজাও।

ভোজন বিধি।—ইহা ভাত বা চাপাটী রুটী ইত্যাদির সঙ্গে খাও। "কাণ্ট্রি ক্যাপ্টেন" আমের কাশ্মিরী চাট্‌নি দিয়া খাইতে বেশ।

# ভাপা ভেটকী।

উপকরণ।—ভেটকী মাছ একটি ওজনে প্রায় তিন পোয়া, গাজোর দুইটা, শালগম চারিটা, সেলেরি ( গোড়া সমেত ), জল পাঁচ পোয়া, পেঁয়াজ চারিটা, রাই আধ কাঁচ্চা, গোলমরিচ গুঁড়া আধ কাঁচ্চা, নুন প্রায় এক তোলা, কাঁচা-লঙ্কা ছয়টা, বাগানে মশলা তিন চার ডাল, পুদিনা দুই আঁটি, পাতিনেবু দুটী।

প্রণালী।—গাজরও শালগমের উপরের খোসা ছাড়াইয়া নানাপ্রকার চাকা চাকা ফুল-কাটা করিয়া কাট। অর্থাৎ কোনটী ফুলের মত কোনটী বা তারার মত করিয়া কাট। এইগুলি দিলে ডিশ সাজাইবার সময় দেখিতে বেশ হয়। সেলেরির উপরিভাগের পাতা সমেত ডাঁটা কাটিয়া রাখিয়া দাও; পরে কাজে লাগিবে। এখন সেলেরির নীচের দিকের মোটা ডালটী নানা-প্রকারে ফুল কাটিয়া বানাও। এই সেলেরির নীচেটা গাজর প্রভৃতির মত শক্ত হয়। বানাইতে বেশ সুবিধা।

একটি পেঁয়াজ, বাগানে মশলা ও তিনটা কাঁচালঙ্কা কিমা অর্থাৎ খুব কুচি কুচি কর। ইহার সহিত রাই, গোলমরিচ গুঁড়া এবং আধ তোলা নুন মিশাইয়া আলাদা একটি পাত্রে রাখিয়া দাও। ইহাই মাছের ষ্টাফিং বা পুর হইল।

পূর্ব্বে যে সেলেরি কাটিয়া রাখিয়াছিলে এখন সেগুলি দু তিন টুকরা করিয়া কাটিয়া ধুইয়া রাখ।

পুদিনা শাক ভাল করিয়া ধুইয়া লও। ইহার সহিত একটি পেঁয়াজ, তিনটী কাঁচালঙ্কা কিমা কর। ইহাতে প্রায় পাঁচ আনি ভর নুন মিশাও।

একটি হাঁড়ি করিয়া আধ সের জল চড়াইয়া দাও। তাহাতে ফুল-কাটা গাজর সালগম ও সেলেরিগুলি সিদ্ধ করিতে চড়াইয়া দাও। প্রায় মিনিট পঁচিশ পরে সিদ্ধ হইলে নামাইয়া জল ঝরাইয়া আলাদা উঠাইয়া রাখ।

এবারে মাছটীকে বানাও। ভেটকী মাছের ঠিক গলার কাছে একটু

চিরিয়া তাহার তেল পিত্তাদি বাহির কর। মূড়ার ভিতরের ফুলকো ইত্যাদি বাহির করিয়া পরিস্কার করিয়া ধুইয়া লও। প্রায় সাত আটবার জল বদ্‌লাইয়া ধোও। এইবারে মাছের পেটের ভিতরে ষ্টাফিং বা পূর (যাহা পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে) পোর।

একটি পরিষ্কার শাফ ঝাড়ন আনিয়া তাহাতে মাছটীকে রাখ। মাছের উপরে প্রায় তিন আনি ভর নুন এবং কুঁচা সেলেরি পাতাগুলি ছড়াইয়া দাও। এইবারে ঝাড়নটা দিয়া বেশ টান্ করিয়া মাছটীকে জড়াও। এইরূপে মাছ বেশ আস্ত থাকিবে। আস্ত মাছ যাহাতে ধরিতে পারে সেই বুঝিয়া একটী বড় তিজেল হাঁড়ি বা ডেক্‌চি লইবে। তাহাতে মাছটী রাখিয়া চারিধারে প্রায় পোয়া তিন জল ঢালিয়া দাও। মাছের উপর পর্য্যন্ত জল থাকিলেই হইবে। মিনিট পনেরর ভিতর সিদ্ধ হইয়া গেলে নামাইবে।

এইবারে ডিশ বা প্লেট সাজাও। একটি বাদামী গড়নের বাসন বা ডিশ আনিয়া মাছটী ঝাড়ন হইতে খুলিয়া তাহাতে রাখ। সিদ্ধ ফুল-কাটা গাজর আদি সবজিগুলি মাছের চারিধারে সাজাইয়া দাও। মাছের উপরে কিং পুদিনা শাক প্রভৃতি ছড়াইয়া দাও। মাছ এবং গাজরআদি সবজির উপর সব শেষে নেবুর রস নিংড়াইয়া দিবে।

ভোজন বিধি।—মাখন পাঁউরুটী দিয়া খাও বেশ লাগিবে। ডিনার প্রভৃতিতে সুপ বা সুরুয়ার পর ভাপা ভেটকি খাইতে দাও।

ব্যয়।—মাছ প্রায় পাঁচ আনা, সবজী চার পাঁচ পয়সা। সবশুদ্ধ প্রায় সাড়ে ছয় আনার ভিতর হইয়া যাইবে।

---

# সাঙ্কেতিক গুপ্তলিপি।

বঙ্গ সাহিত্যের পাঠকগণ এক্ষণে "রেখাক্ষর বর্ণমালা" বা "সঙ্গীতের স্বরলিপি" প্রভৃতির বিষয় অজ্ঞাত নহে। কিন্তু সঙ্কেতলিপির বিষয় এখনও একেবারে অজ্ঞ। Dumb letter অর্থাৎ অঙ্গুলী মুদ্রার দ্বারা ইংরাজী অক্ষর ব্যক্ত করিবার উপায় কেহ কেহ জানেন বটে কিন্তু ইংরাজীতে মোটে ছাব্বিশটী অক্ষর ব্যক্ত করিলেই চলে কিন্তু আমাদের ভাষায় স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ লইয়া অনেকগুলি অক্ষর। ততগুলি অক্ষর প্রত্যেকটী অঙ্গুলী মুদ্রার দ্বারা ব্যক্ত করা সহজ নয়। তাই একটু কৌশল অবলম্বন করা চাই। আমরা যে সঙ্কেতিক গুপ্তলিপির বিষয় বলিতেছি তাহাতে অতি সহজে সঙ্কেত দ্বারা এমন কি বহু দূর হইতেও পরস্পরের মধ্যে কথালাপ চলিতে পারে অথচ পার্শ্ববর্ত্তী অনভিজ্ঞ লোকেরা তাহার ঘুণাক্ষরও জানিতে পারিবে না। একটু অভ্যাস করিলে কথা কহিতেও যে সময় লাগে ইহাতেও তাহাপেক্ষা বেশী সময় লাগে না দেখা যায়। কিন্তু আমাদের নিবেদন এই যে বিদ্যার্থীরা যেন ইহার অপব্যবহার না করেন, পরীক্ষালয়ে গিয়া যেন তাঁহারা এই গুপ্তলিপির দ্বারা সঙ্কেত না করেন। এমন অনেক সময় আসে যে সময়ে গুপ্তভাবে মনোভাব ব্যক্ত না করিলে অনেক অনিষ্টের আশঙ্কা সেইরূপ সময়েই ইহার ব্যবহার শ্রেয়।

যে দেশে রাজা আছে সে দেশে মন্ত্রণাদি গুপ্ত রাখিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবনেরও চেষ্টা হইয়া থাকে। যাহাতে স্বদল ভিন্ন অন্য লোকে সে সকল কথা না বুঝিতে পারে সেই জন্য গুপ্তলিপির বা সঙ্কেতের প্রয়োজন। ভারতে এইরূপ গুপ্ত সংকেত দ্বারা মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার উপায় বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মহাভারতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডুপুত্রেরা নানারূপ গুপ্ত সঙ্কেত দ্বারা কৌরবদিগের দুরভিসন্ধি হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা আজ যে গুপ্তলিপির

কথা বলিতেছি কথিত আছে এইরূপ সঙ্কেত দ্বারা রাম সূর্পণখার নাসাচ্ছেদনের জন্য লক্ষ্মণকে গুপ্তভাবে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

অহিফণ কমল চক্র টঙ্কার
তরবর পবন যোবন শৃঙ্গার
অঙ্গুলী অক্ষর চুগুটী মাত্রা
রাম কহে লক্ষ্মণ সে বার্ত্তা॥

অহিফণা কমল চক্র টঙ্কার
তরুবর পবন যৌবন শৃঙ্গার
অঙ্গুলী অক্ষর তুড়ি ও মাত্রা
রাম কহেন লক্ষ্মণেরে বার্ত্তা॥

অহিফণ *—সাপের ফণা; হস্ত দ্বারা সাপের ফণা দেখাইতে হইবে। এইরূপ সঙ্কেত করিলে স্বরবর্ণ মাত্রকেই বুঝাইবে। অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ এইগুলি স্বরবর্ণ।

কমল—এই সঙ্কেত দ্বারা কবর্গের ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচ অক্ষরই বুঝায়। করতল ও পাঁচ অঙ্গুলীর দ্বারা অনেকটা কমলের আকারে সঙ্কেত করিতে হইবে।

চক্র—তর্জনী অঙ্গুলী ঘুরাইয়া চক্রের সঙ্কেত করিলে চবর্গের চ, ছ, জ, ঝ, ঞ এই অক্ষরগুলিকে বুঝাইবে।

টঙ্কার—নহবৎ বাজাইবার কালে বড় বাঁয়ার মত যে ঢোঁস বাজায় তাহাতে কাঠি দিয়া বাজাইলে যে টং টং শব্দ হয় তাহারই নাম টঙ্কার। কাঠি দ্বারা বাজাইবার কালে বাজাওয়ালারা যেরূপে কাঠি নাড়ে তাহারই অনুকরণে দুই হাতের তর্জনী অঙ্গুলী নাড়িতে হইবে। এই সঙ্কেতের নাম 'টঙ্কার'। "টঙ্কার" সঙ্কেত দ্বারা ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, এই টবর্গের অক্ষরগুলি বুঝাইবে।

* "অহিফণ" শব্দ হইতে ইংরাজী "hyphen" শব্দ খুব সম্ভবতঃ আসিয়াছে। "হাইফেনে"র আকার অনেকটা অহিফণার মতই ছিল।



তর্‌বর্—"তরবর" শব্দ সম্ভবতঃ 'তরুবর' শব্দ হইতে আসিয়া থাকিবে, অথবা কম্পনদ্যোতক শব্দ মাত্র হইলেও হইতে পারে। ইহার অর্থ গাছের ছায়া। * যেমন গাছের ছায়া ঝিকিমিকি নড়িতে থাকে তাহারি অনুকরণে করতল অধোমুখ করিয়া তিন চারিবার হস্ত নাড়িয়া দেখাইতে হইবে যেন গাছের ছায়া নড়িতেছে। এইরূপ সঙ্কেত করিলে ত, থ, দ, ধ, ন, এই তবর্গের অক্ষরগুলি বুঝাইবে।

পবন—যেমন তাল পাতার পাখা করিয়া বাতাস খাও সেই প্রকার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া দেখাইতে হইবে যেন বাতাস খাইতেছ। এইরূপে পবন সঙ্কেত দ্বারা পবর্গের অক্ষরগুলি (প, ফ, ব, ভ, ম) বুঝাইবে।

যৌবন—যৌবন বয়সে যেমন সকলে স্বভাবতঃ গোঁফে তা দিয়া থাকে সেই ধরণে করিলেই যৌবন সঙ্কেত করা হইল। যৌবন সঙ্কেত দ্বারা য, র, ল, ব এই চারিটী অক্ষর বুঝায়।

শৃঙ্গার—দুই হাত মাথার কাছে নাড়িয়া চুল বাগাইবার বা চুল আঁচড়াইবার ভাব দেখাইতে হইবে। এই শৃঙ্গার সঙ্কেত দ্বারা শ, ষ, স, হ, এই চারিটী বর্ণ বুঝায়।

উপরোক্ত অষ্ট প্রকার সঙ্কেত (অহিফণ, কমল, চক্র, টঙ্কার, তর্‌বর্, পবন, যৌবন, শৃঙ্গার) দ্বারা স্বরবর্ণ, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, অন্ত্যস্থবর্ণ ও উষ্মবর্ণ ক্রমান্বয়ে অক্ষরের এই অষ্টগণ ব্যক্ত হয়।

অঙ্গুলী—অঙ্গুলী অক্ষর সম্বন্ধীয় সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দেয়। যথা "কমল" সঙ্কেত দ্বারা ক, খ, গ, খ, ঙ কবর্গের এই পাঁচটী অক্ষরই বুঝায়। এক্ষণে ঐ পাঁচটী অক্ষরের মধ্যে প্রথম অক্ষর 'ক' বুঝাইতে গেলে এক সংখ্যা দ্যোতক তর্জনী অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় অক্ষর খ বুঝাইতে হইলে দুই সংখ্যা নির্দ্দেশক তর্জনী ও মধ্যম অঙ্গুলীদ্বয় দেখাইতে হইবে। এইরূপ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষরের বেলায় ক্রমান্বয়ে তিনটী অঙ্গুলী, চারিটী অঙ্গুলী ও পাঁচ অঙ্গুলী দেখাইয়া সেই সেই অক্ষরের সংখ্যা

* এই "তর্‌বর্" শব্দ হইতে ইংরাজী কম্পনার্থ Tremble শব্দ আসিতে পারে।

নির্দ্দেশ করিবে।

**চুগুটী**—চুগুটী কিনা তুড়ি। তুড়ি মাত্রাবোধক। স্বরবর্ণের দীর্ঘ মাত্রা হইলে দুইটী তুড়ি দিতে হইবে। হ্রস্ব মাত্রায় একটী তুড়ি। যেমন আকার বা দীর্ঘ ঈকার বা দীর্ঘ ঊকার প্রভৃতি ব্যক্ত করিবার কালে দুইটী তুড়ি দিতে হয়। যখন ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মাত্রা যুক্ত হইবে তখন তুড়ির দ্বারাই সেই মাত্রা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথম অকার বুঝাইতে একটী তুড়ি, দ্বিতীয় আকার মাত্রা বুঝাইতে দুইটী তুড়ি ইত্যাদি। এরূপ স্থলে হ্রস্ব, দীর্ঘ লইয়া অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ এই চৌদ্দটী স্বরমাত্রা ধরিতে হইবে। যথা, "পু" ব্যক্ত করিতে হইলে, প্রথমে "পবন" সঙ্কেত করিয়া পরে তর্জনী অঙ্গুলী দেখাইলে পবর্গের প্রথম বর্ণ 'প্' বুঝাইল। তাহার পর 'প'য়ে উকার মাত্রা বুঝাইবার জন্য পাঁচটী তুড়ি দিবে; কারণ হ্রস্ব উকার চৌদ্দটী স্বরমাত্রা মধ্যে পঞ্চম স্থানীয়। কিন্তু যেখানে শুদ্ধ স্বর (ব্যঞ্জনের সহিত অযুক্ত, যেমন "উমা"র 'উ') ব্যক্ত করিতে হইবে, সেখানে প্রথমে 'অহিফণ' সঙ্কেত করিয়া পরে অঙ্গুলী দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবে। তৎপরে হ্রস্ব বা দীর্ঘ মাত্রা দ্যোতক একটী বা দুইটী তুড়ি দিলেই চলিবে।

**অনুস্বর, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু।**—অনুস্বর বুঝাইতে গেলে তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা গোলাকার চিহ্ন দেখাইলেই হইবে। দুই হাতে ঐরূপ গোলাকার চিহ্ন দেখাইলেই বিসর্গের সঙ্কেত হইল। তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকার সঙ্কেত করিলেই চন্দ্রবিন্দু হইল।

**যুক্তাক্ষর**—যুক্তাক্ষর ব্যক্ত করিতে গেলে দুইটী অক্ষরের জন্য পৃথক পৃথক সঙ্কেত করিয়া দুই হস্তের তর্জনী বা এক হস্তের তর্জনী ও মধ্যম অঙ্গুলী দ্বারা বজ্র বা যোগ চিহ্নের (+) ন্যায় করিয়া তৎপরে মাত্রাদ্যোতক তুড়ি দিতে হইবে। যথা, প্র=প্+র্+অ, প্রথমে 'পবন' সঙ্কেত করিয়া তর্জনী দেখাইলেই 'প্' হইল। পরে 'যৌবন' সঙ্কেত ও তর্জনী ও মধ্যম অঙ্গুলী দেখাইলে 'র্' হইল। তাহার পর যুক্তাক্ষর বুঝাইবার জন্য তর্জনীতে তর্জনীতে যোগ চিহ্ন করিলে। তাহার পরে একটী তুড়ি দিলে অকার মাত্রা বুঝাইল। এইরূপে গুপ্তলিপিতে 'প্র' বুঝাইল।



**উদাহরণ**—"পুণ্য" কথাটী ব্যক্ত করিতে গেলে, প্রথমে "পবন" সঙ্কেত পূর্ব্বক তর্জনী অঙ্গুলী দেখাইলে, তৎপরে উকার মাত্রা জ্ঞাপনের জন্য পাঁচটী তুড়ি দিলে 'পু' হইল। এইবারে 'ণ্য' বুঝাইতে হইবে। প্রথমে টঙ্কার সঙ্কেত পূর্ব্বক পাঁচটী অঙ্গুলী দেখাইলে 'ণ্' বুঝাইল তৎপরে 'যৌবন' সঙ্কেত পূর্ব্বক তর্জনী অঙ্গুলী দেখাইলে য বুঝাইল। পরে যুক্তাক্ষরের জন্য তর্জনীতে তর্জনীতে যোগচিহ্ন দেখাইয়া, অকার মাত্রা জ্ঞাপনার্থে একটী তুড়ি দিলে 'ণ্য' বুঝাইল। এইরূপে 'পুণ্য' সংকেতলিপিতে ব্যক্ত হইল।

শ্রীঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

---

# আগমনী সঙ্গীত।

এ গানটী আমরা যতদূর জানি এপর্য্যন্ত কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই।

সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

নগর নাগরি সবে কহে গিয়ে মেনকায়
ওগো গিরিজায়া তব নন্দিনী আগত প্রায়।
ঐ আসিছেন গিরি ল'য়ে তোমার প্রাণেশ্বরী
চল চল ত্বরা করি হেরি গিয়ে অভয়ায়।
এইরূপে নারীগণ হ'য়ে হরষিত মন
মঙ্গলারি আগমন রাণীরে জানায়।
সুমঙ্গল বাণি শুনি আনন্দে অস্থিরা রাণী
না সম্বরে বাসবেণী কোথা-উমা ব'লে ধায়।

পর্ব্বতরাজ গেহিনী ল'য়ে সকল সঙ্গিণী
হেরিতে ভবভাবিনী ত্বরা করি যায়।
তনয়া নিকট গিয়ে বিধু মুখ নিরখিয়ে
আনন্দে উন্মত্তা হ'য়ে বলে ওমা কোলে আয়॥

তালি । ২ঃ (স্থা, স্ত, ভো আরম্ভ) । ৩ । ০ । ১ ॥
মাত্রা । ২ । ৩ । ২ । ৩ ॥

কথা—বাবু আনন্দ নারায়ণ ঘোষ। সুর—৺বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
(ইনি পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ ঘোষ গোষ্ঠীর অন্যতম।)

(স্থা) ঃ— "প্‌ধা" বা "ধা" ধা। ধ্‌নিঁ মাঁ
(স্থা) ঃ— ন বা ন গ। র —

মা । পা পা । পা মা পা । প্‌ধা ধা । ধা নিঁ
না । গ রি । স — বে । ক হে । গি —

পা । মা পা । ম্‌পা মা ম্‌গাঁ । গাঁ গাঁ
য়ে । মে ন । কা — — । ও গো

গঁ্‌মাঁ রেঁ রে । রে রে । রে সা সা ।
গি — রি । জা য়া । ত — ব ।

২
রে মা । মাঁ গাঁ পা পা । পা সাঁ নিঁ ।
ন ন্দি । নী — — আ । গ ত — ।



২
নঁ্‌সা নিঁ ধা । (স্তঃ— মা পা । নি নি
প্রা — য়্‌ । (স্ত)ঃ— ও ই । আ —

২..... ২.....
নি । সা সা । সাঁ নিঁ সা সা ।
সি । ছে ন । গি — — রি ।

২ ২.....
ন্‌সাঁ নিঁ সা । স্‌রেঁ গাঁঁ সা ।
ল — য়ে । তো — মার্‌ ।

..... ২ ২
সাঁ নিঁ সা । নঁ্‌সা নিঁ ধা । ধা ধা ।
প্রা — ণে । শ্ব — রী । চ ল ।

পা পা । পাঁ মাঁ পাঁ মাঁ পা । ধা ধা । ধা
ত্ব রা । ক — — — রি । হে রি । গি

ধ্‌নিঁ পা । মা পা । ম্‌পা মা ম্‌গাঁ । (ধ্রুব) গাঁ গাঁ ।
— য়ে । অ ভ । য়া — —য়্‌ । (ধ্রুব) ও গো ।

গঁ্‌মাঁ রেঁ রে । রে রে । রে সা সা । "সা"
গি — রি । জা য়া । স — বে । ন

২ ২
বা "রে" মা । মা২ মা । পা সাঁ নিঁ ।
—ন ন্দি । নী আ । গ ত — ।

২
নঁ্সা নিঁ ধা । (স্থা-পু)ঃ— ধা ধা । ধ্নিঁ২
প্রা — —য়্ । (স্থা-পু)ঃ— ন গ । র

মা মা । পা পা । পা মা পা । (ভো)ঃ—
— না । গ রী । স — বে । (ভো)ঃ—

মা পা । পা২ পা । পা পা । পাঁ মাঁ
এ ই রূ পে । না রী । গ —

পাঁ মাঁ পা | ধা ধা । ধ্নিঁ২ পা । মা পা
— — ণ | হ য়ে | হ র | ষি ত

ম্পা মাঁ গাঁ গাঁ | গাঁ গাঁ | গঁ্মাঁ রেঁ
ম — — ন | ম ঙ্গ | লা —

রে | রে রে | রে সা সা | রে মা |
রি | আ গ | ম — ন | রা ণী |

মাঁ গাঁ পা মা. | পা২ | +পা৩ | মা পা
রে — — জা | না | —য়্ | সু ম

২..... ২.....
প্নি২ নি | সা সা | সাঁ নিঁ সা সা |
ঙ্গ ল | বা ণি | শু — — নি |



২
সাঁ নিঁ সা | রে রেঁ গাঁঁ সা নিঁ
আ — ন | ন্দে — — অ ২স্থি

২ ২
সা | নঁসা নিঁ ধা | ধা ধা | ধ্নিঁ২ মা |
রা | রা — ণি | না স | ম্ব রে |

পা পা | পাঁ মাঁ পাঁ মাঁ পা | "ধা ধা"
বা স | বে — — — ণী | কো থা

বা "ধা ধ্সা" | ধাঁ নিঁ পা | মা পা
কো থা | উ — মা | ব লে

ম্পা মা ম্গাঁ | (স্থা—পু)ঃ— গাঁ গাঁ |
ধা — —য়্ | (স্থা—পু)ঃ— ও গো |

গঁ্মাঁ রেঁ রে | রে রে | রে সা সা |
গি — রি | জা য়া | ত — ব |

২
রে মা | মাঁ গাঁ পা পা | পা সাঁ
ন ন্দি | নী — — আ | গ ত

নিঁ | ২নঁ্সা নিঁ ধা | (স্থা—পু)ঃ— ধা ধা |
— | প্রা — —য়্ | (স্থা—পু)ঃ— ন গ |

ধ্নিঁ পা মা | পা পা | পা মা পা |
র — না — গ রী | স — বে |

( ভো ):— মা পা | পা২ পা | পা পা | স্প
( ভো ):— প র্ব্ব | ত রা | জ গে | হি

মা পা | প্ধা ধা | ধা ধ্নিঁ পা | প্মা
— নী | ল য়ে | স ক — | ল

পা | স্পা মা½ গাঁ½ গাঁ | গাঁ গাঁ | গঁ্মা¼ রে½
স | ঙ্গি — — না | হে রি | তে —

রে | রে রে | "স্রে" বা "রে" সা সা |
ভ | ব ভা — বি বি — নী |

রে মা | মা¼ গা¼ মা½ পা মা | পা২ |
ত রা | ক — — — রি | যা |

২.............
+পা৩ | মা. পা | নি২ নি | সা সা |
—য়্ | ত ন | য়া নি | ক টে |

.............................................. ২......................
সা সা সা — সা½ নিঁ½ সা | স্রে
গি — য়ে | খি — ধু | মু



...................................
২
রে½ গা½ সা | সা½ নিঁ½ সা | ন্ঁসা নিঁ
— —. খ | নি — র | খি —

ধা | ধা ধা | ধ্নিঁ "নিঁ½ মা½" বা "নিঁ"
য়ে | আ ন | ন্দে — — —

২
মা | পা পা | পা¼ মা¼ পা পা | ধা ধ্সা
উ | ন্ম ত্তা | হ — — য়ে | ব লে

ধা½ নিঁ½ পা | মা পা½ মা½ | ম্পা মা
ও — মা | কো লে — | আ —

ম্গাঁ |• ধ্রুঃ গাঁ গাঁ | গঁ্মা¼ রে½ রে | রে রে |
—য়্ | ধ্রুঃ ও গো | গি — রি | জা য়া |

রে সা সা | রে মা | মা¼ গা¼ পা
ত — ব | ন ন্দি | নী — —

পা |• পা সা½ নিঃ½ | ন্ঁসা নিঁ ধা |
আ | গ ত — | প্রা — য়্ |

( স্থা—পু ):— ধাঃ ধ ......॥॥
( স্থা—পু ):— ন গ ......॥॥

এই গানটী ঝাঁপতালের পরিবর্ত্তে জতেও গাওয়া যাইতে পারে—জতেও গাওয়া হইত।

শ্রীহিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

# পরাজয়।

"ও কিসের কোলাহল" ?

"সে কি, তুই জানিস না ?"

"তবু শুনি"

"আজ নূতন দুর্গাধিপতির পুত্র আসিতেছেন, তাই এই সমারোহ।"

"সত্য ওই নীচ দুরাচার, পরদ্রব্য অপহরণকারী, ও দুর্গাধিপতি, আর আমরা কে ?"

"চুপ কর মা শুনিলে লোকে তোকে পাগল বলিবে।"

"বলিলে কি করিব, এই আমি চলিলাম—দেখি লোকে কাহাকে কি বলে।" এই বলিয়া একটি মুক্ত কেশী বালিকা ছুটীয়া সেই ক্ষুদ্র কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাজপুতানার পর্ব্বত সঙ্কুল প্রদেশে, একটি গ্রামে, এক ক্ষুদ্র কুটীরে এক জন বর্ষিয়সী রমণী ও বালিকায় কথা হইতেছিল।

বালিকা কোন দিকে না চাহিয়া সেই চির পরিচিত দুর্গাভিমুখে ছুটিয়া চলিল, সহসা দুর্গের সন্মুখে লোক সমারোহে, বাদ্যের কোলাহলে স্তম্ভিত হইয়া গেল, পশ্চাতে অশ্বের হ্রেষারবে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল, একজন দীর্ঘাকার সুন্দর যুবক আকুল নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া সেই অসংযত অশ্বের

রাশ টানিয়া ধরিয়াছেন। অশ্ব কোন রূপে বাধা না মানিয়া ছুটিয়া চলিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল অন্ধকার, বালিকা মুচ্ছিতা হইয়া ধরণীধূলায় লুটাইয়া পড়িল। যুবক নিকটবর্ত্তী ব্যক্তির হস্তে অশ্বের রাশ দিয়া, আপনি ত্বরিতে অশ্ব হইতে নামিয়া সেই ভূপতিতা বালিকার মস্তক আপনার অঙ্কে তুলিয়া ধরিলেন। একজন অনুচরকে ডাকিয়া বলিলেন

"শীঘ্র জল আন, বালিকা অচেতন হইয়াছে।"

দুর্গ হইতে দুর্গাধিপতি বাহির হইয়া আসিলেন।

"এ কি বিনয় কি হইয়াছে? ও কে?"

"আমার অশ্ব এই বালিকার প্রতি ছুটিয়া ছিল, সেই ভয়ে বালিকা মুচ্ছিতা হইয়াছে।"

"আঘাত লাগে নাই ত?"

"কি করিয়া বলিব? শুধু ললাটে এক স্থানে ক্ষতচিহ্ন দেখিতেছি শোনিত পড়িতেছে"

দুর্গাধিপতির আজ্ঞায় সেই সমারোহ বাস্তরব স্থগিত হইল। তাঁহারা উৎসুক নয়নে বালিকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ মুখে ও মস্তকে জল সিঞ্চনের পর বালিকা চক্ষু মেলিয়া চাহিল সেই দুটি আকুল আগ্রহ পূর্ণ নয়নের দৃষ্টি তাহার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল। সে স্বপ্নাহতের মত ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। দুর্গাধিপতি সেই বালিকার অতুলণীয় রূপরাশিতে মুগ্ধ হইয়া অনুচর দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"এ বালিকা কে, তোমরা জান কি?"

বহু কণ্ঠ একত্রে স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল

আমাদিগের পুরাতন দুর্গাধিপতির একমাত্র কন্যা, তারা দেবী তখন তারা দেবী উঠিয়া দাঁড়াইল, পূর্ব্বের গর্ব্বিত ভাবে তাহার আনন সুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে আহতা ফনিণীর মত মস্তক উত্তোলন করিয়া যুবকের প্রতি চাহিয়া গর্ব্বিত ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিল

"দেখিলে এ দুর্গ কার? আমি কে, আর তোমরা কে"

এই বলিয়া আর সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটীয়া চলিয়া গেল। বিনায়ক রাওের চক্ষু প্রান্তে যেন একটি বিদ্যুত শিখা ঝলসিয়া গেল। সেই



মধুর কণ্ঠস্বরে যেন বীনাধবনি হইল। সেই সরল নির্ম্মল হৃদয়ে এক খানি মুখ অঙ্কিত হইয়া গেল।

সে চিহ্ন কি মুছিবার? সে মুখ কি ভুলিবার?

কুটীরে সেই বর্ষিয়সী রমণী আকুল আগ্রহে তাহার পথ চাহিয়া ছিলেন। তারা উল্কার মত ছুটীয়া সেই কুটীরে প্রবেশ করিয়া রমণীর ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া অবশ হইয়া পড়িয়া রহিল।

রমণী সস্নেহে সেই অযত্নে পতিত কেশগুচ্ছ সরাইয়া তাহার মুখ দুই হস্তে তুলিয়া বলিলেন

"তুই কেন গিয়াছিলি তারা?"

তারার চক্ষু রোষে অপমানে জ্বলিয়া উঠিল সে কঠিন স্বরে কহিল

"দেখিতে গিয়াছিলাম আমাদিগের পুরাতন কর্ম্মচারীরা আজ এই নূতন দুর্গাধিপতির পুত্রকে কিরূপ সম্মান করিয়া সমাদরে গ্রহণ করিতেছে"

"আমাদিগের অদৃষ্টের দোষ, দুর্গাধিপতি কি করিবে?"

"অদৃষ্টের দোষ? মা তুমি কেবল অদৃষ্টের দোষ দেখিয়া আসিতেছ, স্বেচ্ছাচারী, ন্যায় শূন্য অধার্ম্মিক রাজা, তাই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা, ওঃ আমি যদি পিতার পুত্র হইতাম"—আর বাক্য সরিল না তারা দেবী গভীর চিন্তায় মগ্না হইল।

তারা পূর্ব্ব দুর্গাধিপতি অনন্ত দেবের একমাত্র আদরের দুহিতা। সম্প্রতি অনন্ত দেবের মৃত্যুর পরই এই দুর্গ এবং তাহার সকল জায়গীর জমি রাণা কর্ত্তৃক বর্ত্তমান গঙ্গাধর রাও পাইয়াছেন। গঙ্গাধর রাওয়ের একমাত্র পুত্র বিনায়ক রাও রাণার সহিত সংগ্রামে গিয়া জয় লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাই এই সমারোহ। অনন্ত দেবের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার স্ত্রী শুনিলেন তাঁহাদিগের আর সে দুর্গে অধিকার নাই, কেবল মাত্র নূতন দুর্গাধিপতির অনুগ্রহে নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে, তখন তিনি একদা গভীর রজনীতে তাঁহার একমাত্র দুহিতা ও বিশ্বাসী ভৃত্য মহাবীরকে লইয়া গ্রাম প্রান্তে সেই ক্ষুদ্র কুটীরে আগমন করিলেন। অনন্ত দেবের সহধর্ম্মিণী আসিবার সময় যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হইতেছে।

তারাদেবী শৈশবের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, শৈশবে ও কৈশোরের মধুর মিলন স্থানে, যে স্থানে রমণীর মাধুর্য্য ও লাবণ্য বিকশিত হইয়া উঠে তারার জীবন সেই স্থানে আগমন করিয়াছে। তারা আসামান্য সুন্দরী, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য পুরুষোচিত গর্ব্বে মিশ্রিত। শৈশবে সে পিতার অত্যধিক আদরে লালিত হইয়াছিল, সর্ব্বদা পিতার সঙ্গে থাকিত, এই জন্য তাহার অনেক সময় বালকের মত নির্ভিক ভাব হৃদয়ে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার হৃদয়ে দুইটি ভাব বিশেষ প্রবল ছিল, যাহাকে ভাল বাসিত, স্নেহ দয়া করিত তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। আর যে বিষয়ে ঘৃণা জন্মিত, তাহা এত প্রবল ছিল কিছুতেই মুছিত না। সে সেই শৈশব হৃদয়ে তাহার পিতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জানিয়া ভক্তি করিত, ভাল বাসিত তাহার হৃদয়ে অন্য ভাব বা মুর্ত্তির ছায়াপাত হয় নাই। সে পিতার সহিত দরিদ্র প্রজাদিগের গৃহে গিয়া তাহাদের অবস্থা সচক্ষে দেখিত। দুঃখীর দুঃখে কাতর হৃদয় বিগলিত হইত। দরিদ্রের গৃহে গিয়া সে অর্থের দ্বারা খাদ্যদ্রব্য দ্বারা দারিদ্র্য দুঃখ নিবারণ করিত, পীড়িত ব্যক্তিকে সাধ্যতম শুশ্রুষা করাইত। তাহাকে সকলে দুর্গাধিপতির পুত্র বলিত। তাহার জীবনের ব্রত সহসা ছিন্ন করিয়া সহসা তাহার পিতা তাহার নিকট চির বিদায় লইয়া গেলেন। তাহার সেই সুখ শান্তিময় জীবনের স্রোত অন্য দিকে ছুটিল। দারুণ নৈরাশ্যে অপমান অভিমানে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল।

সে যখন শুনিল দুর্গকে জীর্ণসংস্কার করাইয়া নূতন দুর্গাধিপতি আসিতেছেন, তখন তাহার হৃদয়ে কে যেন সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিল। তাহার পিতার দুর্গ অন্যে লইল, তাহার সেই আজন্মের স্নেহের গৃহ অন্যের হইল। আজ যদি সে অনন্ত দেবের কন্যা না হইয়া পুত্র হইত, তাহা হইলে—হায় তারা তুমি রমণী, তুমি চিরকাল স্নেহের শিকলে সকলকে বাঁধিতে পারিবে। ভালবাসায় স্নেহে দয়ায় সর্ব্বজয়ী হইবে, অন্য উপায় কি নারী হৃদয়োচিত?

[ ২ ]

তাহার পর এক দিন সন্ধ্যার সময় তারা দেবীর সহিত পথে বিনয়ের সাক্ষাৎ হইল। সম্ভ্রমে তারা দেবীকে অভিবাদন করিয়া অতি মধুর স্বরে বিনায়ক বলিলেন



"সে দিন আপনার আঘাত লাগে নাই ত?"

ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে তারা দেবী কহিলেন

"আপনার সে সংবাদে প্রয়োজন?? আমি অপরিচিত ব্যক্তির সহিত পথে কথা কহিতে সক্ষম নহি," তারা দ্রুত পদে অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল।

ব্যথিত হৃদয়ে সজল নয়নে বিনায়ক সেই পথ পানে চাহিয়া রহিলেন।

অতি মধুর সন্ধ্যাকাল। পার্ব্বত্য প্রদেশের সন্ধ্যাকালের বর্ণনা ভাষায় হয় না। সেই উন্নত শৈল শ্রেণী, শৈল শ্রেণীর উপর ঘন বৃক্ষ শ্রেণী কেমন সুন্দর গম্ভীর ও মহান দেখাইতেছে। শৈল তলে স্বচ্ছ বারি রাশি পূর্ণ সরোবর। তাহার চতুর্দ্দিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্র। আকাশে অস্তগামী সূর্য্যের কনক কিরণ অতি মৃদু ভাবে হাসিতেছে সে মধুর স্নিগ্ধ দীপ্তিতে অসহন তাপ নাই। সহসা সূর্য্য ডুবিয়া গেল, আকাশ বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিল। কে যেন তুলি দিয়া সেই রঙের পর রঙ চিত্রিত করিয়া দিল। সেই গাঢ় নীলিমার পর কি সুন্দর নয়ন রঞ্জন সোনালী ধারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তুষারনিভ শুভ্র মেঘের পাশে কেমন ধূসর মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বিহঙ্গমের কলকণ্ঠে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহারা কলরব করিয়া আপন আপন নীড়ে প্রবেশ করিতেছে। সহসা সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। নীল আকাশ প্রান্তে সন্ধ্যা তারার করুণ আঁখি ফুটিয়া উঠিল।

সেই সন্ধ্যায় একাকিনী তারা দেবী দরিদ্র গ্রামবাসী দিগের গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল। সঙ্গে মহাবীর ছিল, সে নিকটবর্ত্তী শস্যক্ষেত্র দেখিতে গিয়াছে। তারা সেই সরোবর কূলে অন্যমনা হইয়া বসিয়া রহিল। সে দরিদ্র গ্রাম বাসী দিগের নিকট নূতন দুর্গাধিপতি ও তাঁহার পুত্র বিনায়ক রাওের যশগান শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছে। সকলেই বার বার তাঁহার প্রশংসা গীতি গাহিল। তারা মুগ্ধ, সহসা একি জলে এ কাহার ছায়া? সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বিনায়ককে দেখিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া সলিলের দিকে অগ্রসর হইয়া চরণ বাড়াইল, সহসা বারি রাশি মধ্যে পড়িয়া গেল। বিনায়ক ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাহার সহিতই জলে পড়িয়া তাহাকে ধরিয়া সন্তরণ দিয়া কূলে আনিলেন। তারা অচেতন হইয়া মৃতের মত পড়িয়া আছে। বিনায়ক রাও ভয়াকুল চিত্তে চারিদিকে চাহিয়া কাহাকেও না দেখিয়া

তাহাকে লইয়া বসিয়া রহিলেন, সেই আর্দ্র বসনা মুক্তকেশী বালিকার মুখের প্রতি চাহিয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন।

অল্পে অল্পে তারা দেবীর চেতনা হইতেছিল। সেই পদ্ম কোরকের মত বিশাল নয়ন দুটি ঈষৎ উন্মেলিত করিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল

'বিনায়ক—বিনয়'

সেই দুর্লভ গোলাপের দলের মত রাঙা অধর প্রান্তে সে কথা আসিয়াই মিলিয়া গেল। বালিকার হৃদয়ে দুইটি ভাবের দ্বন্দ হইতেছিল, এক দিকে ঘৃণা দ্বেষ, অন্য দিকে রমণীর সার যত্ন অমূল্য প্রেম রাশি। অবশেষে প্রেমেরি জয় হইল, তাই সে মোহমুগ্ধ অচেতন বালিকা নিজের অজ্ঞাত সারে আপন প্রণয় দেবতার নাম উচ্চারণ করিল।

সেই আশায় চঞ্চল চিত্ত যুবকের হৃদয়ে সেই অস্ফুট বাক্যের ধ্বনি সুখ স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করিল।

এমন সময় শস্যক্ষেত্র হইতে মহাবীর ফিরিয়া আসিল, বিনায়ক রাও তাঁহাকে বলিলেন

"আমি এই স্থান দিয়া গৃহে ফিরিতেছিলাম, এই সরোবর তীরে আসিবা মাত্র তারা দেবী সলিলে পড়িয়া গেলেন, আমার জন্য দুইবার তাঁহার দুর্ঘটনা ঘটিল সে জন্য অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি"—

মহাবীর তাঁহাকে বাধা দিয়া সম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া তারা দেবীর জীবন দাতা বলিয়া ধন্যবাদ দিল।

এমন সময় তারা দেবীর সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান হওয়ায়, তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া আকুল নয়নে চাহিল, আবার সেই প্রেমপূর্ণ আনন সেই আত্ম-ত্যাগী দৃষ্টি তাহার নয়নে পতিত হইল। সে নতমুখে ধীরে ধীরে মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করিল

"কি হইয়াছে মহাবীর ?"

"তোমার মনে নাই তুমি জলে পড়িয়া গিয়াছিলে ? ইনি তোমার জীবন দাতা। ইনি দুইবার তোমার জীবন রক্ষা করিলেন"

তাহার কথা শেষ না হইতে বিনায়ক রাও কহিলেন

"আমি না আসিলে এ বিপদ ত হইত না, আমার জন্য দুইবার এই দুর্ঘটনা



ঘটীল, সে জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন কি ?"

লজ্জার অনুতাপে তারার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। প্রেমের স্নিগ্ধ ধারায় সে পাষাণ হৃদয় গলিতেছিল, সে নিরুত্তরে আনত আননে ভূমি পানে চাহিয়া রহিল।

মহাবীর কহিল

"আপনাকে ধন্যবাদ—তারা দেবী জান ইনি কে ?"

তারা দেবী পুনরায় চাহিলেন, আবার মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ের চকিত দৃষ্টি উভয়ের দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল।

তখন মহাবীর কর জোড়ে কহিল "আপনি আমাদিগের কুটীরে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগমন করিলে তারা দেবীর জননী অতিশয় আনন্দিতা হইবেন, কেমন নয় তারা ?

মহাবীর অতি পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য তাহাকে শৈশব কাল হইতে পালন করিয়াছে, সেই জন্য নাম ধরিয়া ডাকিত।

সেই কথা শুনিয়া তারার কপোলে সরমে কি রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল।

[ ৩ ]

সেই অবধি প্রায় তাহাদের সাক্ষাৎ হইত। প্রভাতে তারা আপনা-দিগের গৃহ প্রান্তের কুসুম কাননে, পুষ্প চয়নে ব্যস্ত থাকিত, তখন হয়ত সেই পথ দিয়া যাইবার সময় বিনায়ক একবার দাঁড়াইয়া দুটি কথা কহিয়া যাইতেন। কখনো শৈলতলে সন্ধ্যায় উভয়ের সাক্ষাৎ হইত। তারা দেবী অতি সাবধানে দুটি একটি কহা কহিত, যেন সে সবলে হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিত। সেই গর্ব্বিত মুখের ভাবে কি মধুর কোমলতার শ্রী ফুটিয়া উঠিয়া-ছিল। সহসা যেন বালিকা বয়স কৈশোরের মধুর স্পর্শে সরিয়া গিয়াছিল। সে কথা না কহিলেও বিনায়ক রাওয়ের তৃষিত দৃষ্টির তলে চক্ষু অবনত করিয়া থাকিত, কারণে অকারণে তাহার কপোলে রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিত। যদি কখনো উভয়ের নয়ন, উভয়ের দৃষ্টিতে মিলিত হইত, তাহা হইলে উভয়ে কি সেই অসীম গভীর প্রণয় সাগরের কূল পাইতেন ? উভয়ের হৃদয়ের ভাব আর উভয়ের নিকট গোপন নাই। তারা সেই কঠিন হৃদয়ে প্রণয় দেবতার মূর্ত্তি

স্থাপিত করিয়াছে। প্রস্তরের অঙ্কিত চিত্র কি মুছিবার ?

আর বিনায়ক রাও—তিনি প্রথম দর্শনেই তাঁহার হৃদয় মন সমস্ত সেই বালিকার চরণে সমর্পন করিয়াছেন। হায় তারাদেবী জানিত না—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কবে ধরা পড়ে কে জানে—
গরব সব হায় টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।"

একদা মধ্যাহ্নে তারা দেবী ও তাহার জননীতে কথা হইতেছিল। তাহার জননী মৃদু হাসিয়া বলিলেন

"তারা এখন যে আর বিনায়ক রাওের উপর রাগ নাই ?"

আনত মুখে তারা রুদ্ধ স্বরে কহিল

"কে বলিল ?"

"কেন এখন ত দেখা হলে বেশ কথা বার্ত্তা কোস, মহাবীর বলছিল বিনায়ক রাও নাকি প্রায় তোর সঙ্গে বেড়াতে যান। যেদিন তিনি এখানে এসেছিলেন, সেদিনের সমারোহ দেখে তোর কি ভাবান্তর হয়েছিল, মনে আছে ?" তারা দেবীর চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইল, আবার সরমে কপোলে কি রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল, সে ধীরে ধীরে কহিল

"মা সেদিনের কথা বোলোনা, আমার নিজের উপর ঘৃণা হয়, জানত এ দেশের সকল লোকে বিনায়ক রাওয়ের গুণে, তাঁহার পিতার দয়ালুতার মুগ্ধ। আমি প্রতি গৃহে গিয়া দরিদ্র প্রজাদের জিজ্ঞাসা করেছি, তারা বলে এমন দয়া তাহারা জীবনে কখনো পায় নাই। এখন মনে হইতেছে ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়াছেন''

"হাঁ ইহা সর্ব্বপ্রকারে উত্তম হইয়াছে। বিনায়ক রাও বলিতে ছিলেন, রাণা আমায় মাসিক প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন"—

"ছি! ছি! আমরা কেন তা লইব ? আমাদের এই দরিদ্রতাই ভাল। অনন্তদেবের স্ত্রী কন্যা কি গ্রাসাচ্ছদেনের জন্য পর প্রত্যাশী হইবে ?"

"আমার নিজের জন্য ভাবনা নাই। তোমায় সুপাত্রে সমর্পন করিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হব।"



"আমি কখনো বিবাহ করিব না।"

"কখনো করিবে না ? না একজন ব্যতীত অন্য কাহাকেও করিবে না।"

"মা !"

"আমাকে কি তারা তুই লুকাতে পারিস ? আমি কি তোর মুখের পরিবর্ত্তন, তোর ভাবের পরিবর্ত্তন সব লক্ষ্য করি নাই ? ঈশ্বরের নিকট আমারো কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, তোমার মনোনীত ব্যক্তিকে স্বামীরূপে বরণ করিয়া, রাজপুত ধর্ম্মের মান রক্ষা করিও।"

তারা দেবী দুই হস্তে মাতার গলা ধরিয়া, নিতান্ত অপরাধী শিশুটির মত বক্ষে মুখ লুকাইল। জননী কন্যার সেই ঘন আলুলায়িত কুন্তল সস্নেহে সরাইয়া কহিলেন :—

"কল্য প্রভাতে গঙ্গাধর রাওয়ের সহধর্ম্মিণী কুমারীব্রতের উদ্‌যাপন করিবেন। এ গ্রামের সকল কুমারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তোমাকেও বলিয়া পাঠাইয়াছেন"

"না মা আমি আর সে গৃহে যাইব না, আমাদের আজন্মের স্নেহের প্রসাদে, আমি আর কি করিয়া এই ভিখারিণী বেশে যাইব ?

"তুমি কেন ভিখারিণী হইবে ? তুমি সেই প্রসাদের অধিকারিণী ছিলে, পুনরায় তুমিই রাণী হবে"

"না মা আমি যাইব না।"

"আমি শুনিয়াছি এই কুমারীব্রতে নাম লইয়া মায়াদেবী ভাবী পুত্রবধূ মনোনীত করিবেন। বিনায়ক রাও স্বয়ং কন্যা দেখিয়া মনোনীত করিলে তাহার পর বিবাহ হইবে।"

তারা দেবীর সেই আরক্ত আননে আগের গর্ব্বিত ভাব ফুটিয়া উঠিল। সজোরে কহিল

"মা আমি কি ভিখারিণী যে সেই লোভে যাইব ?"

"তুমি যাইবে না আমি জানিতাম, তবে স্বয়ং গঙ্গাধর রাও আমায় অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন"—

"সে কি তুমি কি এ দুর্গাধিপতির পরিচিত ?"

"হাঁ তিনি আমার রাখী ভাই।"

"এতদিন আমায় বল নাই কেন?"

"আমার নিজের আর পরিচয় দিবার আবশ্যক ছিল না, তবে তিনি কি প্রকারে সন্ধান পাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি তোমায় দেখিয়াছেন, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা তোমায় পুত্রবধূ করেন"—

তারা সে স্থান হইতে পলাইয়া গেল।

[ ৪ ]

পর দিবস প্রভাতে সেই দুর্গপ্রসাদে মহা সমারোহ। গৃহ প্রাঙ্গন কুসুম মাল্যে আম্রশাখায় সুসজ্জিত হইয়াছে। সেই প্রাঙ্গনে সারি সারি কুমারীগণ আসিয়া বসিতেছে। কেহবা আসিতেছে, কেহ চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সেই অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে। দুর্গাধিপতির মহিষী পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, হীরকালঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। একে একে সকল কুমারীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, দুর্গ প্রাঙ্গন সেই রঞ্জিত বসন, উজ্জ্বল অলঙ্কারে, কুসুম গন্ধে পরিপূর্ণ হইল। সহসা সামান্য শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, মুর্ত্তিমতী শ্রীরূপিণী এ বালিকা কে? মায়া দেবী অনিমেষ লোচনে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন; সহসা দৃষ্টি দূরে পড়িল বিনায়ক রাও লতা কুঞ্জের অন্তরালে থাকিয়া জননীকে ডাকিতেছেন। এক হস্তে মাঙ্গলিক ঘট ও অন্যে দেব প্রসাদিত পুষ্পমাল্য লইয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। অতি মৃদু কণ্ঠে সলজ্জে বিনায়ক রাও বলিলেন

"মা এই তিনি"

সস্নেহে একমাত্র পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া মায়াদেবী বলিলেন

"কে?"

"তারা দেবী অনন্তদেবের কন্যা—আমায় আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না মা"

"ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত সুখের অধিকারী করুন, এই আমার প্রার্থনা" এই বলিয়া সেই হস্তস্থিত মঙ্গলঘট ও পুষ্পমাল্য আপনার পুত্রের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া, মায়াদেবী উৎসব প্রাঙ্গনে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া সেই আনতমুখী তারা দেবীকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন

"এস মা লক্ষ্মী, তোমার পদস্পর্শে আমার এ গৃহ শ্রীসম্পন্ন হউক।"



তাহার পর তাহাকেই প্রথমে বরণ করিয়া সমাদর করিলেন। সরমে লজ্জাবনতমুখী তারা দেবী মুখ তুলিতে পারিলেন না।

কুমারীব্রত সমাপন হইয়া গেল। কুমারীগণ নব বস্ত্রে নব অলঙ্কারে, সিন্দুরবিন্দু ও চন্দনে ভূষিত হইয়া সেই দুর্গ প্রাসাদের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদের সেই উচ্চ হাস্যরবে অলঙ্কার ধ্বনিতে প্রাসাদ সজীব হইয়া উঠিয়াছিল।

এ সময় তারা দেবী কোথায়? সে কুমারী বরণের পর, বিদায় লইয়া, ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা কি ভাবিয়া একবার সেই প্রাসাদের উদ্যানে প্রবেশ করিল। এই স্নেহময় উদ্যানে তাহার জীবনের শত স্মৃতি বিজড়িত হইয়া আছে। এই পুষ্পফলে বিভূষিত, বিহগের কলকণ্ঠে কূজিত, শ্যাম শষ্প রাশিতে মণ্ডিত তাহার সেই চির সাধের উদ্যান। উদ্যানের এক পার্শ্বে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা। স্বচ্ছ কাচের মত নীল জল রাশি মৃদু সমীর স্পর্শে থর থর করিয়া কম্পিত হইতেছে। ইহা কি তারা দেবীর কম্পিত হৃদয়ের ছায়া? সরোবরে দুই পার্শ্বে দুইটি সান বাঁধান অতি পুরাতন বকুল বৃক্ষ। তারা দেবী সজল চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া সেই ঘন ছায়ার তলে বসিয়া পড়িল। এক মনে সেই জলরাশির প্রতি চাহিয়া রহিল। সহসা রুদ্ধ অশ্রুজল উথলিয়া উঠিল, সে দুই হস্তে মুখ লুকাইয়া আকুল আবেগে কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় কে আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার সেই আলুলায়িত পুষ্পমাল্যে বিভূষিত কুন্তলে কর স্পর্শ করিল। তারা সভয়ে চমকিত হইয়া, উঠিয়া ফিরিয়া দেখিল বিনায়ক রাও। সহসা দৃষ্টি নত হইল। সেই শিশিরসিক্ত কমলের মত অশ্রুপূর্ণ নয়নে, আরক্তিম আননে কি সৌন্দর্য্য বিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত বিনায়ক তারা দেবীর দুইটি হস্ত আপনার উভয় হস্তে ধরিয়া, গভীর আকুল প্রণয়পূর্ণ স্বরে ডাকিলেন

"তারা—তারাদেবী"

এখনো তারার নয়নাশ্রু শুকায় নাই, সে চকিতে সেই প্রণয়ের প্রথম সুধাস্বরে বিচলিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল। উভয়ের আকুল আকাঙ্খাভরা দৃষ্টিতে উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইল। প্রণয়ের নিকট তারা দেবীর পরাজয় হইল।

তাহার পর আর কি? দুইটি উচ্ছ্বসিত নির্ঝরিণী শৈল বক্ষ হইতে প্রবাহিত হইয়া নানা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া, অবশেষে দুইজনে সহসা এক বন পথে মিলিত হইল। দুইটি গোপন হৃদয় বীনা যন্ত্রে একই মধুর প্রণয় রাগিণী বাজিতেছিল, সহসা দুইটি সুর মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেল।

"অসার ধরণী মাঝে সবি হবে লয়
শুধু পুন্যভরা এই প্রেম মৃত্যুঞ্জয়"

শ্রীসরোজ কুমারী দেবী।

---

# গাধিপুর ও গাজীপুর।

## দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

হিন্দুস্থানে হিন্দুর নির্ম্মিত কীর্ত্তিসমূহ এখন ছদ্মবেশে ভারতে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু আমার মনে হয় কয়দিন এ ছদ্মবেশ থাকিবে? সত্যের দ্বার যত উদ্ঘাটিত হইতে থাকিবে, ততই ছদ্মবেশ লোকে বুঝিতে পারিবে। গাজীপুরও আমার বিশ্বাস এখন মুসলমানের ছদ্মবেশে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, গাজীপুর যে আমাদের প্রাচীন সহর গাধীপুর তাহা বুঝিবার যো নাই। কিন্তু তথাপি বর্ত্তমানকালে ইংরাজ জাতির সত্যানুসন্ধানের ফলে গাজীপুরের অনেক কীর্ত্তি হিন্দুকীর্ত্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যাইহোক, এখন নানাদিক বিচারপূর্ব্বক দেখিয়া আমার স্পষ্টই মনে ধারণা হইতেছে যে গাজীপুরই আমাদের প্রাচীন হিন্দুসহর গাধীপুর;—ইহা গাধীপুর ছাড়া অপর কিছু নয়, ইহা মনে করিতেও আনন্দ। এই প্রাচীন গাধিপুরের কথা স্মরণ হইলেই গাধিরাজার নাম স্মৃতিপথে জাগরুক হইয়া ওঠে, কারণ গাধিরাজাই গাধিপুর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই গাধিরাজার দল—গাধিরাজের বংশধরগণ এখনো পশ্চিম প্রদেশে বর্ত্তমান। তাহারা বলে, তাহাদের বংশবিবরণে আছে, যে গাধিপুর গাধিরাজার স্থাপিত।



গাধিরাজ কৌশিক ছিলেন, ইনি কুশনাভের পুত্র এবং ব্রহ্মনন্দন কুশের পৌত্র ছিলেন। এই কুশই প্রকৃতপক্ষে কৌশিকদিগের মূল। এই আদি কৌশিকগুরু কুশ সদ্ব্রতানুষ্ঠায়ী, মহাতপস্বী মহাত্মা ছিলেন। কুশের সদৃশী কুলীনা ভার্য্যার নাম বৈদর্ভী ছিল। কুশের ঔরসে বৈদর্ভীর গর্ভে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন:—কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজ ও বসু। ইহারা সকলেই পিতৃতুল্য মহাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কুশনাভের পুত্র বড়ই খ্যাতনামা হইয়া উঠিলেন। ইনিই গাধিরাজ। গাধিরাজ তাঁহার পিতামহ কুশের বরবলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন:—যখন কুশনাভ পুত্রলাভার্থে কায়-মনোবাক্যে পুত্রেষ্টিযাগ করিতেছিলেন, তৎকালে সেই পুত্রেষ্টিযাগের প্রবর্ত্তনের সময় পরমধার্ম্মিক উদারচরিত্র ব্রহ্মনন্দন কুশ তথায় আসিয়া কুশনাভকে বর দিলেন। "হে পুত্র তোমার সদৃশ সুধার্ম্মিক পুত্র হইবে—তুমি গাধিনামে পুত্র প্রাপ্ত হইবে এবং সেই পুত্রের দ্বারা লোকে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তিলাভ করিবে। এই কথা বলিয়া কুশ আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। কিছুকাল পরে মহীপতি কুশনাভের গাধিনামে পুত্র হইল। বাস্তবিকই শেষে এই গাধিরাজের দ্বারা কুশনাভ কীর্ত্তিলাভ করিলেন।" এখনও পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল কৌশিক আছে, তাহাদের অধিকাংশই রাজা গাধিকে স্মরণ করে—বলে যে রাজা গাধ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ এবং তাহারা সোমবংশীয়।—লোকের কাছে তাহারা রাজা গাধের বংশোদ্ভব বলিয়া সগৌরবে পরিচয় প্রদান করে।

বাস্তবিক গাধিরাজ বা রাজা গাধের ধর্ম্মপ্রভাব ধর্ম্মযশ তাঁহার সময়ে ভারতে বিশেষরূপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া দেশে এক নূতন যুগের আবির্ভাব হয়। গাধিরাজের ধর্ম্মপ্রভাব তাঁহার নিজ রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। গাধিরাজার রাজ্য কনৌজ, গাজিপুর প্রভৃতি প্রদেশ সমূহের চতুর্দ্দিক লইয়া বিদ্যমান ছিল বলিয়া বোধ হয়। এবং এই গাধিরাজ্যের রাজধানী গাজিপুর ছিল বলিয়া অনুমান হয়।—এখনো গঙ্গাতীরে গাজিপুরে প্রাচীন গাধিপুরের দুর্গের ধ্বংসাবশেষের অতিক্ষীণ শেষচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গে আর পূর্ব্ব গৌরবমাত্রও নাই। তাহার জরাজীর্ণ ভগ্নাবশিষ্ট কলেবরের অংশে প্রাচীন

গাধিরাজ্যের প্রভাবের নিদর্শনরূপও যেন বিদ্যমান নাই, তাহা প্রাচীন গাধিপুরের অতিক্ষীণ—ছায়ামাত্র। আমার বিশ্বাস দুর্গটী আপনা হইতে যত না ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে শত্রুদের দ্বারা তাহার অধিক সর্ব্বনাশ হইয়াছে। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে একবার সুখ আসিতেছে, একবার সুখের অবসান হইতেছে। মানুষের স্বভাব যে সে, সুখের উদয়কালেও যেমন তৃষিত নেত্রে সুখকে বড় করিয়া দেখে, সুখের অস্তকালেও সুখ মানুষের কাছে অনেকটা সেইরূপ বৃহদাকার ধারণ করে।—অস্তের আকাশে সূর্য্য চন্দ্র যেমন বৃহদাকার ধারণ করে, সেইরূপ আমাদের ইতিহাস, পুরাবৃত্ত স্মৃতিসুখ বিস্মৃতিসাগরে ডুবিবার পূর্ব্বে আমাদের নিকট যেন একটু বৃহদাকার—মহদাকার ধারণ করে, ও কিছু ছটাধিক্য প্রকাশ করে, সেইরূপ প্রাচীন গাধিপুরের কথা আমাদিগের নিকট প্রকাশ পাইতেছে। প্রাচীন গাধিপুরের কথা অস্তাচলে নাবিয়া গিয়াছে বটে এখনও বিস্মৃতিসাগরে ডুবে নাই, এক্ষণে, যেমন স্বভাবের নিয়ম,—বিস্মৃতিসাগরে ডুবিবার পূর্ব্বে আমাদের অন্তরে তাহার কথা মহদাকার ধারণ করতঃ শোভা পাইতেছে।—পাঠক কেহ যেন আমাদের দোষ না দেন, আমরা প্রাচীন গাজীপুরের কথা—তাহার মাহাত্ম্য একটু মহদাকারেই বলিব ইহা স্বাভাবিক।—

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বর্ত্তমান গাজীপুরই প্রাচীন গাধিপুর। গাধিপুর কথাটা যে সহজে গাজীপুর হইতে পারে এ বিষয়ে আমার বোধ হয় অধিক করিয়া কিছু বুঝাইতে হইবে না, যাইহোক আমরা নিম্নে তথাপি দেখাইতেছি ঃ—গাধিপুর কথাটী বর্ত্তমান গাজিপুর কথাতে পরিণত হওয়া বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কারণ ভাষাতত্ত্বে দেখা যায় যে অনেকস্থলে স্বরবর্ণের সংযোগে তাহার পূর্ব্বস্থিত দ, ধ, ত, ট, ক প্রভৃতি বর্ণকে অনেকে 'জ'য়ের ন্যায় উচ্চারণ করিয়া সুখানুভব করে—না করিয়া যেন থাকিতে পারে না। যেমন During কে অনেকে Juring এরূপও উচ্চারণ করে, যেমন Cant you এর উচ্চারণ অনেকের মুখে Cantchew এরূপও হইয়া পড়ে। ইংরাজেরা ঠাকুরকে Tagore করিয়া ফেলে; 'নডর'কে ফার্সিতে 'নজর' করে, সেই রকম গাধিপুরও যবনদিগের মুখে গাজীপুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয়।



এই গাধিপুর (বা গাজিপুর) গাধিরাজার অন্যতম প্রধান রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এক সময়ে কান্যকুব্জও তাঁহার রাজধানী হইয়াছিল। পাশ্চাত্য কৌশিকদিগের বিবরণানুযায়ী কনৌজের অন্যতম নাম গাধিপুর। গাধিপুরকে আমরা যেমন সহজভাবে বুঝিতে পারি যে ইহা গাধিরাজার পুর, সেইরূপ কনৌজও যে গাধিরপুর ছিল, তাহা কনৌজ নামে কিছু বুঝিবার যো নাই। কনৌজও যে গাধিপুরের ন্যায় গাধির রাজধানী ছিল, তাহা বিশ্বাস হইত না, যদি না তাহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতাম। গাধিপুর যে প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গাধিপুর গাধিরাজার সহর, তাহা গাজিপুর জেলার মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতির (tradition) এর দ্বারা জানিতে পারা যায়। কান্যকুব্জ সম্বন্ধেও সেইরূপ জনশ্রুতি আছে। পাশ্চাত্য কৌশিকদিগের বিবরণানুসারে কনৌজ গাধিসুত বিশ্বামিত্রের স্থাপিত। গাধিসুতের স্থাপিত বলিয়া ইহাকেও লোকে গাধিপুর নামে অভিহিত করিত। এই পাশ্চাত্য কৌশিকদিগের কথানুসারেই বিখ্যাত ওলড্‌হাম সাহেব তাঁহার, গাজিপুর জেলার বিবরণের মধ্যে বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

"The Kowsiks of Talooqu Chit, of Kopachit Pergunnah, are a race of Sombuns or Lunar Rajputs, They claim descent from Rajah Gadhi. According to the accounts of the western Kowsiks, Kanouj was built by a son of Gadh, and was called Gadhipur; but according to the tradition prevalent everywhere in this district, Rajah Gadh was the founder of Ghazeepur, which after him was called Gadhipur.

কোপাচিত পরগণার তালুক চিতের কৌশিকেরা সোমবংশীয় অর্থাৎ চন্দ্রবংশীয় রাজপুত জাতি। তাহারা রাজা গাধ হইতে নাবিয়াছে বলিয়া দাওয়া করে। পাশ্চাত্য কৌশিকদিগের বিবরণানুসারে কনৌজ গাধের এক পুত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, হইয়াছিল, এবং তাহা গাধিপুর নামে অভিহিত হইত; কিন্তু এই জেলার মধ্যে যে জনশ্রুতি সর্ব্বত্র প্রচলিত, তদনুসারে, রাজা গাধ গাজিপুরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাঁহার পর হইতে উক্তসহরকে গাধিপুর কহিত। পাশ্চাত্য কৌশিকদিগের উক্ত বিবরণটী ঠিক বলিয়া আমার মনে

হয় না, ঐ যে কান্যকুব্জটী তাহারা গাধিসুতের প্রতিষ্ঠিত বলে, তাহা কতকটা যেন ভ্রম বলিয়া আমার মনে হয়, কারণ মহাভারতে বনপর্ব্বে লেখা আছে।—

"কান্যকুব্জে মহানাসীৎ পার্থিব সুমহাবলঃ।
গাধীতি বিশ্রুতো লোকে বনবাসং জগামহ ॥"

কান্যকুব্জে সুমহাবল গাধিনামে লোক বিখ্যাত মহান পার্থিব ছিলেন, তিনি বনে গমন করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে কনৌজও গাধিরাজার প্রতিষ্ঠিত। আমার বোধ হয় এই কনৌজই গাধিরাজার প্রথম রাজধানী ছিল যেহেতু এই কান্যকুব্জের রাজা গাধি ছিলেন এইটী আমরা মহাভারতে পাইতেছি, গাধিপুর নামক অপর একটী পৃথক রাজধানীর কথা তো মহাভারতে নাই। তাই আমার মনে হয় যে গাধিপুরটী গাধিরাজার শেষ জীবনের রাজধানী। তা হয় না? যেমন আরঙ্গজেবের শেষ জীবনের এক রাজধানী আরঙ্গাবাদ হইয়াছিল। আরঙ্গাবাদ আরঙ্গজেবের নামে আখ্যাত হইয়াছিল। এও তাই। গাধিরাজা শেষ জীবনে হয়তো কোন কারণ বশতঃ এই গাজিপুরের ওখানেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই রাজধানীটী গাধিরাজার নামে আখ্যাত হইয়া গাধিপুর নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। গাধিরাজার প্রভাবে প্রাচীন গাধিপুর যে আশ্চর্য্য প্রভাবান্বিত ও উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার অনেক চিহ্ন পাই।—এই লোকবিশ্রুত গাধিরাজের যশঃ প্রভাব এপ্রকার ছিল যে ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণে কুণ্ঠিত হইতেন না। ঋচীকমুনি স্বেচ্ছায় গাধিরাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বনে তু তস্য বসতঃ কন্যা জজ্ঞেঽপ্সরসমা।
ঋচীকো ভার্গবস্তাঞ্চ বরয়ামাস ভারত।

সেই বনবাসী রাজার (গাধিরাজার) অপ্সরার ন্যায় এক কন্যা জন্মে। ভৃগুবংশীয় ঋচীক মুনি বিবাহার্থে তাহাকে প্রার্থনা করেন। গাধিরাজও তখনকার ক্ষাত্রপ্রথানুসারে অশ্বসহস্র গ্রহণ করিয়া তবে তাহাকে কন্যাদান করিলেন। তাঁহারও তেজ ছিল। তিনি যে ব্রাহ্মণ বলিয়াই তাঁহাকে কন্যা দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা হয়েন নাই, তবে ইচ্ছাও ছিল না যে এমন নহে, তথাপি অগ্রে ক্ষত্রিয় প্রথানুসারে ঋষির কাছে অশ্ব



গ্রহণ করিয়া তবে তাঁহার কন্যা সত্যবতীকে দান করেন; দানের পূর্ব্বে রাজা গাধ কন্যাপ্রার্থী ব্রাহ্মণ ঋষিকে কহিয়াছিলেন,—মহাভারতে বনপর্ব্বে আছে:—

"তমুবাচ ততো গাধি ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্।
উচিতং ন কুলে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বৈ র্যৎ সম্প্রবর্ত্তিতম্ ॥
একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তপস্বিনাং।
সাহস্রং বাজিনাং শুল্কমিতি বিদ্ধি দ্বিজোত্তম ॥
ন চাপি ভগবান বাচ্যো দীয়তামিতি ভার্গব।
দেয়া মে দুহিতা চৈব তদ্বিধায় মহাত্মনে ॥

ঋচিক উবাচ।

একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তপস্বিনাম্।
দাস্যাম্যশ্বসহস্রং তে মম ভার্য্যা সুতাস্ততে ॥

অকৃতব্রণ উবাচ।

সতথেতি প্রতিজ্ঞায় রাজন্ তরুণমব্রবীৎ।
একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তপস্বিনাম্ ॥
সহস্রং বাজিনামেকং শুল্কার্থং মে প্রদীয়তাম্।
তস্মৈ প্রাদাৎ সহস্রং বৈ বাজিনাং বরুণস্তদা ॥
তদশ্বতীর্থং বিখ্যাতং মুখিতা যত্র তে হয়াঃ।
গঙ্গায়াং কান্যকুব্জে বৈ দদৌ সত্যবতীং তদা ॥
ততো গাধিঃ সুতাং চাস্মৈ জন্যাশ্চাসন্ সুবাস্তদা।
লব্ধ্বা হয়সহস্রন্তু তাংশ্চ দৃষ্ট্বা দিবৌকসঃ ॥
ধর্ম্মেণ লব্ধ্বা তাং ভার্য্যামৃচীকো দ্বিজসত্তমঃ।
যথাকামং যথাজোষং তয়া রেমে সুমধ্যয়া ॥
তং বিবাহে কৃতে রাজন্! সভার্য্যমবলোককঃ।
আজগাম ভৃগুঃ শ্রেষ্ঠং পুত্রং দৃষ্ট্বা ননন্দ হ ॥
ভার্য্যাপতীত্মাসীনং গুরুং সুরগণার্চ্চিতম্।
অর্চ্চিত্বা পর্য্যুপাসীনৌ প্রাঞ্জলী তস্থতুস্তদা ॥
ততঃ স্নুষাং স ভগবান্ প্রহৃষ্টো ভৃগুরব্রবীৎ।
বরং বৃনীষ্ব সুভগে! দাতা হ্যস্মি তবেপ্সিতম্ ॥

সা বৈ প্রসাদয়ামাস তং গুরুং পুত্রকারণাৎ।
আত্মনশ্চৈব মাতুশ্চ প্রসাদঞ্চ চকার সঃ॥"

"পরে গাধিরাজা সেই সংশিতব্রত ব্রাহ্মণকে কহিলেন, আমাদিগের কুলে পূর্ব্বপুরুষেরা যে নিয়ম করিয়া গিয়াছেন তাহা রক্ষা করা আপনার উচিত। হে দ্বিজোত্তম! আমাদিগের কন্যাবিবাহে আমরা সমস্ত শরীর পাণ্ডরবর্ণ এবং কর্ণ অভ্যন্তরে রক্তবর্ণ ও বহিঃ শ্যামবর্ণ, এতাদৃশ আকৃতিযুক্ত বেগশীল সহস্র অশ্ব পণ গ্রহণ করিয়া থাকি। হে ভগবন্ ভৃগুকুলোদ্ভব! ঐ পণ আপনি প্রদান করুন, ইহা আপনাকে বলা উচিত হয় না; পরন্তু ভবৎসদৃশ মহাত্মা ব্যক্তিকেই দুহিতা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য।

ঋচীক কহিলেন

সমস্ত শরীর পাণ্ডরবর্ণ এবং কর্ণ অভ্যন্তরে লোহিত ও বাহিরে শ্যামবর্ণ, এতাদৃশ আকৃতিযুক্ত বেগবান্ সহস্র ঘোটক তোমাকে দিব, তোমার কন্যা আমার ভার্য্যা হউক।

অকৃতব্রণ কহিলেন

'হে রাজন্! ঋচীক ঋষি উক্তরূপে তাহা স্বীকার করিয়া বরুণের নিকটে কহিলেন, আপনি আমাকে শুল্কনিমিত্ত সমস্ত দেহ পাণ্ডরবর্ণ এবং কর্ণ অভ্যন্তরে লোহিত ও বাহিরে শ্যামবর্ণ এতদ্রূপ এক সহস্র তরস্বী ঘোটক প্রদান করুন। বরুণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাদৃশ সহস্র অশ্ব প্রদান করিলেন। সেই অশ্ব সকল যে স্থান হইতে উত্থিত হইয়াছিল, সেই স্থান অশ্বতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইল। অনন্তর দেবগণ ঋষির বরযাত্র হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। রাজা গাধি হয় সহস্র প্রাপ্ত হইয়া কান্যকুব্জে গঙ্গাতীরে দেবগণকে সন্দর্শন পূর্ব্বক ঋষিকে সত্যবতীনাম্নী কন্যা সংপ্রদান করিলেন। দ্বিজসত্তম ঋচীক ধর্ম্মত ভার্য্যা লাভ করিয়া যথাভিলাষে ও যথাসুখে সেই সুমধ্যমা রাজবালাসহ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ঋচীকের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে তাঁহার পিতা ভৃগু তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। তিনি পুত্র শ্রেষ্ঠ ঋচীককে সপত্নীক দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। সুরগণপূজিত গুরু ভৃগু উপবিষ্ট হইলে পুত্র ও স্নুষা উভয়ে তাঁহার অর্চ্চনা করতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া সমীপে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর ভগবান ভৃগু হৃষ্টচিত্তে স্নুষাকে কহিলেন, সুভগে! তুমি আমার নিকট বর প্রদান কর, আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব। সত্যবতী আপনার ও আপনার মাতার পুত্র নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন।" ব্রহ্মর্ষি ভৃগুর অশেষ ক্ষমতা ছিল, তাঁহার যেমন মন্ত্রবল ছিল তেমনি তন্ত্রবলও ছিল, তিনি আশ্চর্য্যরূপ মন ও দেহতত্ত্বদর্শী ছিলেন। এই ব্রহ্মর্ষি ভৃগু, অন্তর ও বাহির উভয়েরই রসায়নতত্ত্ববিৎ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া "রসো বৈ সঃ" ব্রহ্ম যে রসস্বরূপ তাহা তো বুঝিতেনই, ব্রহ্মরসায়নের সঙ্গে পার্থিব রসায়ন বিদ্যাতেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। সত্যবতী যখন তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিলেন, তখন শুধু তিনি বরদান করিব বলিয়া কথায় চিড়া ভিজাইলেন না, সত্যবতী ও তাঁহার মাতার, রসায়নতত্ত্ববিৎ ভিষকের ন্যায় ব্যবস্থা করিয়া দিলেন—তাঁহাদের, পুত্র সন্তানের-চরুদ্বয় সাধন করিয়া দিলেন। ব্রহ্মর্ষি ভৃগু একজন রসায়নতত্ত্ববিৎ ভিষক শ্রেষ্ঠের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতি উপদেশ দিয়া কহিলেন :—



"ঋতৌ ত্বং চৈব মাতাচ স্নাতে পুংসবনায় বৈ।
আলিঙ্গেতাং পৃথগ্‌বৃক্ষৌ সাশ্বত্থং ত্বমুডুম্বরম্॥
চরুদ্বয়মিদং ভদ্রে জনন্যাশ্চ তবৈব চ।
বিশ্বমাবর্ত্তয়িত্বা তু ময়া যত্নেন সাধিতম্॥
প্রাশিতব্যং প্রযত্নেন চেত্যুক্ত্বাদর্শনং গতঃ।"

"ভদ্রে! তুমি ও তোমার মাতা, তোমরা উভয়ে পুংসবন নিমিত্ত ঋতুস্নাতা হইয়া উড়ম্বর ও অশ্বত্থবৃক্ষকে পৃথক পৃথক আলিঙ্গন করিবে; তুমি উড়ম্বর বৃক্ষ এবং তোমার মাতা অশ্বত্থবৃক্ষ আলিঙ্গন করিবে। আমি সমস্ত বিশ্ব আবর্ত্তন করিয়া যত্নপূর্ব্বক তোমার ও তোমার জননীর নিমিত্ত এই চরুদ্বয় সাধন করিয়াছি, তোমরা ইহা যত্নপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে। ভৃগু এই আদেশ করিয়া তিরোহিত হইলেন।" ব্রহ্মর্ষি ভৃগু দেখ এই চরুদ্বয়ের জন্য কি চিন্তা করিলেন, তাঁহাকে এই চরুদ্বয় সাধনের জন্য বিশ্ব আবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। দেখ একটা চরু করিতে সারা বিশ্ব ঘুরিতে হয়, সারা বিশ্ব দেখিতে হয়। অর্থাৎ চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া করিলে কাজ খুব ভাল হয়। পূর্ব্বেকার ব্রহ্মর্ষিরা তো এখনকার ব্রাহ্মণদিগের মত অলস ছিলেন না, তাঁহারা চরুসাধন করিতে গিয়া

সারা বিশ্ব আবর্ত্তন করিতে—প্রাণপণ যত্ন করিতে তিলমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ব্রহ্মর্ষি ভৃগুর এই রসায়ন জ্ঞানের ভাব তাঁহার বংশে—নাবিয়াছিল এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনকেও স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহার বরদানের ফলে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের বংশকেও বিশেষরূপে স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহার অপার্থিব দিব্যজ্ঞান আর পার্থিব রসায়নবিজ্ঞান মিলিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত তেজস্বী ও ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার স্পর্শে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারাই উন্নতি লাভ করিতেন। তাঁহার দিব্যজ্ঞানের সঙ্গে রসায়ন বিজ্ঞান এতদূর আয়ত্ত ছিল, যে যাহার জন্য যে ব্যবস্থা ও চরু ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন তা' যথার্থ ফলদায়ক হইয়াছিল। রাজদুহিতা সত্যবতী ও তাঁহার মাতা রাজ্ঞীযখন বৃক্ষালিঙ্গনে ও চরুভক্ষণে ভৃগুবাক্যের বৈপরীত্য আচরণ করিলেন, তখন বহুকাল পরে তিনি দিব্যজ্ঞানের দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার পুত্রবধূকে বলিলেন "ভদ্রে! তোমরা চরু ভক্ষণ ও বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়াছ বটে, কিন্তু হে সুভ্রু! তোমার জননী বিপর্য্যয়ক্রমে তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং তোমার মাতার পুত্র মহাবীর্য্য মহান ক্ষত্রিয় হইয়া, সাধুদিগের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাচারী হইবে।" মহাভিষক রসায়নবিজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি ভৃগুর ব্যবস্থার বিপরীত আচরণ করিয়া উভয়ে বিপরীত ফললাভ করিল। দ্রব্যগুণে কি না হয়। এক বৃক্ষ আলিঙ্গন করিলে একরূপ ফল হয়, আর এক বৃক্ষ আলিঙ্গন করিলে আরেকরূপ ফল হয়; এক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে একরূপ ফল হয়, আরেক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে আরেক রূপ ফল হয়। ভৃগু দ্রব্যগুণের ফলাফল রীতিমত বুঝিতেন। তদনুসারে তিনি উভয়ের প্রতি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অবস্থা বুঝিয়া ভৃগু ভিষকের ন্যায় ব্যবস্থা দিতেন। ব্রহ্মর্ষি ভৃগুর ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার বংশের ছেলে সে যেন অধিকতর ব্রাহ্মণের ন্যায় তেজস্বী হয়, আর রাজা গাধি ক্ষত্রিয় তাঁহার ছেলে যেন অধিকতর ক্ষত্রিয়ের প্রভাবকেই প্রাপ্ত হয়। তদনুসারে তিনি ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন; কিন্তু গাধিরাজ্ঞির কৌশলে, তাঁহার ও তাঁহার দুহিতার মধ্যে বিপরীত হইয়া গেল। সেই কারণে দ্রব্যগুণে সত্যবতীর যিনি পুত্র হইলেন তিনি বেদাধ্যয়নে বহুতর ঋষিমুনিকে অতিক্রম করিলেও তাঁহার মুখ্যভাব হইল ক্ষত্রিয়ের ভাব।—



ঋচীকপুত্র, তেজস্বী সেই জমদগ্নির প্রতি সমস্ত ধনুর্ব্বেদ ও চতুর্ব্বিধ শাস্ত্র প্রতিভাত হইতে লাগিল। আর গাধিরাজের মহিষীর পুত্র হইল বিশ্বামিত্র, পরে ইনি স্বীয় তপস্যার বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতঃ ব্রহ্মর্ষি হইলেন। বিশ্বামিত্রের পর হইতে ভার্গবদিগের সহিত গাধিবংশের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও ঐক্য হইল। ভৃগুকুল ও গাধিকুল দুইই ব্রহ্মর্ষি ভাবাপন্ন হইলেন—ব্রাহ্মণ হইলেন। ভৃগু ও ভৃগুকুলের প্রভাবে গাধিকুলেও রসায়ন বিজ্ঞানের ভাবসমূহ ব্যাপ্ত হইল—ভার্গবেরা যেমন রসায়নবিৎ ভিষক ছিলেন, গাধিকুলও সেইরূপ রসায়নজ্ঞ ভিষক হইয়াছিলেন। এবং কালে গাধিকুল আয়ুর্ব্বেদের এক নূতন শাখা স্থাপন করিলেন সে শাখা হচ্চে শল্যচিকিৎসা। রসায়ন বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশেষভাবে আয়ুর্ব্বেদে এই শল্যশাস্ত্রের স্থাপন করেন যে ব্যক্তি তাহার নাম সুশ্রুত। ইনি গাধিকুলে জাত ব্রহ্মর্ষি বিশ্বমিত্রের পুত্র। সুশ্রুত আসলে ক্ষত্রিয়ের ছেলে কি না, তাই চিকিৎসাশাস্ত্রে রসায়ন বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার শল্যচিকিৎসার দিকে টান গেল। এই শল্যচিকিৎসা বৈদিককালে—ও অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে অব্যক্তভাবে আর্য্যদিগের মধ্যে বিদ্যমান ছিল—জগতে অতি সাধারণ ভাবে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু বিশেষ ভাবে শল্যচিকিৎসাশাস্ত্র গাধিবংশজ বিশ্বামিত্রসুত সুশ্রুতই আবিষ্কার করেন। সুশ্রুতের এই শল্যশাস্ত্র হইতেই অন্যান্য জাতির শল্যশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই শল্যতন্ত্রশাস্ত্র হইতেই ইউরোপীয়—ইংরাজী surgery শাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে।—ইংরাজী 'surgery' কথাটী পর্য্যন্ত সংস্কৃত 'শল্য' কথাটীরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়ঃ—শল্য হইতে শর্য্য—শরংয হইতে ক্রমে surgery কথার উৎপত্তি হইয়াছে। গাধিকুল ভার্গবদের অপেক্ষা মুখ্যভাবে শল্য শাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, আর ভার্গবেরা মুখ্যভাবে গাধিকুলের অপেক্ষা রসায়ন ও ঔষধিবিজ্ঞানে নিপুণ ছিলেন; এই ভৃগুকুল ও গাধিকুল মিলিয়া সংসারে আয়ুর্ব্বেদের অর্থাৎ 'ডাক্তারি' বিদ্যার যথার্থ পত্তন ও উন্নতির অভিনব প্রণালী সকল বাহির করিয়া যান।—গাধিকুলের সুশ্রুতকৃত একমাত্র শল্যতন্ত্রের কথা বিদ্বান্ পণ্ডিতগণের মধ্যে কে না জানেন? আয়ুর্ব্বেদের চ্যবন প্রাশের কথা কে না জানে? এই চ্যবনপ্রাশ ভৃগুকুলজাত ঔর্ব্বসুত

চ্যবন ঋষির আবিষ্কৃত। খণ্ডাম্রক * নামে আরেক প্রাশ তাহাও অন্যতম ভার্গবের আবিষ্কৃত; ভৃগুকুল পুত্র প্রভৃতি সন্তানোৎপাদনের জন্য নানাবিধ রসায়নে পারদর্শী ছিলেন। ভার্গবেরা ভৃগুমুনি হইতেই উক্তরূপ রসায়ন লাভ করেন।—ভৃগুমুনি সত্যবতী ও তাঁহার মাতার জন্য সমগ্র বিশ্ব আবর্ত্তন করিয়া যত্নপূর্ব্বক এমন চরুদ্বয় আবিষ্কার করিলেন তাহাতে সত্যবতী ও তাহার মাতা উভয়েই পুত্র লাভ করিলেন। ভিষক্কর ব্রহ্মর্ষি ভৃগুরই যত্ন ব্যবস্থা ও রসায়ন প্রভাবে উভয়ে পুত্র লাভ করিলেন। ভৃগুর ব্যবস্থা প্রভাবে বিশ্বামিত্রের জন্ম হইল। এই হিসাবে ভার্গবপ্রভাব গাধিকুলের প্রভাবের উপরে রাজত্ব করে, ভৃগুর জন্যই বিশ্বামিত্র।—যেন ভৃগুর তেজেই বিশ্বামিত্র তেজস্বী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। তাহা হইলে ভৃগুকুল অনেকটা গাধিকুলের গুরুর মত—গাধিকুলেরও সম্মাননীয় কুল।—এই ভৃগুকুল শরীর পুষ্টির জন্য পুত্রাদির উৎপাদনের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রসায়ন সমূহ প্রস্তুত করিতেন। চ্যবন প্রাশের গুণের কথা সকলেই প্রায় জানেন অন্যতম ভার্গবের আবিষ্কৃত 'খণ্ডাম্রকা'বলেহ নামে একটী মহৎ প্রাশের গুণের কথা নিম্নে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইতেছে :—

* * * *

"সংসেব্য ভেষজং হ্যেতদ্‌বন্ধ্যায়াং জনয়েৎ সুতম্।
বীরং সর্ব্বগুণোপেতং শতায়ুশ্চ ভবেদয়ম্॥
মৃতবৎসা চ যা নারী যা চ গর্ভোপঘাতিনী।
সাপি সূতে সুতং লভ্য নারায়ণপরায়ণম্॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
তুরঙ্গ ইব সংহৃষ্টো মাতঙ্গ ইব বিক্রমঃ॥
সদা ভেষজসংসেবী ভবেন্মারুতবেগবান্।
হন্তি সর্ব্বাময়ং ঘোরং কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং তথা॥

---

* এই ব্রহ্মর্ষি ভার্গব আবিষ্কৃত খণ্ডাম্রকবলেহ সর্ব্বপ্রথমে আমাদের পুণ্য ব্রহ্মর্ষি ঔষধালয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা চমৎকার শক্তি সম্পন্ন।

পণ্ডিত শ্রীহিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর কবিগুণসাগর।



দুর্ণামাজীর্ণকঞ্চৈব অম্লপিত্তং সুদারুণম্।
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিঞ্চ মূর্চ্ছাঞ্চ শূলমষ্টবিধং জয়েৎ॥
খণ্ডাম্রকমিদং প্রোক্তং ভার্গবেণ স্বয়ম্ভুবা।
বয়স্থং মেধ্যমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥
গ্রহরক্ষঃ পিশাচঘ্নমপস্মারবিনাশনম্।
পাণ্ডুরোগং প্রমেহঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ নাশয়েৎ॥
বশ্যা যোষিদ্ভবেৎ পুংসাং পুমান্ বশ্যশ্চ যোষিতাম্।
দৃষ্টং বার সহস্রঞ্চ কথমত্র বিচারণা॥"

ভার্গবেরা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহারা অন্ন প্রাণাদির উন্নতি সাধন করিতেন—ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সকল বিজ্ঞান আরত্ত করিতেন। ব্রহ্মজ্ঞানী ভার্গবেরা তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মর্ষি ভৃগুর নিকটে লাভ করেন। আবার ভৃগু তাঁহার পিতা বরুণের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন! ইহার প্রমম ভাব ও তল্লাভার্থে চেষ্টা করিতে সাধন করিতে বলিয়াছিলেনঃ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়া তৈত্তিরোপনিষদে আছে :—

"ভৃগুর্ব্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার।
অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং
প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ।
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি।
স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥"—

"বরুণের পুত্র ভৃগু, পিতা বরুণের নিকট যাইয়া বলিলেন,—হে ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুন।" তাহাতে পিতা কেমন উত্তর করিলেন, প্রথমে সাধারণ ভাবে বলিলেন যেমন এ সকলই যাহা দেখিতেছ সকলই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মময় এই জগত বুঝাইবার জন্য বলিলেন "অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্য এ সকলই ব্রহ্ম। পরে পুত্রকে আরও বিশেষভাবে দ্বৈতভাবে বলিলেন "যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, জাত হইয়া যাঁহাদ্বারা ইহারা জীবিত রহিয়াছে, এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও অভিসংবেশ করে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।" ভৃগু

তাহার পরে তাঁহার পিতার ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থে তপস্যা করিয়া তপঃপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভৃগুর প্রভাবেই বোধ হয় অপৌত্তলিক ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ভৃগুকুল বরাবর কৌশিক দিগের অর্থাৎ গাধিবংশজদিগের গুরুর স্বরূপ ছিলেন। এখনও তাহার কতকটা প্রমাণ পাওয়া যায়; এখনও কৌশিকেরা যাহাদের গুরুপদে বরিত করে তাহাদের গুরু পুরোহিতরূপে যাহারা বিদ্যমান আছে, তাহারা অধিকাংশই অপৌত্তলিক—অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসক।—

বিখ্যাত ওলড্হাম সাহেব তাঁহার গাজীপুরের বিবরণীতে—ইতিবৃত্তের মধ্যে একস্থলে লিখিয়া গিয়াছেন:—Although the Kowsiks are themselves idolaters, yet their gooroos or spiritual guides belong to a sect of monotheists peculiar to this district, called Bheka Sahees." "যদিচ কৌশিকেরা নিজেরা পৌত্তলিক, তত্রাচ তাহাদের গুরুরা বা মন্ত্রদাতারা—আত্মার নেতারা এই জেলার মধ্যস্থ এক বিশেষ একেশ্বরবাদীদিগের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের ভেকসাহি বলে।" আধুনিক কালের কৌশিকদিগের গুরুরা ভার্গবকুলের কি না তাহা ঠিক আমি জানি না, তত্রাচ এইটী দেখা যায় যে কৌশিকদিগের গুরুরা পূর্ব্বেও যেমন একেশ্বরবাদী ভার্গবেরা ছিলেন, এখনও সেই একেশ্বরবাদীর দলকে তাহারা গুরুরূপে রাখে দেখিতেছি। ইহা দ্বারা কৌশিকদিগের একটী মূলভাব ধরিতে পারা যাইতেছে।

গাধিকুলের সঙ্গে ভৃগুকুলের যোগ প্রথম ঋচীকমুনির দ্বারাই ঘটিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়া গিয়াছে। বিশ্বামিত্রের পর হইতে এই যোগ আরও যেন ঘনীভূত হইল। কারণ বিশ্বামিত্র শেষে ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন, তাহাতে ভার্গবদের আর কোন গোল রহিল না। ব্রহ্মর্ষির দলের সঙ্গে ব্রহ্মর্ষির যোগ হইবার পথ আরও মুক্ত হইয়া গেল।—ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে তখন যোগ হইয়া গেল।

বিশ্বামিত্রের এই ব্রহ্মণ্য লাভ বস্তুতঃ ভৃগুর প্রসাদেই ভৃগুর পদার্থ গুণেই ঘটে, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি।—গাধিকুল তজ্জন্য চিরকাল যেন ভার্গবদিগের নিকট একরূপ ঋণী।—ভার্গবেরা গাধিকুলকে বড় ভাল



বাসিত, তাহাদের গুণগান করিতে ছাড়িত না।—মহাভারতে বনপর্ব্বে ৮৭ অধ্যায়ে আছে:—"ঐ পূর্ব্বদিকস্থিত পাঞ্চালরাজ্যে উৎপলাবন আছে, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন; ঐ উৎপলাবনে পুত্রের সহিত কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং যে স্থানে ভগবান জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পশ্চাদুক্ত বিশ্বামিত্রের অতিমানুষী বিভূতি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার আনুপূর্ব্বীক্রমে বংশকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।" বিশ্বামিত্রের এই অতিমানুষী বিভূতি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের পর ঘটে। গয়া প্রদেশস্থ কৌশিকী নামক কোন নদীতীরে তাহার এই ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ঘটে। (কৌশিকের জন্যই বোধ হয় উক্ত নদীর নাম কৌশিকী হইয়া থাকিবে।) তৎপরে তিনি প্রাচীন গাধিরাজধানী কান্যকুব্জে বসিয়া বাসবের সহিত সোমপান করিয়া তথা হইতে "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কীর্ত্তণ করেন। আমার বোধ হয় ইহার পরে কনৌজ বিশ্বামিত্রের নামে অধিক ধ্বনিত হইয়া, যায়, তাহাদ্বারা কনৌজ যেন বিশ্বামিত্রের প্রতিষ্ঠিত এইরূপ ভ্রম পরবর্ত্তী কৌশিকদিগের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া যায়, কারণ গাধিরাজার চেয়ে বিশ্বামিত্রের নামের প্রভাব অধিক ছিল কি না। বসিষ্ঠ ঋষি পর্য্যন্ত তাঁহার এই প্রভাব সহ্য করিতে পারিতেন না; আর তা' না পারিবারই কথা, কারণ প্রথম হইতেই বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠকে বিরক্ত করিয়াছিলেন। যখন বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়রাজা ছিলেন, তখন একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে বসিষ্ঠের আশ্রমে আসিলেন, বসিষ্ঠ তাঁহার যথোচিত আতিথ্য সৎকার করিলেন এবং বসিষ্ঠ ঋষি তাঁহার একটী কল্পতরু গাভীর সাহায্যে বিশ্বামিত্রের সকল অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের সেই গাভীর প্রতি লোভ জন্মিল, তিনি বলপূর্ব্বক গাভী লইয়া যাইবেন, ছাড়িবেন না, অবশেষে দুইজনে ঘোরতর বিবাদ যুদ্ধ, তাহাতে বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠের কাছে ব্রহ্মতেজে পরাভূত হইলেন, তাহাতে তিনি মুহ্যমান হইয়া ভাবিলেন "ধিক্‌বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং"; ভাবিয়া ব্রহ্মতেজের জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, শেষে তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মর্ষি হইলেন। ধন্য বিশ্বামিত্রের চেষ্টাকে ও অধ্যবসায়কে। গাধিরাজ বিশ্বামিত্রকে পুত্র পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সমগ্র গাধিরাজ্যও বিশ্বামিত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। গাধিরাজ্যের সমস্ত উন্নতি আমার মনে হয় গাধিসুত বিশ্বামিত্রের প্রভাবে ও গাধিকুলের সুহৃৎ ও গুরু

স্বরূপ ভৃগুকুলের প্রধান সহায়তায়। বর্ত্তমান গাজীপুরে যে গোলাপজল আসব প্রভৃতির কারখানা আছে, তাহার হেতু মুসলমানেরা অনেকে মনে করেন, তাহা নহে বলিয়া আমার মনে হয়।—প্রকৃতপক্ষে রসায়নশাস্ত্রবিৎ ভৃগুকুল ও গাধিকুলই তাহার মূল।—স্মরণ থাকে যেন পূর্ব্বে বিশেষরূপে বলিয়া আসিয়াছি, ভার্গবেরা কিরূপ রসায়নবিৎ ছিলেন, আর সুশ্রুত যিনি তিনি বিশ্বামিত্রের পুত্র।—আমার বিশ্বাস গাজীপুরে প্রাচীন কাল হইতেই নানা রসায়নের কারখানা ছিল।—আসব, সুরা অর্ক অর্থাৎ আরক এ সকলই হইত। আধুনিক গাজিপুর তাহারই সামান্য ছায়ামাত্র এখনও রহিয়াছে।—এই ভারতীয় অর্ক হইতেই বিদেশীয়েরা অর্ক অর্থাৎ আরকের জ্ঞান লাভ করিয়াছে। এই ভারতীয় অর্ক কথা হইতেই নিশ্চয় Alcohol কথারও উৎপত্তি হইয়াছে। সুরা সেও একরূপ অর্ক কি না। আর অর্ক কি? সে দ্রব্যাদির অর্কসদৃশ তেজাংশ কিনা অর্থাৎ spirit; এখনকার Alcoholও তাই আর কি? Alcohol—অর্থাৎ অর্কহল (হল অর্থে সংস্কৃত সুরা) অর্থাৎ অর্কসুরা।

বিশ্বামিত্র নিজে একজন শিবভক্ত শৈব ও আসবসেবী ছিলেন; পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে তিনি ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়া কান্যকুব্জে বসিয়া বাসবের সহিত আসব পান—সোমপান করিয়াছিলেন; আর তিনি আসব আবিষ্কর্ত্তাদের উৎসাহও দিতেন। আঙ্গীরসকুলোদ্ভূত শুনঃশেপ নামে তাঁহার এক পোষ্যপুত্র ছিল। সেই পোষ্যপুত্রটী অঞ্জঃসবনামক একপ্রকার আসব আবিষ্কার করিয়াছিল, তজ্জন্য তিনি তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন। এবং তাহাকে তাঁহার আসল পঞ্চাশ পুত্র অভিবাদন না করাতে তাঁহাদের 'চণ্ডাল হ' বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন।—আমার দৃঢ় বিশ্বাস গাধিসুত বিশ্বামিত্র রীতিমত আসব অর্কহল অর্থাৎ Alcohol প্রভৃতির ব্যবহার জানিতেন এবং তাহার প্রস্তুতের নানাবিধ বন্দোবস্তও প্রাচীন গাধিপুরে ছিল। এখনকার গাজীপুরেও সেই প্রাচীন গাধিপুরেরই ছায়া দেখিতে পাই। যেমন কল্যাণ ভাঙিয়া ইমনকল্যাণ হইয়াছে, সেইরূপ প্রাচীন গাধিপুর ভাঙিয়া আধুনিক গাজীপুর হইয়াছে।

শ্রীহিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

---

# ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার।

শান্তিময় হরির রাজ্যে অশান্তি, শান্তির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিতেছেন সংগ্রামের—ইহা এক প্রহেলিকা। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, অধর্ম্মের ভিতরেও ধর্ম্ম, শান্তির উদ্দেশ্যে সংগ্রাম, সংগ্রামের ফলে শান্তি, এইরূপ বিপরীত পদার্থের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ জগতের একটী ধারা, ইহা এক প্রহেলিকা। গীতা আমাদিগকে যে দ্বন্দ্বের অতীত হইতে উপদেশ দিয়াছেন, সেই দ্বন্দ্বই সংসারের জীবন, প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সংসারের প্রকৃতি। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করিয়া আমাদিগকে দ্বন্দ্বের অতীত হইতে হইবে, ইহাও এক প্রহেলিকা। প্রতি পদে সংগ্রাম করিতে হইবে, সর্ব্বদাই সশস্ত্র থাকিতে হইবে। সংগ্রাম বিনা উন্নতি নাই, সংগ্রাম বিনা জীবনই থাকিতে পারে না। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে অন্তঃশত্রু বা বহিঃশত্রু, অন্তরের রিপুগণ অথবা বাহিরের রোগশোক, কোন বা কোন শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে। ইহা ব্যতীত কীট পতঙ্গ অবধি মানব পর্য্যন্ত প্রাণীগণের পরস্পরের মধ্যে জগতের রাজত্ব লইয়া অহর্নিশি জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য নিয়মের আশ্চর্য্য ফল এই যে, এই জীবনসংগ্রামেই আবার তাহাদের উন্নতি ও অভিব্যক্তি অন্তর্নিহিত। মৃত্যুর সোপান সংরচন করিয়া অমৃতে উঠিতে হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছি যে ভগবানে এক এক ইঙ্গিতের বলে কত রাশি রাশি ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। পরমাণুসমূহে এক বিকর্ষণ শক্তি অর্পণ করিয়াছেন তাহার ফলে কতশত গ্রহ উপগ্রহ নিত্য উৎপন্ন হইতেছে। সেইরূপ ভগবান জীবনসংগ্রামরূপ এক ইঙ্গিতের বলে প্রাণরাজ্যে নিত্য কত পরিবর্ত্তন সম্পাদন করিতেছেন, তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? এক জীবনসংগ্রামের ফলে প্রাণীগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হইতেছে; এক জীবনসংগ্রামেরই ফলে প্রাণীগণের বর্ণবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য বিধান হইতেছে; আবার সেই জীবনসংগ্রামেরই কার্য্যকারিতায় এই বর্ণবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য, এই শরীর ও মনের অভিব্যক্ত ও উন্নত গঠনাবর্ত্তন

ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা যাহাকে জড় পদার্থ বলি, সেই সকলের ভিতরেও যে জীবনসংগ্রাম কার্য্য না করিতেছে কে বলিতে পারে? পাথুরে কয়লা যখন অভিব্যক্ত হইয়া হীরকে পরিণত হয়, কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে ইহার মধ্যে জীবনসংগ্রামের কার্য্যকারিতা নাই? যখন ভূপৃষ্ঠে এক স্তরের উপর অপর এক স্তর জমিয়া নিজের আধিপত্য বিস্তার করে, যখন সুন্দরবনের ন্যায় এককালে জনাকীর্ণ জনপদ সকল সাগরের করায়ত্ত হইয়া পুনরায় ধীরে ধীরে সাগরগর্ভ হইতে মুখোত্তোলন করিবার চেষ্টা করিতেছে, কে সিদ্ধান্তপূর্ব্বক বলিতে পারে যে এই সকল ঘটনার ভিতরে জীবনসংগ্রাম কার্য্য করে নাই? একই মহাপ্রাণ হইতে যখন এই "প্রাণ করে চলাচল," তখন জড় বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে কি না বড়ই বিচার্য্য বিষয়—জড় ও প্রাণের মধ্যে প্রভেদ রেখা কে নির্ণয় করিবে? নানাপ্রকার চেষ্টা হইলেও কৃত্রিম উপায়ে শ্রেষ্ঠতম "জলের" হীরক আজ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয় নাই, হীরকের জীবন দিতে পারে নাই, তাহার কল হইতে পারে। জীবাদি প্রাণপঙ্কের অন্নজান প্রভৃতি উপকরণ মিলিত করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক তাহার পঙ্কিলভাব প্রভৃতি আনয়ন করিয়াছে, কিন্তু চেতনের জীবন তাহাতে আনিতে পারেন নাই।

যাই হৌক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে, সচরাচর যাহাকে প্রাণ আখ্যা দেওয়া যায় সেই প্রাণরাজ্যের বর্ণবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য এবং শরীরিক ও মস্তিষ্কের গঠনবর্ত্তন ও তদানুষঙ্গিক মানসিক ভাবোন্নতি কিপ্রকারে ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল অথবা পড়িবার সম্ভাবনা, তাহারই সম্বন্ধে দুচারিটী কথা আলোচনা করিব। পৃথিবী সূর্য্য হইতে বিক্ষিপ্ত হইবার পর অবধি ভূপৃষ্ঠ যতকাল পর্য্যন্ত বাষ্পময় অথবা প্রাণধারণের অনুপযোগী অত্যুত্তপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল, সেই কালটুকু সম্বন্ধে আমাদের কোনই কক্তব্য নাই। এই বিক্ষিপ্ত হওয়া অবধি প্রাণের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালকে আমরা আর্কেয় যুগ বলিব। প্রাণের আবির্ভাব অবধি সমেরু মৎস্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে আমরা শম্বূকযুগ আখ্যা দিলাম। এই শম্বূকযুগ অবধিই জীবের অভিব্যক্তি ও তৎসহায় জীবনসংগ্রামের সম্বন্ধ।

আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে দেখিয়া আসিয়াছি যে জীবনসংগ্রামের কার্য্য-



কারিতায় জীবাদি হইতে ক্রমে মানবের অভিব্যক্তি হওয়া সম্ভব। যত বড় বৈজ্ঞানিক হউক না কেন, কেহই বলিতে পারেন না যে তিনি জীবাদি হইতে মোলস্ক, মোলস্ক হইতে শম্বূক, শম্বূক হইতে মৎস্য ইত্যাদিরূপে মানব পর্য্যন্ত কাহারও সত্যসত্য অভিব্যক্তি সংঘটিত হইতে দেখিয়াছেন। ইতিহাস আলোচনা করিয়া যতদূর দেখা যায়, তাহাতে বলা যাইতে পারে যে ঐতিহাসিক কাল অর্থাৎ আনুমানিক অন্তত দশহাজার বৎসরের ভিতরে ভূপৃষ্ঠের জীবসমূহের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এ অবস্থায় শতবর্ষ পরমায়ুর মধ্যে মনুষ্য যে জীবাদি হইতে মানবের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিবে তাহা অসম্ভব। যেমন অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া অথবা জীবনসংগ্রামের ফলে জীবগণের মধ্যে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ লাভ করা মনুষ্যের অল্প আয়ুর পক্ষে অসম্ভব, সেইরূপ জীবাদি অবধি মনুষ্য পর্য্যন্ত জীবসকলের ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃতিরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া মনুষ্যের ক্ষুদ্র পরমায়ুর পক্ষে অসম্ভব। রসায়ন, জ্যোতিষ প্রভৃতি ভৌতিক বিজ্ঞান সকলকে সংগণিত বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে—ইংরাজীতে এই সকলকে exact science বলে। এই সকল বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই কার্য্য অধিক, অনুমানের কার্য্য অল্প। এতটুকু অন্নজানের সহিত অতটুকু অঙ্গার মিলিত হইলে তবে জলে পরিণত হয়। হল্‌দে ও সাদা রং মিলিত হইলে লাল রং হয়। এই সকলের ভিতরে অনুমানের কার্য্য নাই, সকলই সংগণিত অর্থাৎ এমন কথা বলিবার উপায় নাই যে এই দুইটী মিলিত হইলে উহা হইবে না, সকলই একপ্রকার গণিয়া ঠিক করা হইয়াছে বলা যায়। জ্যোতিষশাস্ত্রে সংগণিত বিজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কোথায় কোন্ তারা কোন্ পথে ঘুরিবে ইত্যাদি কথা ঠিক করিয়া বলা যায়, কেবল সেই গণনার ভিতরে অনুমানের কার্য্য এক বিন্দু নাই। তবে এই সংগণিত বিজ্ঞান সমূহের ভিতরেও যে অনুমান একেবারে কার্য্য করে না তাহা নহে। আমরা এখানে দেখি যে লৌহ উত্তপ্ত করিলে একপ্রকার রশ্মিজাল বিস্তার করে, স্বর্ণ একপ্রকার, রৌপ্য একপ্রকার, এই প্রকারে বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন রশ্মিজাল প্রকাশ করে—ইহা এই পৃথিবীতেই পরীক্ষিত হইয়াছে। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া আমরা দূরবর্ত্তী গ্রহনক্ষত্রের রশ্মিবিশ্লেষণ করিয়া অনুমান করি যে অমুক গ্রহে এই

পদার্থ আছে, অমুক নক্ষত্রে অমুক পদার্থ আছে। এই অনুমানকে আমরা সিদ্ধান্তমূলক অনুমান বলিতে পারি। এই স্থলে অবশ্য আমরা বলিতে পারি যে সম্ভবত এই অনুমানের ভিতরে ভ্রান্তি নাই। সকল স্থলে সে কথা বলা যায় না। চিকিৎসাবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি সিদ্ধান্তমূলক অনুমান বা অনুমানমূলক সিদ্ধান্তের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কোন চিকিৎসকই রোগের নিদান ও চিকিৎসা একেবারে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন না। অভিব্যক্তিবাদও বর্ত্তমানে এই প্রকার সিদ্ধান্তমূলক অনুমান অথবা অনুমানমূলক সিদ্ধান্তের উপরেই বলিতে গেলে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে জীবগণের মধ্যে পরিবৃত্তি কার্য্য করে এবং জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন হয়। তাহার পরে দেখি যে ভূগর্ভে স্তরে স্তরে উন্নত হইতে উন্নততর জীবের কঙ্কালাবশেষ পাওয়া যায়। এই সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত হইতে অনুমান করিলাম যে পরিবৃত্তি ও জীবনসংগ্রামের সহায়তায় নিম্নতম জীব হইতে মানবের অভিব্যক্তি হওয়া সম্ভব। জীববিজ্ঞানের সাহায্যে অভিব্যক্তিবাদ আলোচনা করিয়া যতদূর বুঝা যায় তাহাতে এই অনুমান মূলত অভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়। ঘোটকের বংশাবলীর নিদর্শন পাইয়াই পণ্ডিতেরা এবিষয়ে একপ্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছেন।

জীবের অভিব্যক্তির ন্যায় ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসারও প্রমাণের জন্য সিদ্ধান্তমূলক অনুমানের উপর দণ্ডায়মান। শতবর্ষ পরমায়ু লইয়া মানব ইহা বলিতে পারে না যে ভূপৃষ্ঠের যেখানে যত জীবের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে সকলই সে দেখিয়াছে। ইতিহাস অবলম্বনে আমরা প্রাণপ্রসারের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীলণ্ড যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন সেখানে শূকর প্রভৃতি দেখা যায় নাই, তাহার পর জাহাজের সাহায্যে গিয়া পড়িয়া এখন শূকর, খরগোস, ইন্দুর প্রভৃতি জীব এবং কয়েকজাতীয় উদ্ভিদ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে; দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম আবিষ্কার কালে তথায় বলদ, ঘোটক প্রভৃতির সম্পূর্ণ অভাব ছিল, কিন্তু ঔপনিবেশিকগণ সেখানে এই সকল জীব লইয়া যাওয়ায় এখন তাহারা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া বন্য অবস্থায় পরিণত; উত্তর আমেরিকায় চড়ুই ছিল না, তথায় কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমদানী হইয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার ভূতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে



যে হয়তো আসিয়া ও ইউরোপের যে স্তরে একপ্রকার জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়, আমেরিকার পরবর্ত্তী স্তরে তাহা দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে বোধ হয় যে ইউরাশীয় দেশ হইতে আমেরিকায় এই জীবের আমদানী ঘটিয়াছিল। আবার হয়তো ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র একই স্তরে জীববিশেষের কঙ্কাল পাওয়া যায়—ইহাতে অনুমান হয় যে যদি একস্থলে এই জীবের প্রথম জন্ম হইয়া থাকে, তবে ইহা বিস্তৃত হইয়া সময়ে ভূপৃষ্ঠ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর অভিব্যক্তিবাদীগণ সিদ্ধান্তমূলক অনুমান করেন যে আদিমকালে ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার ঘটিয়াছিল ও এখনও ঘটিতেছে। হইতে পারে যে, সময়ে সমস্ত প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া ভূতত্ত্ব এবং তৎসঙ্গে অভিব্যক্তিবাদ সংগণিত বিজ্ঞানের মধ্যে পরিগণিত হইবে, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাদের অধিকাংশই অনুমানের উপর চলিতেছে।

অভিব্যক্তিবাদীগণের মতে ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার ও জীবের অভিব্যক্তি পরস্পরসম্বদ্ধ। তাঁহারা বলেন যে, যে প্রাণীর যত অধিক প্রসার হইবে, সেই প্রাণীর অভিব্যক্তি তত শীঘ্র ও স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা এবং অল্প স্থানে প্রসার হইলে অভিব্যক্তি বিলম্বে ও অস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা। একটা সহজ দৃষ্টান্তেই ইহা বুঝা যাইতে পারে। ভূপৃষ্ঠের যেখানে যত মানবজাতি আছে, যদি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অবাধ আদানপ্রদান চলিত তাহা হইলে সহজেই এক অভিনব মানবজাতি অভিব্যক্ত হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে অধিকাংশ দেশেই এরূপ জাতি সংমিশ্রণের পক্ষে যেরূপ অর্গল দেওয়া আছে, তাহাতে সেই অভিনব মানবের অভিব্যক্তি এখনও বহুকালসাপেক্ষ। বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশে এক এক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি, আবার তাহাদেরই মধ্যে বিভাগ কত। আমরা দেখি যে বন্য জীবজন্তুদিগের ভিতরে এত ভেদজ্ঞান নাই—যত নিম্নদিকে যাওয়া যায় ততই ভেদজ্ঞান কম দেখা যায়। নিম্ন প্রাণীদের প্রসারও অধিক স্থানব্যাপী হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে নিম্ন প্রাণীদের মধ্যে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন কিছু শীঘ্র শীঘ্র ঘটে। প্রসার অল্পস্থানব্যাপী হইলে যে অভিব্যক্তির প্রসারও অল্প হয়, তাহার প্রমাণ,—নিউজীলণ্ড ও ম্যাডাগাস্কার দ্বীপদ্বয়ের প্রাণীবর্গ। ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে নিম্নতম স্তন্যপায়ীর নানাপ্রকার ভেদমাত্র দৃষ্ট হয়, উচ্চশ্রেণীর স্তন্যপায়ী একটীও দৃষ্ট

হয় না। আবার নিউজীলণ্ডে মাত্র একপ্রকার স্তন্যপায়ী দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহার ভূতপূর্ব্ব অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই দ্বীপে মাত্র একপ্রকার উভচর ভেক পাওয়া যায়। যেখানে আবার অভিব্যক্তির প্রসার অল্প দেখা যায়, সেখানে অভিব্যক্তিবাদীগণ ধরিয়া লয়েন যে প্রাণপ্রসার অল্পস্থানব্যাপী হইয়াছে। মনে কর জলেও আগুন নিভিয়া যায়, বাতাসেও নিভিয়া যায়; এখন যদি কোন স্থলে বাতাস জোরে বহিবার কোন লক্ষণ দেখা না যায়, অথচ সেইস্থলে নির্বাপিত বহ্নির নিকটে জলের চিহ্ন দেখা যায়, তাহা হইলে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে জলের দ্বারা বহ্নি নির্বাপিত হইয়াছে। সেইরূপ একদিকে ম্যাডাগাস্কার প্রভৃতি মহাদেশের সন্নিহিত দ্বীপ সমূহে উন্নত জীবের অভাব এবং পৃথিবীর বিপরীত খণ্ডে একই শ্রেণীর জীবের অস্তিত্ব দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে এক সময়ে ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র প্রাণীগণের অবাধ যাতায়াত ছিল, কেবল যে সকল ভূখণ্ড সাগরের কার্য্য দ্বারা যে সময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, সেই সময় অবধি সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে অবাধ গতিবিধি বন্ধ হইয়া গেল এবং অগত্যা তথায় অভিব্যক্তিরও মুক্তগতি রুদ্ধ হইয়া গেল। এই রুদ্ধগতি অভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীলণ্ড এবং ম্যাডাগাস্কার প্রভৃতি দ্বীপসমূহ।

এইবারে সিদ্ধান্তমূলক অনুমানের সাহায্যে ভূতত্ত্ব অবলম্বনে দেখা যাউক যে ভূপৃষ্ঠে প্রাণপ্রসার কি প্রণালীতে সংঘটিত হইয়াছিল। পৃথিবীর কেন্দ্র পর্য্যন্ত খনন করিয়া জীবসমূহের কঙ্কাল অন্বেষণ করা মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ ভগবান পৃথিবীতে জ্ঞানবিস্তারের জন্য নানা উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। ভূগর্ভে অগ্ন্যুৎপাতজনিত কার্য্যের ফলে কত স্থল উৎক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে এবং কত স্থল বসিয়া গিয়া হ্রদ প্রভৃতি গভীর খাদে পরিণত হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বত ও হ্রদ বলিতে গেলে ভূতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের পক্ষে অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার। দু একটী হ্রদ শুকাইয়া যাওয়াতে তাহার তলস্থ স্তর পরীক্ষার সহজ বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। সেইরূপ অনেক পর্ব্বতের উপরিভাগও সহজেই পরীক্ষা করিবার উপায় আছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কয়েকটী শুষ্ক হ্রদের নিম্নতম স্তর এবং অনেক গুলি পর্ব্বতের উপরিতন স্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উভয়ত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র



মোলস্ক (Mollusk) জাতীয় শম্বূক সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়, এই কারণে পর্ব্বতের সেই উপরিতন স্তরই জীবোৎপত্তির উপযুক্ত সর্ব্বপ্রথম স্তর বলিয়া উক্ত হয়। দেখা গিয়াছে যে ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্ব্বত্রই এই মোলস্কের কঙ্কাল আছে। এই মোলস্কগণ সাগরিক জীব, অতএব অনুমিত হয় যে অতি আদিম কালে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ প্রায় সাগরগর্ভে নিমগ্ন ছিল। মোলস্কের আধুনিক বংশধরগণ নিতান্ত শীতদেশে বাঁচিতে পারে না দেখা যায়। এই কারণের সহিত অন্যান্য কারণের সামঞ্জস্য করিয়া অনুমান করা হয় যে শম্বুক যুগে আমেরু সমগ্র ভূপৃষ্ঠ অত্যন্ত উষ্ণ ছিল। সেই আদিম কালে মোলস্ক প্রভৃতি শম্বুকের সহিত বাহিরের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না, তাহাদের আপনাদেরই মধ্যে জীবনসংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার ফলে তাহারা আকারে প্রকারে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরে যখনই স্থান ও আহারের সংকুলানের অভাব হইতে লাগিল, তখনই অভিব্যক্তিরও কার্য্য বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মোলস্কগণ নির্ম্মেরু মাংসল জীব, কিন্তু মোলস্ক যে স্তরে দেখা যায়, ঠিক তাহার পর স্তরে অর্দ্ধ মোলস্ক ও অর্দ্ধ শম্বুক জীব (বৈজ্ঞানিকগণ যদিও সেই সকল জীবকে মোলস্কেরই অন্তর্গত করিয়াছেন) এবং তাহার পরে পুরা শম্বুক দেখা যায়। শম্বূকগণ গুপ্তি ও রক্ষার জন্য একপ্রকার চূর্ণপ্রধান খোলস লাভ করিয়াছে। একজাতীয় মোলস্ক আছে তাহারা নিজেদের খোলস ছাড়িয়া অপরের পরিত্যক্ত খোলসে আবশ্যক হইলে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করে। শম্বূকগণ আবার মোলস্কের স্থানে আকারে প্রকারে বৃদ্ধি পাইল। শিরঃপদী, বাহুপদী প্রভৃতি শ্রেণীতে তাহারা বিভক্ত হইয়া থাকে। শম্বূক সকল যখন বহুকাল বিলুপ্ত হইয়া বরাহ প্রভৃতি বৃহৎকায় স্তন্যপায়ীদিগের রাজত্ব কাল আসিয়াছিল, সেই সময়ের একটী শিরঃপদী শম্বূকের প্রস্তরশীল কঙ্কাল কলিকাতাস্থ যাদুঘরে রক্ষিত আছে, তাহার আকার দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই শম্বূকযুগে কৃকলাসের পূর্ব্বপুরুষ ত্রিবলি শম্বূকের শ্রেণীভেদের চিত্র দেখিলেও পরিবৃত্তি ও অভিব্যক্তির কার্য্যকারিতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ভূপৃষ্ঠকে নানা স্তরে সংগঠিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই এক একটী স্তরের আদর্শ জীব বা পদার্থ হইতে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। আরও দেখা গিয়াছে

যে দুই তিনটী স্তরের সাধারণ প্রধান আদর্শ পদার্থ বা প্রাণী একই, সেই কারণে পণ্ডিতেরা দুই তিনটী স্তরের সংগঠন কাল লইয়া এক এক যুগ ধরিয়াছেন এবং সেই সাধারণ আদর্শ পদার্থ বা প্রাণী হইতে যুগ সকলের নামকরণ করিয়াছেন। এক একটী স্তর সংগঠন কালে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত, ভীষণ প্লাবন প্রভৃতি ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপ্লবের লক্ষণ সকল দেখা যায়। আবার এক একটী স্তরের সংগঠনকালও বড় অল্প নহে, কোটী কোটী বৎসর, লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এক একটী স্তর সংগঠিত হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তিন চার যুগে বিভক্ত হইয়া থাকে। আর্কেয় যুগের পর আমি যদিও শম্বূক যুগের কথা বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু অনেকের মতে ইহা মৎস্য যুগের একটী স্তর মাত্র। মৎস্য যুগের আদর্শ জীব এক-প্রকার বৃহৎশল্ক মৎস্য। মৎস্যযুগের দ্বিতীয় স্তর শৈবাল স্তর। এই স্তরে সাগরিক শৈবালের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য। তৃতীয় স্তরে পর্ণীর (Fern) বাহুল্য। আমরা অনুমান করিতে পারি যে শৈবাল হইতে পর্ণী সকল অভিব্যক্ত হইয়াছে। শম্বূক ও শৈবাল, এই দুই স্তরের ত্রিবলি (Trilobite) শম্বূকের চিত্র দেখিলেই অভিব্যক্তির কার্য্য কতকটা সুস্পষ্ট হইবে। এই আদিম কালের একটী লক্ষণ এই দেখা যায় যে এক এক স্তরে যে জীব বা উদ্ভিদের প্রশীল (Fossil) কঙ্কাল পাওয়া যায়, তাহা পৃথিবীর এক স্থানে আবদ্ধ ছিল না, বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবে ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র এককালে ছাইয়া ফেলিত। শৈবাল স্তরে কড়ি, স্পঞ্জ প্রভৃতিরও অস্তিত্ব দেখা যায়। সাগরগর্ভের কয়েক অংশে প্রবাল দেখা দিয়াছিল। তারামাছেরও কঙ্কাল এই স্তরে পাওয়া গিয়াছে। এই স্তরে কাঁকড়াবিছা এবং একপ্রকার উচ্চিংড়া পাওয়া গিয়াছে। পর্নীস্তরে পুষ্পহীন পর্নীজাতীয় বৃক্ষের বাহুল্য থাকিলেও তদানীন্তন উচ্চভূমিতে পাইন বৃক্ষ যে জন্মাইত তাহার দুই একটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই স্তরে কীট পতঙ্গ অনেক প্রকার আবির্ভূত হইয়াছিল। স্থলশম্বূকেরও চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই পর্নী স্তরে বৃহৎশল্ক মৎস্যের আবির্ভাব। পূর্ব্বস্তরের সহিত এই স্তরের ত্রিবলির আকার আলোচনা করিলেই অভিব্যক্তির কার্য্য বুঝা যাইবে। মৎস্যযুগের চতুর্থ স্তর অঙ্গার স্তর। এই স্তরের প্রধান লক্ষণ অঙ্গার—স্থানে স্থানে এই স্তর ২০ হাজার ফুট কিন্তু সচরাচর ৬০০০ ফুট স্থূল



দেখা যায়। পর্নীস্তরেই ভূপৃষ্ঠের অনেক অংশ সাগরগর্ভ হইতে জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার কতক অংশে অঙ্গারস্তর কালে অভিব্যক্তির ফলে ৫০।৬০ হাত উচ্চ পর্নী প্রভৃতি বৃক্ষের অরণ্য হইয়াছিল। ভূগর্ভের অগ্ন্যুৎপাতী কার্য্যে সেই সকল অরণ্য ধীরে ধীরে নিখাত হইয়া সেই আদিম কালের ভূগর্ভ ও ভূপৃষ্ঠ উভয়ের উত্তাপের মধ্যে একপ্রকার দমে বসিয়া অঙ্গারাকার ধারণ করিয়াছিল। ত্রিবলি এই সময়ে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিলাম যে এক একটী স্তর গঠিত হইতে কোটী কোটী লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ৬০ ফুট অঙ্গারস্তর গঠিত হইতে এক লক্ষ বাইশ হাজার চারশত বৎসর লাগে। গড়ে ৬০০০ ফুট এই স্তরের স্থূলতা ধরিলে আমরা বলিতে পারি যে কেবলমাত্র এই একটী স্তর সংগঠিত হইতে এক কোটী বাইশ লক্ষ চল্লিশ হাজার বৎসর লাগিয়াছে। মৎস্যযুগের পঞ্চম ও শেষ স্তর মৎস্য (Permian) স্তর। এই স্তরে একপ্রকার মৎস্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহার অর্দ্ধভাগ অস্থি ও অপরার্দ্ধ কঠিন চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। এই স্তরে মৎস্য ও সরীসৃপের সংযোগী শৃঙ্খল প্রথম দৃষ্ট হয়। চতুর্থ স্তর অবধি উভচর প্রাণীর সৃষ্টি দেখা যায়। উদ্ভিজ্জ পর্নীরও আবির্ভাব এই স্তরে। মোটের উপর সমগ্র মৎস্যযুগে ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ ও আবহাওয়া আমেরুবিষুব প্রায় একই রকম ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতাও এই সময় অবধি বাড়িতে চলিয়াছে। উপরোক্ত সংযোগী শৃঙ্খলের দাঁত অনেকটা কুমীরে দাঁত, কিন্তু অঙ্গারস্তরে ক্ষুদ্রকায় পঞ্চাঙ্গুলি একপ্রকার অপরূপ টিক-টিকির আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু তাহার দাঁত তখনও সরীসৃপের আকার অবলম্বন করে নাই।

মৎস্যযুগের পরবর্ত্তী দুই তিনটী স্তরে সরীসৃপেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কূর্মই এই যুগের আদর্শ জীব। ভূমিজ পর্নীর পরিবর্ত্তে উদ্ভিজ্জ পর্নীরই কূর্মযুগের প্রথম স্তরে বিশেষ বাহুল্য। কর্দ্দমাক্ত বালুময় ভূমির উপযুক্ত বগড়া (cycad) বৃক্ষের বড়ই প্রাবল্য। এই স্তরে তিন ক্ষুদ্র স্তরের অস্তিত্ব দেখা যায় বলিয়া ইহার নাম ত্রিস্তর (Triassic) রাখা হইয়াছে। এই স্তরে নানাপ্রকার আদিম সরীসৃপ দেখা দিয়াছিল। এক শ্রেণীর সরীসৃপের আকার কূর্মের ন্যায় এবং চোয়াল পক্ষীচঞ্চুর ন্যায় ছুঁচালো। আর এক শ্রেণীর

চোয়ালে দুইটা প্রকাণ্ড দন্ত। ইহারাই সরীসৃপ ও পক্ষীর সংযোগী শৃঙ্খল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা প্রায় পশ্চাতের পদদ্বয়ে চলিত। প্রথম কোষপায়ী জীব এই স্তরেই দেখা যায়। কোষপায়ী জীবই স্তন্যপায়ী জীবের পূর্ব্বপুরুষ। মৎস্যের প্রাদুর্ভাব অবধি সমেরু জীবের আরম্ভ, আবার কোষপায়ী জীব অবধি স্তন্যপায়ী জীবের আরম্ভ ধরা যাইতে পারে। এই স্তর পর্য্যন্ত মোটামুটি আবহাওয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমান ছিল, সুতরাং ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বত্র প্রধান প্রধান প্রাণীগণের প্রসারের পক্ষে কোনই বাধা ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তী স্তরের কাল হইতেই ঋতুপরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইবার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্তর সরীসৃপ-প্রধান। বলা বাহুল্য যে এই যুগে সরীসৃপের প্রাদুর্ভাব হেতু ত্রিবলি শম্বূক, বৃহৎশঙ্ক মৎস্য প্রভৃতি জলচর প্রাণীর বহুলপরিমাণে বিলোপসাধন হইয়াছিল। এই স্তরে জলে, স্থলে ও আকাশে সর্ব্বত্র সরীসৃপেরই রাজত্ব। দুই প্রকার সিন্ধুকূর্ম্মের এই স্তরে বড়ই ব্যাপ্তি দেখা যায়। মৎস্যকূর্ম (Ichthyosaurus) দৈর্ঘ্যে ২৪ ফুট, তাহার গ্রীবা অস্ফুট, সাঁতার কাটিবার জন্য দুইটী পাখনা, চক্ষু প্রকাণ্ড ও অস্থিসংবৃত, মস্তক কৃকলাসের ন্যায়, দন্ত কুম্ভীরের ন্যায়, দেহ ও লাঙ্গুল চতুষ্পদ জীবের মত, অস্থিগ্রন্থি মৎস্যের ন্যায় এবং পাখনা দুইটী তিমির মত। শল্কী মৎস্য ইহার প্রিয় খাদ্য ছিল। লম্বগ্রীব কূর্ম (Plesiosaurus) আরও অদ্ভুত। ইহার মস্তক কৃকলাসের ন্যায়, দন্ত কুম্ভীরের ন্যায়, গলা রাজহংসের ন্যায় অথচ অনেক লম্বা, পঞ্জর সরীসৃপের মত, চারটী পাখনা তিমির মত। ইহারা সাগরের উপকূলে বেড়াইত বলিয়াই স্পষ্ট অনুমান হয়। আর একপ্রকার এই স্তরের অদ্ভুত জীব উৎসর্প কূর্ম (Pterosaurus) ইহার ভাবভঙ্গী কতকটা বাদুড়ের মত। ইহার ঠোঁট কুক্কুটের মত লম্বা, দন্ত কুমীরের ওষ্ঠাগ্রস্থিত দন্তের মত, অস্থিগ্রন্থি, পঞ্জর ও পদাদি কৃকলাসের মত। ইহার ডানা আছে কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গে না আছে পাখীর মত পালক, না আছে বাদুড়ের মত লোম। ইহার মূলমূল অস্থির গঠন সরীসৃপজাতীয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ত্রিস্তরে সরীসৃপ ও পক্ষীর সংযোগী শৃঙ্খল পাওয়া যায়। সরীসৃপস্তরে তাহা আকারে ও প্রকারে অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ইহার এক শ্রেণী দৈর্ঘ্যে ২৫ ফুট এবং ইহারা অত্যন্ত মোটা মোটা পশ্চাৎপদের উপর দাঁড়াইয়া চলিত। আর এক শ্রেণীর



দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট, ক্ষুদ্রদেহ; ইহাদের গ্রীবা ও লেজ লম্বা, মাথা ছোট, পাগুলি নিতান্ত সূক্ষ্ম নহে—এক একটী পায়ের ছাপ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এক গজ। সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড বৈহগকূর্ম দৈর্ঘ্যে ১০০ ফুট ও উচ্চতায় ৩০ ফুট। এই স্তরেই সর্ব্বপ্রথম পক্ষীর অস্তিত্ব দেখা যায়—বর্ত্তমান পক্ষী হইতে তাহার অনেক প্রভেদ এবং সরীসৃপের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। সেই সকল পক্ষীর চোয়ালে দাঁত, টিকটিকির মত লম্বা লেজ এবং প্রতি অস্থিগ্রন্থিতে দুইটী করিয়া পালক। এই সকল আলোচনা করিয়া কে অস্বীকার করিবে যে সরীসৃপ হইতে পক্ষীর উৎপত্তি হয় নাই? অপোসম জাতীর কোষপায়ী জীবের দন্ত ও চোয়াল এই স্তরে পাওয়া গিয়াছে। কূর্মযুগের তৃতীয় খটিক স্তরে এই সকল বৃহৎকায় সরীসৃপ একদিকে কুম্ভীরাদি, অপরদিকে অষ্ট্রীচ পক্ষীর পূর্ব্বপুরুষের জন্মদান করিয়া অন্তর্হিত হইল। বৈহগ কূর্মের সর্ব্বশেষ বংশধরের নাম বিহগনোদন (Iguanodon)—ইহারা উভচর ও উদ্ভিদাশী। এই স্তরে প্রচুর সিন্ধুসর্প দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণী সিন্ধুসর্পের দেহ ৪০ ফুট লম্বা ও তাহার গলা ২০ ফুট উচ্চ। এই স্তরে উদ্ভিদ সকলের গঠনাবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত জটিল দেখা যায়, আর কেবল পর্ণীত্ব নাই। এই যুগেও ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ প্রায় সমানই ছিল, কেবল শেষভাগে সুমেরুকেন্দ্রে অন্ধকার হইত, কিন্তু তথায় এখনও বরফ পড়ে নাই।

এই যুগ পর্য্যন্ত ভূগর্ভের আলোড়ন বেশ রীতিমতই চলিয়াছিল। সেই আলোড়ন ও সমুদ্রের লবণজলের কার্য্য ফলে ম্যাডাগাস্কার, নিউজীলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ মহাদেশ হইতে এই যুগেরই কোন সময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ম্যাডাগাস্কার আফ্রিকার অত্যন্ত সন্নিহিত হইলেও উভয়ের প্রাণরাজ্যে অত্যন্ত প্রভেদ দৃষ্ট হয়। আফ্রিকার পরিচায়ক স্তন্যপায়ী, পক্ষী প্রভৃতি কিছুই উক্ত দ্বীপে নাই বলিলেও চলে। উভয়ের মধ্যস্থিত সাগরাংশের গভীরতা ন্যূনাধিক ৪০০০ হাত। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীলণ্ডের মধ্যে ৮০০০ হাতেরও অধিকগভীর সাগরশাখা ব্যবধান থাকিলেও শেষোক্ত দ্বীপের উত্তর পশ্চিম কোণে ৪০০০ হাত গভীরতা পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল দ্বীপের কোন দিকে সাগরশাখা ন্যূনাধিক ৪০০০ হাত গভীর দৃষ্ট হয়, সেই সকল দ্বীপ নিশ্চয়ই সময়ে মহাদেশের সহিত কোন না কোন সময়ে সংলগ্ন ছিল। প্রাচীন সম্ভ্র-

দায়ের মতে সমগ্র ভূমিখণ্ড একবার সাগরগর্ভে নিলীন আর একবার জাগ্রত হইয়াছিল, এই প্রকারে যে কতবার মহাপ্লাবন ও মহাজাগরণ হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। আধুনিক অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে তাহা সম্ভবপর নহে। সাগরপৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূমিপৃষ্ঠ গড়ে ২২৫০ ফুট উচ্চ এবং সাগরের গভীরতা গড়ে ১৪৬৪০ ফুট। এ অবস্থায় যদি ভূমি সাগরে নিলীন হয়, তাহা হইলে তাহার উপর দুই মাইল উচ্চ সাগরজল উঠিবে। এই প্রকার ভূমিখণ্ড বারম্বার দৃশ্যাদৃশ্য হইলে আমরা প্রতিবার নূতন করিয়া জলজ শম্বুকাদির উৎপত্তি দেখিতে পাইতাম কিন্তু আমরা মোলস্ক অবধি সরীসৃপ পক্ষী প্রভৃতির ধীরে ধীরে আভ্যব্যক্তি দেখিয়া আসিলাম এবং পরেও দেখিতে পাইব যে মানবের অভিব্যক্তি-কিরূপে সাধিত হইয়াছে। একই স্তরে পৃথিবীর এক অংশে যে এক প্রকার জীব এবং অন্য অংশে তাহা হইতে বিসদৃশ জীব দেখা যায় তাহা নহে —পৃথিবীর সকল অংশেই সমস্তরে প্রায় সদৃশ ও আত্মীয় জীবেরই অস্তিত্ব দেখা যায়। ইহাও মহাপ্লাবনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। নদীপ্রবাহিত কর্দম-পর্ব্বতের সেই আদিকালাবধি অস্তিত্বও ইহার বিরোধী। মহাপ্লাবন না ঘটিলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লাবন অথবা ক্ষয়কার্য্য যে ঘটে নাই তাহা নহে। পণ্ডিতেরা ৪০০০ হাতের গভীরতা এবং অন্যান্য প্রমাণ অবলম্বনে স্থির করিয়াছেন যে পূর্ব্বে ব্রিটেন ও ইউরোপ সংলগ্ন ছিল, এমন কি আইসল্যাণ্ডও ইউরোপের সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল। এই সকল অনুমিতসংযোগ দ্বীপসমূহেই কেবল পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি জীবজন্তুর আধিক্য দেখা যায়।

ঠিক যে কোন্ জীবের অভিব্যক্তিতে বরাহের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু কূর্ম্মযুগের পরবর্ত্তী যুগে স্থূলচর্ম্মী বরাহেরই প্রাদুর্ভাব দেখি। বরাহ বলিতে যে বর্ত্তমান বরাহ বুঝিতে হইবে তাহা নহে। বরাহ যুগে স্থূলচর্ম্ম জীবের আকারে প্রকারে বহুল ব্যাপ্তি হইয়াছিল, বরাহই বলিতে গেলে তাহাদের আদর্শস্বরূপে ধরা যাইতে পারে। এই যুগাবধি ভূগর্ভের কোন বিরাট আলোড়নের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই যুগের তিন স্তর—আদি, মধ্য ও অন্ত। আদি স্তর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে গ্রীষ্ম ঋতুরই একমাত্র রাজত্ব ছিল। কিন্তু ঋতুবিভাগ ক্রমেই পরিস্ফুট হইতেছিল। এই স্তরে হিমালয় প্রায় বর্ত্তমান উত্তুঙ্গতা লাভ করে। এই স্তরে নানাপ্রকার প্রাণীর



আবির্ভাব দেখা যায়। এই সময়ে ব্যাঘ্রবিড়াল, বাদুড় প্রভৃতি এবং বিশেষত শূকর জাতীয় জীবের প্রাদুর্ভাব। মাংসাশীগণ এখনও অধিকাংশই কোষপায়ী। এই স্তরেই বর্ত্তমান ঘোড়ার পূর্ব্বপুরুষ প্রথম পাওয়া গিয়াছে—ইহা টেপার ও ঘোড়ার মধ্যবর্ত্তী শৃঙ্খল ও শৃগালের ন্যায় ক্ষুদ্রকায়। মধ্যস্তরের বিশেষ জীব চতুর্দন্ত ঐরাবত ও বক্রদন্ত হস্তী। মনুষ্য ভিন্ন জীব জন্তুতে পরিবৃতা হইয়া ধরিত্রীমাতা আনন্দে হাস্যবদনা। স্থূলচর্ম্মী জীবেরই বিশেষ প্রাদুর্ভাব। এই স্তরে যখন বানর পাওয়া যায়, তখন অনুমান হয় যে অন্তত আদিস্তরেই বানরের পূর্ব্বপুরুষের অভিব্যক্তি হইয়াছিল, এবং তাহা হইতে এক রেখা বানর প্রভৃতির দিকে, গেল, অপর রেখা মানবের অভিব্যক্তির দিকে গেল। ইহার পরবর্ত্তী স্তর পর্য্যন্ত উত্তরাখণ্ড শীতপ্রধান হইয়া পড়িলেও জীবগণের সুমেরু পর্য্যন্ত যাইবার কোন বাধা ছিল না—তখনও বরফে তাহা আচ্ছন্ন হয় নাই। শেষ স্তরে বৃহৎকার ঐরাবত প্রভৃতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এই স্তরের শেষভাগে উত্তরাংশ শীতল হইতে লাগিল ও পর স্তরে তুষারে আবৃত হইয়া গেল। আমরা এই তুষারাবরণ কাল অবধি বামনাবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী নৃসিংহযুগ ধরিলাম। নৃসিংহযুগের সহিত মানবের অভিব্যক্তির বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এই কারণে তাহার বিষয় পরপ্রবন্ধে বলিব। নৃসিংহ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে মানুষের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, সুতরাং অন্যান্য প্রাণীগণের মধ্যে একটা তীব্রতম জীবনসংগ্রাম ও তাহাদিগের বৃদ্ধির পক্ষে কঠোরতম বাধা পড়ে নাই। তাহারা আপনাপন ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়া যথানিয়মে অভিব্যক্তির নিয়মাধীন হইতে লাগিল। ধরিতে গেলে মানুষের ন্যায় হিংস্রক জীব দ্বিতীয় নাই। মানুষ নিজের সুখের জন্য অপ্রয়োজনে শত শত প্রাণী বধ করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু অপরাপর প্রাণী আত্মরক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনে পড়িয়া সংগ্রামে উদ্যত হয়। মানুষ শত্রুপক্ষকে জব্দ করিবার জন্য হয়তো শত শত নদী জলাশয় বিষাক্ত করিয়া রাশি রাশি প্রাণীর বধের কারণ হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না, এরূপ "গ্রাম উজাড়" পূর্ব্বক বধসাধনে একমাত্র মানুষেই অগ্রসর হয়। মাথার টুপিতে পালক দিলে ভাল দেখায় মনে করিয়া কত নিরীহ পক্ষীর হত্যা হইতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে ভূতত্ত্ব অবলম্বনে প্রাণপ্রসার ও জীবের অভিব্যক্তি

সমর্থন করিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া আসিলাম। এইবারে আমাদের ঋষিরাও যে অভিব্যক্তিবাদে নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন না তাহাই দুইচারি কথায় প্রদর্শন করিব। ঋষিরা ব্রহ্মবিদ্যাকে রূপকল্পনা দ্বারা আচ্ছন্ন রাখিয়াছেন তাহা তাঁহারা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। সেইরূপ আমরা দেখিতেছি যে তাঁহারা তাঁহাদের অবতার কল্পনার ভিতরে ভূতত্ত্ব ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমান কল্পের প্রথম অবতার করিলেন মৎস্য। মৎস্যাবতারের পৌরাণিক কথা হইতে আমরা অনুমান করি যে তখন দাক্ষিণাত্য জাগ্রত ছিল এবং ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ মৎস্যের ক্রমশ আবির্ভাব হইয়াছিল। হিমালয়ও বোধ হয় তখন মস্তক উত্তোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় অবতার হইল কূর্ম। কূর্মাবতার কথা হইতে অনুমিত হয় যে কূর্মযুগে উত্তরাখণ্ড বা মেরুসন্নিহিত প্রদেশ সাগরগর্ভে একবার প্রবেশ করিয়াছিল এবং ভূগর্ভের অতি প্রকাণ্ড আলোড়ন ও অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়াছিল। সেই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নানা স্থানের উন্নতি ও অবনতি ঘটিয়া উন্নত ভূমিতে ঐরাবত, ঘোড়া, গরু প্রভৃতি জন্মাইবার অবসর হইয়াছিল। বোধ হয় দাক্ষিণাত্যে কূর্মযুগের স্তরে এই সকলের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। কূর্মগণের জীবনসংগ্রামে শত্রু শম্বূক ও মৎস্য অবস্থাবৈগুণ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এই যুগে নীলকণ্ঠ নামক ত্রিতার (ত্রিনয়ন) কোন সরীসৃপের আবির্ভাব হইয়াছিল, সম্ভবত সেই সরীসৃপের প্রধান খাদ্য বিষাক্ত বায়ু। আজও নিউজীলণ্ডে ত্রিনয়ন একপ্রকার সরীসৃপ পাওয়া যায়, তথাকার অধিবাসীদের ভাষায় তাহাকে "তুয়াতারা" (Tuatara) বলে। হয়গ্রীব মৎস্য এবং সিংহিকানন্দন অথবা সিংহাকৃতি রাহু নামক একজাতীয় শম্বূক সম্ভবত বাঁচিয়া গিয়াছিল। বরাহাবতার কথা হইতে উপলব্ধি হয় যে বরাহযুগের পূর্ব্বে পৃথিবীর অনেকটা সাগরপ্লাবিত ছিল। অতি ক্ষুদ্রকায় বারাহ কোন জীবের উৎপত্তি হইয়া ক্রমশ অতি বৃহৎকায় আদিবরাহের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল। বরাহযুগের জীবগণের সহিত তাহাদের শত্রু সরীসৃপ দৈত্যগণের জীবনসংগ্রামে দৈত্যগণই পরাস্ত হইল—এক শ্রেণীর সরীসৃপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। বলা বাহুল্য যে বরাহযুগে বরাহবংশের অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়া পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছিল, অবশেষে (কালিকাপুরাণের মত সত্য হইলে) অষ্টপদ শলভ তাহাদিগকে



স্বীয় খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিনাশসাধন পূর্ব্বক পৃথিবীকে মানবের আবাসের উপযুক্ত করিয়া দিল। যে যুগে যে জীব অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের প্রধান জীব তাহার জীবনসংগ্রামে শত্রু বলিয়া সম্ভবত দৈত্য প্রভৃতি আখ্যা পাইয়াছিল।

আমরা দেখিয়া আসিলাম যে কি প্রাচ্য ঋষি, কি পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিৎ, সকলেরই মতে যুগে যুগে প্রাণপ্রসার ও অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু এই প্রাণপ্রসারের প্রণালী কি? প্রাণপ্রসার ঘটিল কিরূপে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বরাহযুগ পর্য্যন্ত আমেরু বিষুব ভূখণ্ডে গ্রীষ্ম ঋতুরই রাজত্ব ছিল। ইহার সম্পূর্ণ প্রমাণ প্রদর্শন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবরে অসম্ভব—তাহার জন্য ভূতত্ত্ব বিষয়ক একটী পৃথক্ গ্রন্থপ্রকাশ আবশ্যক। মেরু পর্য্যন্ত জীবগণের যাতায়াত অবাধ ছিল। যাতায়াত অবাধ ছিল বলি কেন, আমাদের বিশ্বাস সুমেরুবৃত্তেই প্রথম জীবের উৎপত্তি এবং মানব পর্য্যন্ত সকল জীবেরই পূর্ব্বপুরুষের প্রথম উৎপত্তি সুমেরুবৃত্তে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে যখন মেরুপ্রদেশে কিঞ্চিৎ চাপা হইতে লাগিল, তখন সুমেরুবৃত্তই প্রথম জীবোৎপত্তির উপযুক্ত হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। কুমেরুবৃত্তেও জীবোৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সম্ভবত অন্য কোন কারণে দক্ষিণ দিক্‌টাই জলপূর্ণ থাকিয়া উত্তরদিকের ন্যায় প্রাণীর আবাস স্থানের তেমন উপযুক্ত হইতে পারে নাই। কুমেরুবৃত্তে যে তিমি মৎস্য পাওয়া যায়, তাহার মস্তকই সার—সম্ভবত উপযুক্ত সময়ে সুমেরু হইতে কুমেরুতে গিয়া তিমি মৎস্য অনাহারে সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলমস্তক আকার লাভ করিয়াছে। আমাদেরও শাস্ত্রে দক্ষিণ দিক্‌টাকে মৃত্যুর দিক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের প্রবাদেও তাহাই চলিয়া আসিয়াছে। আমার এই উপপত্তি স্বীকার করিলে অনেক আপাত বিসদৃশ ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে প্রাণী-বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক কেন? উভয় মহাদেশের উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ অত্যন্ত গভীর—উভয় দেশের চতুর্হস্ত বানর জাতির মধ্যে একটী শ্রেণীও অন্যোন্যসাধারণ নাই। আফ্রিকাতে ছুছুন্দরী ও তৎপরিবারের শজারু প্রভৃতি কীটভুক্ প্রাণী পাওয়া যায়, দক্ষিণ আমেরিকায় তাহা পাওয়া যায় না। আবার দক্ষিণ আমেরিকার

বর্ম্মিল (Armadillo) প্রভৃতি অদন্তক প্রাণী পাওয়া যায়, আফ্রিকায় তাহা পাওয়া যায় না। উভয় দেশে পক্ষীজাতির মধ্যেও কোন সাধারণ শ্রেণী দেখা যায় না। উভয় দেশেই কয়েকবিধ অন্তর্জাত (indigenous) পক্ষীর নানা শ্রেণী ও বর্গ অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল ঘটনা হইতে বুঝিতে পারি যে উভয়দেশ সাগরগর্ভ হইতে জাগ্রত হওয়া অবধি সাগরব্যবহিত ছিল, সংলগ্ন ছিল না। আরও অনুমান করি যে কূর্মযুগে সরীসৃপ স্তরে অথবা তৎপূর্ব্বে সরীসৃপ সকল সাগর ভেদ করিয়া উভয় দেশে যাতায়াত করিত, কিন্তু তদভিব্যক্ত স্থলজ জীবজন্তু সকলের যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল। অথবা আমাদের বিশ্বাস যে সুমেরুবৃত্তে কূর্মাভিধেয় সরীসৃপ সকল উৎপন্ন হইয়া কতকগুলি দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়া বসতি পূর্ব্বক একপ্রকারে অভিব্যক্ত হইল, কতকগুলি আফ্রিকায় উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন প্রকারে অভিব্যক্ত হইল। সম্ভবত আমেরিকা অঞ্চলে সুমেরুবৃত্তে বর্ম্মিল জন্মগ্রহণ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় বিশ্রাম স্থান লাভ করিয়া এবং ইউরাসীয় অঞ্চলের সুমেরুবৃত্তে শজারু প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া আসিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি প্রাচ্য মহাদেশে বিস্তৃত হইয়া অভিব্যক্তির সহায়তা করিয়াছিল। উত্তরে ক্রমেই শীত পড়িতেছিল, ইহা ও অন্যান্য কারণে অনুমান হয় যে উত্তর হইতে জীবজন্তু নীচে নামিয়াছিল, কিন্তু নীচেকার জীবজন্তুর উপরে যাইবার বিশেষ কোন প্রমাণ বা পরিচয় পাই না। আবার উত্তর আমেরিকায় আমরা স্কঙ্ক (skunk), গণ্ডকোষী (pouched) ইন্দুর এবং টর্কী (turkey) পাই, আসিয়ায় পাই না এবং আসিয়ায়ও ছোট শূকর, শজারু, মাছিধরা পাখী (flycatcher) ও ময়ূর জাতি আমেরিকায় পাই না। ইহা হইতেও বুঝিতেছি যে সুমেরুবৃত্ত দিয়া যাতায়াত ছিল না, নচেৎ উভয় দেশেই এই সকল জীব পরস্পরসাধারণ হইত নিঃসন্দেহ। আমাদের অনুমান যে স্কঙ্ক প্রভৃতি উত্তর আমেরিকার বিশেষ প্রাণীগণের পূর্ব্বপুরুষ সেই অঞ্চলের সুমেরুবৃত্তে জন্মাইয়া উক্তদেশে উপযোগী আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং ছোট শূকর প্রভৃতি আসিয়ার বিশেষ জীব এই অঞ্চলের সুমেরুবৃত্তে জন্মাইয়া আসিয়াতেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। যে সকল বিশেষ বিশেষ জীবের উল্লেখ করিয়া আসিলাম, ইহারা এত ক্ষুদ্রকায় যে, যে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিত সেই অঞ্চলে সম্মুখে বিচারণভূমি প্রাপ্ত হইয়া



সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই তাহাদের পক্ষে সম্ভব, অপর কোন অঞ্চলে আহার অন্বেষণে যাওয়া ততটা সম্ভবপর নহে।

আরও কয়েকটী ঘটনা আমাদিগের এই উপপত্তিকে যথেষ্ট সমর্থন করিবে। আমেরিকা ও ইউরাসীয়, উভয় মহাদেশেই একই সময়ে চতুর্দ্দন্ত ঐরাবতের আবির্ভাব দেখি; তন্মধ্যে ইউরাসীয় ঐরাবত হিমানীযুগের সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত হস্তীর জন্মদান করিল, কিন্তু আমেরিকায় ঐরাবত ইউরাসীয় হইতে আরও দু'এক স্তর বাঁচিয়া থাকিয়া একেবারেই বিলুপ্ত হইল। ইহাতে বোধ হয় আমেরিকা ঐরাবতের উপযুক্ত হয় নাই, কিন্তু স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে সুমেরুবৃত্ত হইতে উভয় দেশেই ইহাদের আমদানী হইয়াছিল। টেপায় পশু পাওয়া যায় মালয় দ্বীপপুঞ্জে এবং আমেরিকায়। দক্ষিণ আসিয়া হইতে সুমেরু ঘুরিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছান কল্পনা করিবার অপেক্ষা সুমেরুবৃত্তে টেপারের জন্ম লাভ এবং তথা হইতে ইউরাসীয় ও আমেরিকা, দুইদিকে বিস্তৃতি অনুমান করা কি সহজ ও সঙ্গত নহে? একদিকে সুসভ্য মনুষ্যের তাড়নায় টেপার সুমাত্রা প্রভৃতি মালয় দ্বীপে তাড়িত হইল এবং অপরদিকে দক্ষিণ আমেরিকায় তাড়িত হইয়া টেপার মনুষ্যবিরল প্রদেশে বাস করিতে লাগিল। আসিয়ায় উষ্ট্র এবং আমেরিকায় লামাজাতি সম্বন্ধেও আমাদের একই কথা, কেবল উষ্ট্র মরুভূমির উপযুক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হইল এবং লামা পর্ব্বতারোহণের উপযুক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হইল। গরু, ঘোটক, ভল্লুক প্রভৃতি অপরাপর জীব সম্বন্ধেও ঐ একই বক্তব্য। সুমেরুবৃত্তের নিম্নে যে আমদানী ব্যতীত আপনাপনি জীবের অভিব্যক্তি ঘটে নাই, তাহার প্রমাণ ঐতিহাসিক কালে প্রাণপ্রসারের দৃষ্টান্তেই দিয়া রাখিয়াছি। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীলণ্ডে শূকর, খরগোস প্রভৃতি জীব জাহাজ প্রভৃতির সাহায্যে আনীত হইয়া অতি অল্প দিনেই বাড়িয়া উঠিয়াছে; দক্ষিণ আমেরিকায় ঘোটক ও বলদ এবং উত্তর আমেরিকায় চড়ুই আমদানী হইয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যখন এই সকল দেশ যথাযথোক্ত প্রাণীগণের উপযুক্ত দেখা যাইতেছে, তখন এই সকল জীব ইতিপূর্ব্বে কেন সেখানে অভিব্যক্ত হয় নাই? কারণ স্পষ্ট যে তাহারা ইতিপূর্ব্বে তথায় পৌঁছিতে পারে নাই। হিমানীযুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুমেরুবৃত্ত যে জীবের প্রধান উৎপত্তি স্থান ছিল, সেই উপপত্তি উপরোক্ত

দৃষ্টান্ত হইতে একপ্রকার সিদ্ধান্তকল্প হইয়াছে দেখিতেছি। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিলে আফ্রিকা ও আমেরিকা সংযোজক এক মহান্ ভূমিখণ্ডের কল্পনা করিবার কোনই প্রয়োজন হইবে না।

বৃহৎকায় প্রাণীগণের প্রসারপ্রণালী বলিলাম, কিন্তু উদ্ভিদ-বীজ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় প্রাণীদিগেরও সুন্দর প্রসারপ্রণালী আছে—উপায়সমূহের মধ্যে বায়ু প্রধান। যে বায়ু প্রভঞ্জনরূপে লৌহশৃঙ্খল ভগ্ন করে, সেই বায়ু যে উদ্ভিদ-বীজ সকল উড়াইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যাইতে সক্ষম তাহা বলা বাহুল্য। এমনও হয় যে একস্থানের উদ্ভিদবীজ অপর স্থানে বায়ুচালিত হইয়া স্বয়ং রোপিত হইল, আবার সেই সকল উদ্ভিদের বীজ সময়ক্রমে বায়ুচালিত হইয়া আরও দূরে নীত হইল। এইরূপে সুমেরুবৃত্ত হইতে যে জাবা দ্বীপে উদ্ভিদবীজ নীত হইয়া সজাতীয় বৃক্ষের উৎপাদন করিতে সক্ষম তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। ওয়ালেস সাংঘাই নগরের এইরূপ একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। জীবজন্তুর পদসংলগ্ন মৃত্তিকাবলম্বনেও অনেক উদ্ভিদবীজ স্থানান্তরিত হয়। বায়ুর কার্য্যের একটী দৃষ্টান্ত দিই। বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ১২০ মাইল পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে, এ অবস্থায় সর্ষপবীজের ন্যায় ক্ষুদ্র বীজ সকল যে ১২ ঘণ্টাব্যাপী এক ঝড়ে ১০০০ মাইলের অধিক উড়িয়া যাইতে পারে বলা বাহুল্য। কীট পতঙ্গ ও এইরূপে দেশদেশান্তরে অনায়াসে নীত হইতে পারে। দেখা গিয়াছে বায়ুবলে ১৮ হাজার ফুট উচ্চে কীট পতঙ্গ উন্নীত হইয়াছে—অত উচ্চে কোন প্রভঞ্জন বায়ুর মুখে পড়িলে হাজার হাজার মাইল উড়িয়া গিয়া কি পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারে না? ইহা ব্যতীত নৌকা, নদী প্রবাহিত বৃক্ষসমূহে ডিম্বাকারেও কীট পতঙ্গ স্থানান্তরিত হয়। যত নিম্ন স্তরের জীব, তত অধিক শাবক প্রসব করে। কীটাদির উৎপাদিকাশক্তি এত বেশী যে সহস্র বৎসরে একবার কয়েকটী কীট একস্থানে গিয়া পড়িলেই তাহা অচিরে পূর্ণ হইবার ভাবনা থাকে না।

এই অধ্যায়ে দেখিলাম যে ভূগর্ভের আলোড়নের ফলে মূলত পৃথিবীর আকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে প্রাণপ্রসার ও জীবের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে এবং সেই প্রাণপ্রসারের প্রণালী কি। এই প্রাণপ্রসার আলোচনা কালে একটী বিশেষ বিষয় লক্ষ্য হয় যে প্রত্যেক স্তরের প্রাণী সহসা খুবই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া



জীবনসংগ্রামের ফলে প্রায়ই পরবর্ত্তী স্তরে হয় একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায় অথবা অধিকতর আবর্ত্তিত মস্তিষ্ক ও অভিব্যক্ত হইলেও আকারে প্রকারে ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। শম্বূকের কালে প্রকাণ্ডকায় শম্বূক রাজত্ব করিত, মৎস্য তাহাকে পরাস্ত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে উপযোগী প্রকাণ্ডদেহ ধারণ করিল; মৎস্যকে পরাস্ত করিয়া অভূতপূর্ব্ব বৃহৎকায় কূর্মগণের আবির্ভাব; কূর্মের পরাজয়ে বরাহ ও ঐরাবতগণের রাজত্ব। যে সকল শম্বূক, কূর্ম, মৎস্য প্রভৃতি আত্মরক্ষা করিয়া উদ্বৃত্ত রহিল, তাহাদের দেহগঠন তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত দৃষ্ট হয়। এই সকল দেখিয়া আর কি বলিতে পারি—"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং আশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ" কেহ বা আশ্চর্য্য হইয়া ভগবানের মহিমা দর্শন করেন, কেহ বা তাঁহার মহিমা আশ্চর্য্যভাবে ব্যক্ত করেন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

---

## কে।

কে রে তুই সুরভি মলয়!
আসিয়া ত্রিদিব হতে,
ছড়ালি এ ধরা পথে,
মধুর স্বরগ শ্বাস, জুড়াতে হৃদয়।

কে রে তুই নন্দনের ফুল,
এই শুষ্ক মরুবুকে,
ফুটিয়া উঠিলি সুখে,
ছড়ায়ে সুবাস ওই, অমূল্য অতুল।

কে রে তুই কোন দেব বীণা,
ভাঙ্গা এ হৃদয় যন্ত্রে,
বাজালি মধুর তন্ত্রে,
অমিয় বচন সুধা জুড়াতে বেদনা।

কে রে তুই স্নেহ মন্দাকিনী,
ঢালি স্নেহালোক রাশি,
অতীত তিমির নাশি,
সজীব করিলি হিয়া কি মন্ত্রে না জানি।

কি যে তুই বুঝিতে পারি না,
তোরে হেরি শূন্য বুকে,
শূন্য প্রেম জাগে সুখে,
কিছুতে হয়না কভু তোমার তুলনা।

আশীর্ব্বাদ তুই দেবতার,
সেই পুণ্য আলো দিয়া,
কর পরিপূর্ণ হিয়া,
তোর স্পর্শে পাই যেন পরশ তাঁহার।

শ্রীসরোজ কুমারী দেবী।

---

# জপজী।

## ( শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ )

—•*•—

১ ওঁ সৎনাম কর্ত্তাপুরুখ্ নির্ভও নির্বৈর্ অকালমূরৎ অজুনি সৈভং গুরুপ্রসাদ জপ্।

বঙ্গানুবাদ।

১ ওঁ যিনি সত্যনাম, কর্ত্তৃপুরুষ, নির্ভয়, নির্বৈর, অকালমূর্ত্তি, জন্মরহিত ও স্বপ্রকাশ সেই এক, অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে গুরুপ্রসাদে লাভ করিয়া জপ কর।

ঋতবোধিনী টীকা।

[ ১ ওঁ ] ওঁ শব্দটী অ, উ, ম এই তিন অক্ষরের সংযোগে উৎপন্ন। অকার অর্থে সৃষ্টি, উকার অর্থে স্থিতি, মকার অর্থে প্রলয়। '১ ওঁ' কি না সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা এক অদ্বিতীয় পুরুষ। পাছে ওঁ শব্দ বহুবাচক হয় সেই জন্য শিখেরা সেই এক পরমাত্মার একমেবাদ্বিতীয়ং ভাবের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিবার জন্য "ওঁ" এরও পূর্ব্বে ১ সংখ্যা চিহ্নিত করিয়া থাকেন। উপনিষদে আছে—

"সদেবসৌম্যেদমগ্রয়াসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"

অর্থাৎ "সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ স্বরূপ পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন।" আরণ্যকে গীত হইয়াছে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠতি এক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং।
( তৈত্তিরীয় আরণ্যক )

বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া সেই এক পুরুষ বিরাজ করিতেছেন সকল জগৎ

তিনি পূর্ণ করিয়া আছেন। রাজা রামমোহন রায়ও ঈশ্বরের একত্ব ভাব লোকের মনে অনুপ্রবিষ্ট করাইবার জন্য প্রথমকার ব্রহ্মসঙ্গীতে "ভাব সেই একে" বলিয়া গাহিয়া গিয়াছেন। অন্যত্র গুরু নানক বলিয়াছেন—

দুজা কাহে সিমিরিয়া জন্মে তে মর্ যা।
একো সিমরো নানকা জল্ থল্ রেহ্য়া সমাহ্॥

"যাহা উৎপত্তি ও বিনাশের অধীন এমন বস্তুকে ভাব কেন? সেই এক পরমাত্মাকে স্মরণ কর যিনি জলে স্থলে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।" [সৎ নাম] 'সত্যনাম' কথাটীর অর্থ সহজেই বুঝা যাইতেছে। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সত্যনাম ভিন্ন আর কোন্ নামে মানুষ তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে পারে? শিখদিগের পঞ্চম গুরু গুরু অর্জুন সাহেব গাহিয়াছেন—

রাগ মারু।

কৃতম্ নাম কথে তেরে জেহ্বা।
সত্য নাম্ তেরা পরা পূর্বলা॥

"জিহ্বা তোমার (রাম কৃষ্ণ আদি) অনেক কৃত্রিম নাম কীর্ত্তন করে কিন্তু তোমার যে সত্যনাম তাহা সকলের শ্রেষ্ঠ ও আদি অকৃত্রিম নাম। সত্যনাম তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম বলিয়াই উপনিষদ বলেন—

"ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম"
"সত্যং পরং পরং সত্যং"

কোন কোন পণ্ডিত "সৎনাম" শব্দের নিম্নলিখিত অর্থও করেন। সৎ কিনা সৎস্বরূপ ও নাম কিনা নিরাময় বা ব্যাধি রহিত। তাঁহারা পাণ্ডিত্য সহকারে 'ন' ও 'আম' শব্দের যোগে নাম্ শব্দ সিদ্ধ করেন।— 'ন' অর্থে না এবং 'আম' অর্থে আময় বা ব্যাধি। [কর্ত্তাপুরুখ] যিনি সকল জগতের কর্ত্তা বা প্রভু ইহাই সহজ অর্থ। মহাপুরুষদিগের অনেকেই এক একটী বিশেষ বিশেষ শব্দ বা বিশেষ চিহ্নের প্রতি অন্তরের অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন দেখা যায় গুরু নানকের এইরূপ "করতার" (কর্ত্তা) শব্দটী প্রাণের প্রিয় বস্তু ছিল—"করতার" শব্দ তাঁহার অন্তরের বাণী ছিল।—



তিনি যেন ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ভাবের ধ্যানে বিভোর ছিলেন। তাই তিনি এই মূল মন্ত্রে ঈশ্বরের "সত্যনাম" কীর্ত্তনের পরে "কর্ত্তাপুরুখ" না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই। কোন কোন শিখ পণ্ডিত 'কর্ত্তা' ও "পুরুখ" শব্দকে পৃথক করিয়া ঐ দুইটী শব্দের স্বতন্ত্র ভাবে অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা "কর্ত্তাপুরুখ" শব্দের একযোগে অর্থ না করিয়া 'কর্ত্তা' শব্দের স্বতন্ত্র ও 'পুরুখ' শব্দের স্বতন্ত্র অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে "পুরুখ" শব্দের দু তিন প্রকার অর্থ হয়। 'পু' কিনা নরক (পুন্নাম নরক কি?) হইতে যিনি 'রুখ' কিনা রক্ষা করেন তিনিই 'পুরুখ'। ঈশ্বর সকলকে নরক হইতে রক্ষা করেন বলিয়া তিনি "পুরুখ"। 'পুরুখ' শব্দের আরেক অর্থ—পুরে কিনা ঘটে ঘটে যিনি শয়ন করেন তিনি 'পুরুষ' বা 'পুরুখ'। পুরুখ শব্দের তৃতীয় অর্থ পতি বা স্বামী। ঈশ্বরকে স্বামী ও সকলকে তাঁহার পত্নী ভাবে দেখিয়া গুরু নানক একস্থলে গাহিয়াছেন "একা পুরুখ সবায় নার" অর্থাৎ পরমেশ্বরই এক পুরুষ কিনা পতি আর সকলে নারী। কথিত আছে যে গুরুনানক যখন সমাধিমগ্ন থাকিতেন তখন তাঁহার শিষ্যেরা "সৎকরতার" বলিলেই তাঁহার নয়নপুট খুলিয়া যাইত—"সৎকরতার" শব্দ তাঁহার এতই প্রিয় ছিল। তখন তিনি শিষ্যদিগের সহিত সদালাপ করিতেন।

[নির্ভও] নির্ভয় কি না ভয়রহিত—তিনি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। যিনি সকল জগতের কর্ত্তা তিনি আর কাহাকে ভয় করিবেন? [নির্বৈর] তাঁহার সহিত কাহারও বৈরীভাব বা শত্রুতা নাই। পরমেশ্বর সকলেরই মিত্র। যাহাতে সকলেরই মঙ্গল হয় তাহাই তিনি বিধান করিতেছেন। কাহারও প্রতি শত্রুতা বশতঃ যে তাহাকে তিনি দুঃখের ভাগী করিয়াছেন এবং কাহারও প্রতি মিত্রতা বশতঃ যে তাহাকে সুখী করিয়াছেন এরূপ নয়, তিনি সকলকেই নরক হইতে উদ্ধার করিয়া পরম সুখে সুখী করিবার জন্য তাঁহার মঙ্গল হস্ত সততই প্রসারিত করিয়া আছেন।

[অকাল মূরৎ] তাঁহার মূর্ত্তি বা স্বরূপ কালে ক্ষয় বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমান ভাবে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই ভক্ত নানকের মুখ হইতে "অকালমূরৎ" এই মহাবাক্য নির্গত হইতে পারিয়াছিল। এস্থলে "মূরৎ" শব্দ থাকিলেও নিরাকার ভাব ব্যক্ত হইবার পক্ষে কোনই ব্যাঘাত

হয় নাই, বরঞ্চ "মূরৎ" শব্দের সহিত অকাল শব্দের যোগে সেই কালাতীত পরম পুরুষের নিরাকার ভাবটীই সমধিক প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি "মূরৎ" শব্দের দ্বারা পাছে যদি কেহ মূর্ত্তি উপাসনার পক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন সেই ভয়ে ভীত হইয়া কোন কোন শিখ পণ্ডিত "মূরৎ" শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ করেন—"মূ" কি না আমার "রৎ" কি না রতি যে অকাল পুরুষের প্রতি সেই অকাল পুরুষের নাম "মূরৎ"। কোন টীকাকার "অকাল-মূরৎ" শব্দের অর্থ "সবৈবকালজীবিদ" লিখিয়াছেন। "সবৈবকালজীবিত" কি না নিত্য।

"নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং"

[ অজুনি ] যোনি হইতে যিনি উৎপন্ন হয়েন নাই অর্থাৎ তিনি জন্ম মরণরহিত। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥

"সেই দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ বাহ্যে এবং অন্তরে অবস্থিতি করেন, তিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, প্রাণ ও মন বিরহিত, শুভ্র এবং পরম অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ।" উপনিষদে যেমন "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" ইত্যাদি নেতি.নেতি জ্ঞাপক বাক্যের দ্বারা পরমার্থ বস্তুর বোধন করা হইয়াছে সেইরূপ গুরু নানকও এস্থলে "নির্ভয়", "নির্বৈর", "অকালমূর্ত্তি" ও "অযোনি" এই চারিটী বিশেষণের দ্বারা অনেকটা সেই ভাবেই পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

[ সয়ভং ] অর্থে স্বপ্রকাশ। সয়ভং শব্দ খুব সম্ভবতঃ "স্বয়ম্ভু" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ "সয়ভং" শব্দের পাণ্ডিত্য সহকারে নিম্নলিখিত অর্থ করেন—যাহাতে বাসনা সমূহ শয়ন করে তাহারই নাম শয় ( শেতে বাসনা যস্মিন স শয়ঃ ) কিনা অন্তঃকরণ, সেই চিত্তবৃত্তিকে যিনি জ্ঞানালোকের দ্বারা ভং কিনা ভঙ্গ করেন তিনিই 'সয়ভং'।

[ গুরুপ্রসাদ ] গুরুর প্রসাদে কিনা ঈশ্বরের প্রসাদে। এস্থলে প্রধান ভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশেই 'গুরু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, গুরু নানক এক ঈশ্বরকেই গুরু বলিয়া মানিয়াছেন। ঈশ্বরই পরম গুরু তাঁহারই উপদেশ সর্ব্বাগ্রে শিরোধার্য্য। যাঁহারা ঈশ্বরের বিষয় উপদেশাদি প্রদান করিয়া লোককে



ঈশ্বরের পথে লইয়া যান তাঁহারাও অবশ্য গুরু শব্দ বাচ্য, কিন্তু তাঁহাদের আসন ঈশ্বরের অনেক নিম্নে। শিখেরা ঈশ্বরকে "বাহগুরু" নামে ডাকিয়া থাকেন। "বাহগুরু" র "বাহ" শব্দ "বাহবা" কিনা শ্রেষ্ঠতা বাচক। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ শিখ পণ্ডিতেরা এই সহজ অর্থে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা ইহার নিম্নলিখিত অর্থ করেন—"বাহয়ন্তি কারয়ন্তি জগদুৎপত্ত্যাদি কার্য্যমিতি বাহা ব্রহ্মাদয়স্তেষাং গুরুঃ।" অর্থাৎ জগদুৎপত্ত্যাদিকারক ব্রহ্মাদিরও যিনি গুরু তিনি বাহগুরু পরমেশ্বর। কোন শিখ পণ্ডিত কেবল মাত্র "বাহগুরু" শব্দের ভাষ্য লিখিয়া একখানি বিস্তৃত সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

উপনিষদে আছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।

গুরু গ্রন্থ সাহেবে সৎ গুরুর লক্ষণ বলিয়াছেন—

সৎ পুরুখ জিন্ জানিয়া
সৎ.গুরু.তিস্কা নাম।

"যিনি সৎ পুরুষ পরমেশ্বকে জানেন তাহারই নাম সৎগুরু।" লৌকিক গুরু কিরূপ হওয়া প্রার্থনীয় নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে তাহার সুন্দর লক্ষণ বলা হইয়াছে—

গুরু তো এয়সা চাহিয়ে যেয়সা ধোবি হোয়।
দে দে সাবুন জ্ঞানকা কালিক্ ডারে ধোয়॥

অর্থাৎ গুরু এমন হওয়া চাই যেমন ধোবার মত। ক্রমাগত জ্ঞানরূপ সাবান দিয়া যিনি মনের কালিমা ধৌত করিতে সমর্থ।

অন্যত্র

এয়সা গুরু তো বহুৎ হেয় জ্ঞান ধ্যান সুধ নাহ।
তার সকে নহি এক্ কো গঁহে বহুৎ কি বাঁহ॥

"এমন ত অনেক গুরু আছেন যাঁহাদের জ্ঞান, ধ্যান, শুদ্ধি নাই। সে সকল গুরু অনেককে উদ্ধার করিবার জন্য অনেকেরই হাত ধরেন বটে কিন্তু তাঁহাদের একটী প্রাণীকেও উদ্ধার করিবার সামর্থ্য নাই।"

শিখদিগের এই মূল মন্ত্রে মুখ্য ভাবে ঈশ্বরকে এবং গৌণভাবে ঈশ্বর

বিষয়ক উপদেষ্টাদিগকে গুরু বলা হইয়াছে।

গুরু নানক এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়া পরে ইহা জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাই শিখসম্প্রদায়ের ইহা মূল মহামন্ত্ররূপে পরিগণিত।

এই মূলমন্ত্র সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ আছে—কথিত আছে যে গুরু নানক যখন সুমেরু পর্ব্বতের সমীপে গোরক্ষনাথী সিদ্ধমণ্ডলীর স্থানে গিয়া পড়িয়াছিলেন তখন সেই সিদ্ধ পুরুষদিগের সহিত তাঁহার অনেক কথালাপ হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বর বিষয়ক স্বরচিত অনেক মধুর মধুর পদ কীর্ত্তন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাহাতে সিদ্ধপুরুষেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি বালক কিরূপে এই দুর্গম প্রদেশে আসিতে সমর্থ হইলে'? তাহাতে বাবা নানকের অন্তর হইতে "এক ওঁকার" এই শব্দ উত্থিত হইল। সিদ্ধেরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন সেই যে এক পুরুষ কি নামে তাঁহাকে ডাক? তাহাতে তিনি গুরুগম্ভীরস্বরে তাঁহার প্রাণের প্রিয় বাণী মূল মন্ত্রটী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন "সৎনাম কর্ত্তাপুরুখ নির্ভও নির্বৈর অকালমূরৎ অযোনি সৈভং।" সিদ্ধ পুরুষেরা মূলমন্ত্রের সমাপ্তি শুনিবার জন্যই যেন ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন আর সকল বস্তুইত দৃষ্টিগোচরে পতিত হয় কিন্তু পরমাত্মা কেন দৃষ্টির অগোচর"? তাহাতে নানক বলিলেন "গুরুপ্রসাদ" অর্থাৎ তাঁহার দর্শনের জন্য গুরুর (ঈশ্বরের) প্রসাদ চাহি। ঈশ্বর প্রসাদে ঈশ্বর দর্শন লাভ হয়। গুরু নানক ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়াই সিদ্ধ মণ্ডলীর সমক্ষে মূলমন্ত্র প্রচার করিতে যেন উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আদ্ সচ্ যুগাদ্ সচ্ হেয়্ভি সচ্ নানক্ হোসিভি সচ্॥

বঙ্গানুবাদ।

তিনি আদিতে সত্য, যুগাদিতে সত্য, বর্ত্তমানে সত্য, এবং ভবিষ্যতেও সত্য।

ঋতবোধিনী টীকা।

এই স্তবের দ্বারা গুরু নানক সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান



সর্ব্বকালে একরূপতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

[আদি সচ্] আদিতে সত্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে যখন সৃষ্টির চিহ্ন মাত্র ছিল না যখন এমন কি কালের অস্তিত্ব মাত্রও ছিল না তখন সেই পূর্ণপুরুষ নিজ মহিমায় বিরাজ করিতেছিলেন। [যুগাদ সচ্] যুগাদিতে যুগের আদিতে অর্থাৎ সূক্ষ্ম সৃষ্টির পরে যখন কালের অস্তিত্ব সূচিত হইয়াছে কিন্তু সত্য ত্রেতাদি যুগে যখন কাল বিভক্ত হয় নাই, ব্রহ্মাদি মানবসৃষ্টিরও বহু পূর্ব্বে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর বিদ্যমান থাকিয়া স্বীয় শক্তিবলে সৃষ্টি রচনা প্রবাহিত করিতেছিলেন। [হেয়ভি সচ্] বর্ত্তমানেও সেই সত্য স্বরূপ পূর্ণপুরুষ সর্ব্বগত ভাবে অবস্থিতি করিয়া জগৎ সংসার নিয়মিত করিতেছেন। [হোসিভি সচ্] অনন্ত প্রসারিত ভবিষ্যতেও সেই অবিনাশী সত্যস্বরূপ পরমাত্মা পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকিবেন। অনেকটা ইহার অনুরূপ ভাবে কঠোপনিষদ একস্থলে বলিয়াছেন—

ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ।

"তিনিই ভূতভব্যের ঈশ্বর; তিনি অদ্য আছেন তিনি কল্য থাকিবেন।"

অন্যত্র—

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণঃ।

"ইনি জন্মবিহীন, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ পুরুষ।" পরমাত্মা চিরকালই একরস সত্যস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে তাঁহার কোন ন্যূনাধিক্য হয় না। ইহাই ভাবার্থ।

শ্রীঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

# অন্তরালে।

( ১ )

জানি বটে সৌদামিনি আঁধার গগনে,
মুহূর্ত্তের তরে হেসে মুহূর্ত্তে পালায়।
হাসায়ে জগতি তলে,
লুকায় নিরদ কোলে ;
সঞ্চারি তীতির ছায়া পথিকের মনে।

( ২ )

মুহূর্ত্তে মিলায় সত্য ক্ষণেক হাসিয়া,
গভীর করিয়া তোলে ঘন অন্ধকার।
উদ্ভ্রান্ত পথিক কুলে,
আকুল করিয়া তোলে।
থাকে তবু আশা পুনঃ উঠিবে হাসিয়া।

( ৩ )

বহেনা বসন্ত বায়ু বার মাস বটে,
ডাকেনা কোকিল সত্য সারা বর্ষভর,
ফোটেনা সেফালি ফুল,
মাতাইতে অলি কুল ;
সারাটা বছর বটে, চামেলি না ফোটে।

( ৪ )

বসন্তের মৃদু বায়ু, কোকিল কুজন,
সেথালি, বকুল, চাঁপা, মাবরি, চামেলি ;



সত্য বটে বার মাস,
না মিটায় মন আশ,
(তবু) পুনরায় পাক বলে আশা কি থাকে না ?

( ৫ )

শরতের চারুচাঁদ সুনীল অম্বরে,
বিলায়ে জোছনা রাশি ; জলদের পাশে
বুঝিবা বিশ্রাম আশে,
সত্যই লুকায় এসে।
শোভেনা কি পুনঃ শশী গগন মাঝারে ?

( ৬ )

সকলিই যায় আসে সময়ের ফেলে।
আমার সে ছবি খানি চপলার প্রায়।
দুদিনের তরে এসে,
চলে গেছে কোন দেশে,
নাহিক আশার লেশ পুনঃ পাইবারে।

শ্রীহরিহর শেঠ

# মোক্ষ।

যত পাপ রিপু করিয়া নিপাত
তাঁহারি চরণে করি প্রণিপাত,
দূর হবে সব আমার অভাব
জাগিয়া উঠিবে পুণ্যে প্রভাব,
ফুলের সুরভি বহে গো যেমতি
তেমনি আমার বহিবে সুমতি,
ধর্ম্মের সাহসে ভ'রে যাবে বুক
তাঁরি কাজে সদা হইব উৎসুক।
চিন্তা ক'রে দেখি অহোরাত্র
ভবে সার সেই তিনি মাত্র ;
সাধ হয় ত্যজি পাপপঙ্ক,
মুছি এই জীবন কলঙ্ক ;
আপনারে করি সংশোধন
লভিতে সেই পরমধন
তাঁর সাথে হ'য়ে যোগযুক্ত
সাধ হইতে পুরুষ মুক্ত।

# রাসায়নিক আকর্ষণ। *

সে দিন আকর্ষণের কথা যেমন বলা হইয়াছিল, আজও রাসায়নিক আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ ও যোগাকর্ষণ এই তিনটীর সম্বন্ধে আরও বলিবার আছে। রাসায়নিক আকর্ষণের যে নিয়ম বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ছাড়া আর একটী নিয়ম এই যে, যখন রাসায়নিক আকর্ষণ কার্য্য করিতে থাকে তখন তাড়িৎ ও তাপ উৎপন্ন হয়। তাড়িৎ ও তাপ, এই দুইটী এক পদার্থ অথবা বিভিন্ন তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। যদি ঘন গন্ধকদ্রাবকের (সল্‌ফ্যুরিক এসিড্) ভিতর শুধু জল দেওয়া যায়, তবে সেই জলের কতক ভাগ গন্ধকদ্রাবকের সঙ্গে এত বেগে মিলিত হয় যে যদিও গন্ধকদ্রাবকের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না, কতকটা পরিবর্ত্তন হয় মাত্র, কিন্তু যে পাত্রে দ্রাবক ও জলকে একত্র করা যায়, তাহা খুব গরম হইয়া উঠে; গন্ধকদ্রাবকে ও জলের পরমাণুতে যে তাপ গূঢ়ভাবে ছিল, গন্ধকদ্রাবকে জলের পরমাণুতে সবেগে যোগ হওয়াতে কতকটা তাপ বাহির হইয়া প্রকাশভাব ধারণ করে। আবার কোন কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাড়িৎ প্রকাশ হয়। সেই তাড়িৎ দুই প্রকার। যদি গন্ধকদ্রাবকে ও ধাতুতে যোগ করা যায় তাহা হইলে একবিধ তাড়িৎ গন্ধক-দ্রাবকে দেখা দেয়, অপরবিধ তাড়িৎ ধাতুতে দেখা দেয়। এই দস্তার চোঙ্গার ভিতর যদি গন্ধকদ্রাবক পোরা যায়, তাহা হইলে গন্ধকদ্রাবকের সঙ্গে আর দস্তার সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া নূতন এক পদার্থ প্রস্তুত হইবে; সেই সংযোগ হইবার সময় তাড়িৎ উদ্ভব হইবে এবং সেই তাড়িৎ দ্রাবকে এক রকম দেখা দিবে আর দস্তাতে এক রকম দেখা দিবে। এখন এই চোঙ্গার ভিতরে দুটো তার দুদিকে ধরিলে একটা তার দিয়া এক রকম তাড়িৎ চলিয়া আসিবে এবং অপর তার দিয়া আর এক ভাবের তাড়িৎ বাহির হইয়া আসিবে। গন্ধকদ্রাবকের পরিবর্ত্তনে খুব সামান্য পদার্থ জল বা তৈলে

* ১৬ই বৈশাখ ১৭৯৫ শক রবিবারে লিখিত।

ফেলিয়া রাখিলেও অল্প রাসায়নিক সম্বন্ধ বশত খুব কম তাড়িদুদ্গম হইবে; সেই তাড়িৎও দুই ভাগ হইয়া একটা জলে বা তৈলে, অপরটা সেই পদার্থে থাকিবে। ধাতুতে ও দ্রাবকে যোগ তো স্পষ্টই হয়; যেখানে কোনই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না যে রাসায়নিক কার্য্য হইতেছে, সেখানেও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাড়িদুদ্গম হইতেছে এবং সুতরাং সম্ভবত রাসায়নিক কার্য্যও চলিতেছে। সামান্য সামগ্রী মসলা যখন রন্ধনদ্রব্যের সহিত মিলিতেছে, চিনি যখন জলে গুলিয়া যাইতেছে, যখনি মিলিতেছে, অমনি তাড়িৎ উদ্গত হইতেছে, যদিও খুব কম পরিমাণে বটে—রাসায়নিক আকর্ষণ যত কম সেই অনুসারে তাড়িৎও কম, বিশেষ যন্ত্র ব্যতীত তাহা অনুভূত হয় না। ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, রাসায়নিক কার্য্যমাত্রেই তাড়িৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উপদানকে আশ্রয় করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাসায়নিক কার্য্যে তাড়িতের সঙ্গে তাপেরও উৎপত্তি হয়। গন্ধকদ্রাবক জলের সহিত মিলিত হইলে অত্যন্ত তাপোৎপত্তি হয়। জলের ভিতরে যে দুই প্রকার পদার্থ আছে, সেই দুই পদার্থ দহক (অক্সিজেন) ও অজনক (হাইড্রোজেন) মিলিত হইয়া যখন জল প্রস্তুত হয়, তখন তাহারা এত বেগে মিলিত হয় যে যেমন তাড়িৎ উৎপন্ন হয়, তেমনি তাপও উৎপন্ন হয়—তাপ এত অধিক উৎপন্ন হয় যে জল প্রস্তুত হইয়াই বাষ্পাকারে পরিণত হয়। প্রবল রাসায়নিক কার্য্যে তাপের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, রাসায়নিক কার্য্য ধীরে ধীরে হইলে তাপ কম হয়। দুই বস্তুর সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয়। দুইটা চকমকির ঘর্ষণে যে তাপ নির্গত হয়, সেই তাপের যোগে চকমকির রেণু লাল হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে পতিত হইয়া শোলা টিকা প্রভৃতিকে আগুন ধরাইয়া দেয়। তেমনি অজনক ও দহক যদিও দুইটী সূক্ষ্ম গ্যাস, কিন্তু জল প্রস্তুত হইবার কালে ইহার অণু উহার অণুর সঙ্গে এত বেগে মিলিত হয় যে সেই ঘর্ষণে তাপোৎপত্তি হয়। দুইটী কারণে আমরা সকল সময়ে তাপ জানিতে পারি না—এক, রাসায়নিক কার্য্য কম হইলে যখন তাপও কম হয়, দ্বিতীয় তাপ উৎপন্ন হইলেও যখন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। কোন কোন পদার্থ তাপকে ধরিয়া রাখিতে পারে না; যে মুহূর্ত্তে তাপ উৎপন্ন হয়, অমনি বাহির হইয়া যায়। আবার এমন পদার্থ



আছে যাহা হইতে তাপ শীঘ্র বাহির হইতে পারে না। যাহা হইতে তাপ শীঘ্র বাহির হইয়া যাইতে পারে তাহার নাম তাপ-পরিচালক পদার্থ, যেমন ধাতু। কাচ, মাদুর, কাঠ, এইসকল অপেক্ষাকৃত কম পরিচালক। যে সকল পদার্থে তাপ কতকক্ষণ থাকিতে পায়, সেই সকল পদার্থে তাপ পরীক্ষা করিয়া জানিতে অবকাশ হয়। রাসায়নিক আকর্ষণ যেখানে, তাড়িতুৎপত্তি সেখানে, তাপোৎপত্তি সেখানে, কেবল পদার্থের পরিচালকতা অনুসারে আমরা তাহা ধরিতে পারি বা না পারি।

আর একটী কথা বাকী রহিয়া গিয়াছে। পরমাণু কাহাকে বলে তাহার আভাস পূর্ব্বে বলিয়া দেওয়া গিয়াছে। তবেই মনে কর যে পরমাণু কি সূক্ষ্ম পদার্থ। পরমাণু-মিলনের পর কি হয়—এক একটী যৌগিক উৎপন্ন হয়। যেমন অক্ষরের সন্নিবেশভেদে বিভিন্ন শব্দের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিভিন্ন হয় এবং বিশেষ বিশেষ অর্থ হয়, তেমনি অমুক অমুক তিন চারটী অণু মিলিত হইয়া বিশেষ বিশেষ দানা প্রস্তুত হয়, আবার সেই বিশেষ বিশেষ দানা দ্বারা বিশেষ বিশেষ বস্তুর পরিচয় হয়—এই সকল দানার বিশেষ গুণ এই যে কোনটা গোল কোনটা চতুষ্কোণ, কোনটা ত্রিকোণ ইত্যাদি। ∴ এই পাঁচটী অণু—ইহারা যেন সন্নিবিষ্ট হইয়া গোল দানা হইল; যেখানে এই পাঁচ প্রকার অণু মিলিত হইবে, সেইখানেই গোল-আকার দানা বাঁধিবে; আর পাঁচ প্রকার অণু সন্নিবিষ্ট হইয়া হয়তো আর একটী ত্রিকোণাকার দানা বাঁধিবে; আবার কতকগুলি হয়তো চতুষ্কোণ দানা বাঁধিবে।

এইরূপ আকার ঘটিবার নিয়ম যে কি, তাহা অতি বিস্তৃত কথা আর দুর্বোধ কথা। সাধারণ নিয়ম এই পাওয়া যায় যে সেই সকল অণু-মিলিত পদার্থে বিশেষ বিশেষ আকার নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। দানার সংঘাতে বস্তু ক্রমে বড় হইয়া থাকে। প্রথমে পরমাণুর যোগে অণু হয়, ক্রমে অণুর যোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা জন্মায়—সেই দানা অতি ক্ষুদ্র, চক্ষুগোচর হয় না; পরে সজাতীয় বা বিজাতীয় দানা মিলিত হইয়া পদার্থ হয়। এই চোঙ্গটা তামার অণু মিলিত হইয়া গঠিত হইয়াছে, ইহা হইল সজাতীয় অণু দ্বারা প্রস্তুত। আমরা যেখানে অণু বলিব, সেখানে যে অণুতে দানার উপক্রম হইয়াছে তাহাই

মনে করিয়া লইতে হইবে, পরমাণু বলিলে সূক্ষ্মতম পদার্থ বুঝিতে হইবে। বিজাতীয় পদার্থ মিলিয়া যেমন এই বইটা প্রস্তুত হইয়াছে—ইহাতে চামড়া আছে, কাগজ আছে, লেখা আছে, পুস্তকের ভিতর নানা পদার্থ আছে, সকলগুলি যোগাকর্ষণে মিশ্রিত হইয়া পুস্তক হইয়াছে। যোগাকর্ষণের দ্বারা যদি অনেক গোল অণু মিশ্রিত হয় তাহা হইলে সেই গোল অণু সকলের মধ্যে মধ্যে ফাঁক থাকিবে। চতুঃপার্শ্বস্থিত অণুসকলের সঙ্গে মধ্যস্থিত অণুর ১২টী স্থানে স্পর্শ হইবে মাত্র, আর সকল স্থান খালি থাকিবে। একটী গোলার সঙ্গে যদি একটী গোলা মিলিত হয়, তাহা হইলে একটী বিন্দুতেই উভয়ের সংস্পর্শ হয় মাত্র, অন্য স্থান খালি থাকে। এইরূপ একটী গোলাকে ১২টা অণুরূপ গোলা ঘিরিতে পারে, সুতরাং মাঝের গোলাটা ১২টা বিন্দুতে সংস্পৃষ্ট হয় এবং মধ্যে মধ্যে স্থান খালি রহিল। ত্রিকোণ অণু যদি মিলিত হয় তাহা হইলে প্রায় ফাঁক থাকিতে পারে না, কিন্তু তবুও ফাঁক থাকে; যেমন এই একটা পদার্থ তাহাতে ত্রিকোণ দানা বাঁধিতে আরম্ভ হইয়াছে। মনে কর যেন কতকগুলা দানা পাশাপাশি ঠিক বাঁধিয়া আসিয়াছে। কিন্তু খগ ফাঁকের মধ্যে অত বড় দানা ধরিবে না, সুতরাং হয়তো একটা দানার মাথাটা ঘোঁজের ভিতর ঢুকিয়া রহিল, সমস্তটা যাইতে পারিল না, কাজেই মাঝে ফাঁক রহিয়া গেল। সরল রেখায় প্রস্তুত

হইলেও সকল পদার্থেরই ভিতর এইরূপ ফাঁক পড়িয়া যায়। ঠিক ষট্‌কোণ-আকার মিলিত পদার্থ হইলে ফাঁক থাকে না, যেমন মধুচক্র তাহা ষট্‌কোণ। কিন্তু দানা বাঁধিবার সময় কতকটা বিকর্ষণের কারণে অণুগুলা ঠিক গায়ে গায়ে মিলিতে পারে না। একের অধিক পরমাণু মিলিয়া অণু হয়, অণুসকল মিলিয়া পদার্থ হয়। অণুমিলিয়া যখন পদার্থ হয় তখন রাসায়নিক আকর্ষণ থাকে না, যোগাকর্ষণ থাকে এবং সেই অণুসকলের মধ্যে ফাঁক থাকে। একটা দৃষ্টান্ত বলা আবশ্যক। জল তরল পদার্থ, কিন্তু বাস্তবিক জল যত কঠিন, এমন কিছুই নাই। জল যদি আল্‌গা থাকে তবেতো তাকে এদিক ওদিক সহজে চালান যায়; কিন্তু ইহাকে যদি কোন পদার্থে আবদ্ধ করা যায়, এই চোঙ্গের ভিতর জল পূরাপূরি রাখিয়া মুখ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, আর ইহাতে যদি চাপ দেওয়া



যায়, তাহা হইলে বরং ধাতুর ভিতর দিয়া জল ঘামের মত উজাইয়া বাহির হইবে কিন্তু জল নুইবে না। অনেক চাপ দিলে জলের আয়তন এত অল্প কমে যে তাহা লক্ষ্য হয় না; আবার যেইমাত্র চাপ ছাড়িয়া দিবে তখনি আবার যে রকম ছিল সেই রকম হইবে। জলের আয়তন এত কম ছোট হয় যে মনে কর হাজারে এক আধ পরিমাণ। ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে জলের অণু বুঝি গোল—গোল অণুরাশির ভিতরে ফাঁকও বেশী আবার চাপাও যায় না। জলেতে ফাঁক যে আছে তাহা শুধু চোখে যদিও দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা যায়। যদি একটা পাত্রে ছাপাছাপি জল রাখিয়া তাহাতে আস্তে আস্তে বিন্দু বিন্দু চিনি দিতে থাকি, তাহা হইলে জল ছাপাইয়া পড়িবে না। চিনি দিতে দিতে গোল অণুরাশির ফাঁকের ভিতরে চিনিগুলা গিয়া যখন সমুদয় ফাঁককে পূরিয়া ফেলিবে তখন আর চিনি খাইবে না। আবার এই চিনিপূর্ণ জলের গুরুতাও বেশী দেখা যায়। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে জলের অণুগুলি গোল।

রাসায়নিক আকর্ষণের বিষয় বলা গিয়াছে। রাসায়নিক ক্রিয়ার বাধা দূরতা ও কঠিনতা। যদি পরমাণুর দূরতা থাকে তাহা হইলে রাসায়নিক আকর্ষণ বল পায় না, দূরতা না থাকিলে রাসায়নিক কার্য্য শীঘ্র হইতে পারে। কঠিন সমষ্টির মধ্যেও রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে পারে না, কেন না, রেণুসকল পরস্পরের মধ্যে যোগাকর্ষণ ভেদ করিয়া মিলিতে পারে না। ইহার জন্য কঠিন পদার্থকে তরল করিবার প্রণালী আছে। কখন কখন তরল করিবার প্রয়োজন হয় না, যে দুই পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া করাইতে হইবে, সেই দুই পদার্থতে খুব গুঁড়া করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কখন কখন তরল পদার্থও মিলিত হয় না, তখন তাহাদিগকে বায়বীয় অবস্থাতে পরিণত করিতে হয়। আবার বায়বীয় অবস্থায় সকল সময়ে রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে পারে না; যেহেতু বায়বীয় অবস্থাতে যোগাকর্ষণ যেমন থাকে না, তেমনি বিকর্ষণ অত্যধিক থাকে, রেণুসকল পরস্পর হইতে দূরেই থাকিতে চাহে; সে সময়ে এমন উপায় করিতে হয় যাহাতে যোগাকর্ষণ প্রবল হইতে পারে। রাসায়নিক ক্রিয়ার পোষক হইতেছে তাপ ও তাড়িৎ। ইহাদের সংযোগে রাসায়নিক ক্রিয়া শীঘ্র সম্পাদিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দহক ও অজনকের

মধ্যে এক স্ফুলিঙ্গ বিদ্যুৎ চালাইয়া দিলেই উভয়ে মিলিত হইয়া জল হইয়া যায়। তাড়িৎ প্রযোগ না করিলেও স্বাভাবিক তাপ তাড়িতের গুণে অনেক দিনে জলও হইতে পারে অথবা অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে মিলিয়া অন্য পদার্থও হইতে পারে। পারা ও গন্ধক একত্র খুব ঘুঁটিলে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং উভয়ে মিলিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক রাসায়নিক ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতে গেলে অর্থাৎ হিঙ্গুল প্রস্তুত করিতে গেলে তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে।

তাপতাড়িৎ রাসায়নিক ক্রিয়ার যেমন বিশেষ পোষক, তেমনি আবার হানিজনক। যথা—পারাতে যদি তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া একরূপ সিন্দূর প্রস্তুত হয়; কিন্তু আবার যত তাপের দ্বারা ঐ সিন্দূর উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা যদি অনেক অধিক তাপ তাহাতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে আবার দহক (অক্সিজেন) ভিন্ন ও পারা ভিন্ন হইয়া পড়ে। এই একটী পদার্থ খড়ি—ইহা অঙ্গারদ্রাবক (কার্বনিক-অ্যাসিড) ও চূণ মিলিত হইয়া হইয়াছে; ইহাতে যদি অন্য কোন পদার্থের যোগ না দিয়া কেবল তাপ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলেই ইহার চূণ পৃথক হইয়া পড়িবে, কারবনিক অ্যাসিড পৃথক্ হইয়া পড়িবে। আবার চূণ গুলিয়া যদি তাহাতে তাড়িৎ প্রয়োগ করা যায়, চূণের মূলধাতু খটিক (ক্যালসিয়ম) পৃথক হইবে আর দহক (অক্সিজেন) পৃথক হইবে—এমন পদার্থ নাই, যাহাকে তাড়িৎ বিযুক্ত না করে। তাড়িৎ প্রয়োগ করিলে অজ্জনক (হাইড্রোজেন) ও দহক (অক্সিজেন) দুই মরুৎ মিলিত হইয়া জল হইবে, আবার সেই জলে তাড়িৎ প্রয়োগ করিলে অজ্জনক একদিকে যাইবে আর দহক আর একদিকে যাইবে। তাপ তাড়িতের ন্যূনাধিক পরিমাণানুসারে যোগ বিয়োগ ঘটে। উহারা বহুরূপী, সকল বস্তুর ভিতরে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেই, আমরা লক্ষ্য করিতে পারি বা নাই পারি।

তাড়িৎকে ভালরূপে বুঝিতে পারিলেই জগতের একটা গভীর ভাব বুঝিতে পারিব। অন্নপরিপাক, শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি শারীরিক কার্য্যসকল যে হইতেছে যেন নিজে নিজে হইতেছে, কিন্তু ইহাতে তাপতাড়িতের যে কত খেলা আছে, তাহা বলা যায় না। এই এক যুবা বলবান পুরুষ খেলা করিয়া



বেড়াইতেছে, যদি তাহার শরীরের তাপতাড়িতের একটু বিশৃঙ্খলতা ঘটে অমনি সে মুহূর্ত্তের মধ্যে হতচেতন হইবে। আত্মা পৃথক্, শারীরিক জীবন পৃথক্; আত্মার কেহ কিছু করিতে পারে না। সেদিন জর্ম্মানি দেশে এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। একজন বিজ্ঞানবিদ্ ফ্রান্সের বর্ত্তমান শাসিতা টিয়ারের নিকট হইতে দুইজন প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তিকে লইয়া রক্তনির্গম দ্বারা তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল। তিন মাস পরে যখন সেই দুইটী মৃতদেহ পচিতে আরম্ভ হইল, তখন তাহাতে মেষের রক্ত প্রবাহ করিয়া নিরন্তর তাড়িৎ প্রয়োগ করিতে করিতে একজন জীবিত হইল, দ্বিতীয় জন জীবিত হইল না। জীবিত না হইবার কারণ এই নির্দ্দিষ্ট হয় যে যখন রক্তনির্গম দ্বারা মারিয়া ফেলা হয়, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি পীড়িত ছিল। এই ঘটনার তথ্যাতথ্য কিছুই জানি না, ইহা বাস্তবিক না হইলেও না হইতে পারে, হইলেও যে কিছু অলৌকিক ব্যাপার তাহাও নহে—সংবাদপত্রে যখন ঘটনাটী প্রকাশ হইয়াছে, তখন তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া গেল। তাড়িৎ বিদ্যা সম্যক্ আয়ত্ত হইলে আপনাকে হয়তো আপনার বশে আনিতে পারি। এখন একথা যাউক।

রাসায়ন আকর্ষণের সঙ্গে যোগাকর্ষণের খুব নিকট সম্বন্ধ। রাসায়ন আকর্ষণ নিকটস্থ পরমাণুতে বা রেণুতে হয়, যোগাকর্ষণ নিকটস্থ অণুতে হয়। যোগাকর্ষণে গুণ পরিবর্ত্তন হয় না, কেবলমাত্র গোটা বাঁধে। যোগাকর্ষণ-বলেরও আবার পদার্থবিশেষে ন্যূনাতিরেক আছে। যোগাকর্ষণ দ্বারা স্বজাতীয় পদার্থের মিলন ভাল হয়, বিজাতীয় পদার্থের ভাল হয় না। এই দস্তার চোঙা সজাতীয় অণুর যোগে প্রস্তুত, ইহার সহিত অন্য কোন পদার্থ মিশ্রিত করিতে গেলে হয়তো মিশিবেই না, নয়তো ভাল মিশিবে না। রাসায়নিক আকর্ষণ ঠিক ইহার বিপরীত। রাসায়নিক আকর্ষণের প্রবলতা বিজাতীয় অণুর সঙ্গেই বেশী, সজাতীয়ের সঙ্গে কম। যোগাকর্ষণের তারতম্যানুসারে বস্তু সকল কঠিন, তরল ও বায়বীর অবস্থা ধারণ করে। যোগাকর্ষণের তারতম্য ঘটাইয়া একই বস্তুকে তিন আকারে পরিণত করা যায়। যখন যোগ গাঢ় হয় তখন কঠিন অবস্থা, যদি যোগ শিথিল হয়, অণুগুলিন নিকটে নিকটে মাত্র থাকে তখন তরল হয়, এবং যখন যোগাকর্ষণ হ্রাস হইয়া বিকর্ষণের আধিক্য হয়, রেণুসকল পৃথক্ পৃথক্ হইতে চায়, তখন পদার্থ বায়ুতে পরিণত হয়;

যোগাকর্ষণের আধিক্যে কঠিন, মধ্যমাবস্থায় তরল এবং ক্ষীণাবস্থায় মরুৎ। যোগাকর্ষণ দ্বারা পদার্থকে ওদিকে কঠিন অবস্থা অপেক্ষা বেশী করা যায় না, এদিকে মরুদবস্থা অপেক্ষা কম করা যায় না—এই দুইটী সীমা, এই দুই সীমার মধ্যে পদার্থ সকল নানা অবস্থা ধারণ করে, যেমন আঠা, কাদা, বাষ্প ইত্যাদি।

রাসায়নিক আকর্ষণের ন্যায় যোগাকর্ষণেরও পরিমাণ স্থির করা যায়। এই খড়ির পাশে একটু টিপিলাম আর এই পার্শ্বটা ভাঙ্গিয়া গেল। এই খণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করিতে যে বল প্রয়োগ করিতে হইল, সেই বল ইহার যোগাকর্ষণের পরিমাপক। যতটুকু আকর্ষণে ইহারা আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা একটু বেশী বল দেওয়াতেই ইহারা বিচ্ছিন্ন হইল। ধরিয়া লইলাম যেন এক ছটাক বলপ্রয়োগে ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তবেই হইতেছে যে এক ছটাক বলে এদিককার অণু ওদিককার অণুর সঙ্গে মিলিয়া রাহিয়াছে। এই খানটা ক্ষুরধারের যোগাযোগ, অল্পস্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাকে বিভাগ করিতে কম জোর লাগিল; ইহার মধ্যখানটা বিভাগ করিতে গেলে অধিক অণু পৃথক্ করিতে হইবে, এখানে হয়তো একসের জোর লাগিবে। এক সের বল কাহাকে বলে? এই একটী নিকতি আছে, মাঝে একটী ঠেক্না আছে, আর দুই পাশ দিয়া বাটি ঝুলিতেছে। ইহার একদিকে কমবেশী ভার দিলেই উপরের কাঠিটা উঁচু নীচু হইবে, সমান ভার পড়িলে কাঠি সমান থাকিবে। ইহার একদিকে একসের ভার চাপাইয়া দাও—দিতেই কাঠি

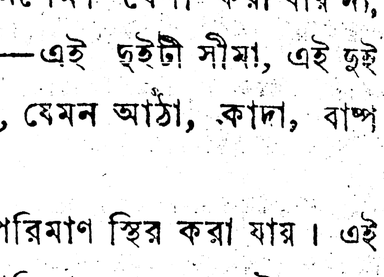

ঝুঁকিয়া গেল। কাঠিটাকে সমান করিতে গেলে আর একদিকে হাতের বল প্রয়োগ করিতে হইবে। কতটা পরিমাণকে একসের বল বলিব—যতটাতে এই কাঠি ফের সমান হইবে। বলের পরিমাণ করিতে গেলেই সেরের বল মোনের বল বলিতে হইবে—সেই বল দ্বারা যোগাকর্ষণের বলকে বিচ্ছিন্ন করিতে গেলেই যোগাকর্ষণের বল জানা যাইবে, যোগাকর্ষণের বলের পরিমাণ সেই পদার্থকে বিচ্ছিন্ন করিবার বলের সঙ্গে সমান।

বস্তুর ভঙ্গপ্রবণতা, স্খলনপ্রবণতা, এই সকল গুণ যোগাকর্ষণেরই অন্তর্গত।



কোন বস্তুকে উঁচু করিয়া ধরিলে খসিয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, তাহাকে স্খলনপ্রবণ বলে; আর যাহা হাত হইতে পড়িলেই ভাঙ্গিয়া গেল তাহাকে ভঙ্গপ্রবণ বলে। যাহা স্খলনপ্রবণ, তাহার অণুর বাঁধন এত কম যে তাহাকে একদিকে ধরিয়া উঠাইলেই তাহার অপর দিক্ আপনার ভারে ভাঙ্গিয়া যায়। আর ভঙ্গপ্রবণতার দৃষ্টান্ত এই কাচের নলটা—হাত থেকে ছাড়িয়া দিলাম, আর দেখ টেবিলে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল; কেন ভাঙ্গিয়া গেল—ব্যাপারটা কি হইল? নলের মধ্যখানের ওজন টেবিলে ঠেকিয়া গেল, কাজেই ইহা নীচে যাইতে পারিল না, বরং ঠেকিয়া গিয়া উপরে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নলের বেগটা মধ্যস্থলে আঘাত পাইল সুতরাং নীচে যাইতে পারিল না, অথচ তাহার দুই পার্শ্ব নীচে যাইতে চায়, কাজেই মধ্যস্থল ভাঙ্গিয়া গেল, দুই পার্শ্বের গুরুত্বসমষ্টি দ্বারা মধ্যস্থলটা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল—ইহাই হইল উহার ভঙ্গ-প্রবণতা। কাঠ হয়তো কাঁচের মত ভাঙ্গিবে না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে কাঠ অপেক্ষা কাচ তো বাস্তবিক কঠিন, অথচ কাচ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে কাঠ ভাঙ্গিতেছে না কেন? তাহার কারণ আছে—প্রাচীর যখন গাঁথে তখন ভাল রাজমিস্ত্রী ইটের গাঁথন দেয়, যেমন এই একটা ইট, তাহার উপরে উপরে সমস্ত ইট গাঁথিয়া যাইবে না, কিন্তু ইহার মধ্যে ও ইট দিবে, উহার মধ্যে এ ইট দিবে, এইরূপ ইটের মুখ বাহির করিয়া ইট গাঁথিয়া, যাইবে, তবে গাঁথুনি মজবুত হইবে;

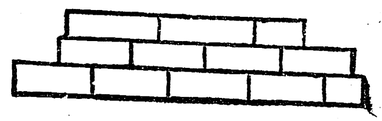

তেমনি কাঠের সব সুতা আছে, সেই সকল বোনাট বাঁধিয়া কাঠ হয়, সুতরাং কাঠের যোগাকর্ষণের সঙ্গে আবার বাঁধন আছে। কাচের যোগাকর্ষণে বাঁধন নাই, ইহার অণুশ্রেণী কেবল পাশাপাশি যোগাকর্ষণে দাঁড়াইয়া আছে, সুতরাং একটু আঘাতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

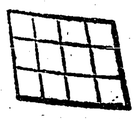

যোগাকর্ষণেও তাপ প্রতিকূল, শীতলতা অনুকূল। শীত-লতায় সংকুচিত হইয়া যোগাকর্ষণ বাড়ে, তাপে বিস্তৃত হইয়া যোগাকর্ষণ কমে। আবার সন্নিকর্ষণ দ্বারা যোগাকর্ষণ বাড়ে, দূরে যোগাকর্ষণ কম হয়। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে দূরতা প্রতিকূল, সন্নিকর্ষতা অনুকূল। এই খড়িটা ভূমিতে পড়িয়া গেল—কেন পড়িয়া গেল? আমি তো বলপূর্ব্বক

তাহা ফেলিয়া দিই নাই; আমি ছাড়িয়া দিলাম, আর উহা পড়িয়া গেল। যতক্ষণ উহা হাতে ছিল, ততক্ষণ বরং উহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। যখনি সেই জোরটা করিলাম না, তখনি তাহা হাত থেকে স্খলিত হইয়া মেঝের (ভূমির) সঙ্গে মিলিয়া গেল। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে—হয় মেঝে ইহাকে আকর্ষণ করিতেছে, নয় ইহা মেঝেকে আকর্ষণ করিতেছে, নয় উভয় উভয়কে আকর্ষণ করিতেছে। উভয়ের পরস্পরের আকর্ষণই সম্ভব, কারণ উহারা জড় পদার্থ, উহাদের দ্বিধা ইচ্ছা হয় না। উহাদের উভয়েরই মধ্যে সমান নিয়ম—যদি আকর্ষণ করে তবে পরস্পরেই আকর্ষণ করিবে, যদি বিকর্ষণ করে তবে পরস্পরেই বিকর্ষণ করিবে। আবার, যখন এই পৃথিবী অন্য কোন দূরস্থ পৃথিবীকে আকর্ষণ করে তখন আমার হাতে যে সকল জিনিষ রহিয়াছে তাহাদের সমষ্টির আকর্ষণ দূরস্থ পৃথিবীকেও আকর্ষণ করে। হাল্‌কা ভারী সকল বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করে। তবে ভারী জিনিষ হাল্‌কা জিনিষের কাছে আসা অপেক্ষা হাল্‌কা জিনিষেরই ভারী জিনিষের নিকট যাওয়া সোজা। কত খানি সোজা—যত খানি ইহা অপেক্ষা উহা ভারী। পৃথিবী যদি ভারী হয় ১০, হাতের এই পদার্থটা যদি ভারী হয় ১, তাহা হইলে ইহার পৃথিবীর নিকটে যাওয়া দশগুণ সোজা এবং পৃথিবীর ইহার নিকটে আসা একের দশভাগ মাত্র সোজা। আর বাস্তবিকও সেইরূপ পরিমাণানুসারে পৃথিবী মিলিতে আসে—সেই আকর্ষণ এত কম যে তাহা প্রত্যক্ষগোচর হয় না। মাধ্যাকর্ষণের প্রবল দৃষ্টান্ত এই যে, পৃথিবীসমেত গ্রহনক্ষত্র সূর্য্যচন্দ্র পরস্পরাকৃষ্ট হইয়া যদিও ক্রমাগতই এক অকাশ হইতে আর এক আকাশে চলিয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু পরস্পর সম্বন্ধে যথাস্থানে স্থিতি করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ আছে, এইজন্য কোন বস্তুই স্থির থাকিতে পারিতেছে না, সকলই চলিয়া বেড়াইতেছে। ইহার যদি মূল কারণ দেখিতে চাই, ঈশ্বরের ইচ্ছাই ইহার কারণ দেখি। কোন বস্তু যে কোন বস্তুকে টানিতেছে এই যে নিয়মটী, ঈশ্বরের ইচ্ছার ভিতরেই এই নিয়ম স্থিতি করিতেছে। ইহা যদি একটী নিয়ম থাকে যে মানুষের ক্ষুধা হইলে সে অন্ন খাইবে



কিন্তু মাটী প্রভৃতি অখাদ্য খাইবে না, মানুষ ইচ্ছাবান্, তাহার ইচ্ছার ভিতরেই ঐ নিয়ম অবস্থিত রহিয়াছে; মানুষ জানিয়া শুনিয়া আপনার নিয়ম আপনি করিতেছে যথা অন্ন খাইতেছে আর অখাদ্য খাইতেছে না। এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয় বলা যাইতেছে না, যদিও তাঁহার ইচ্ছার ভিতরে আবার আমাদের ইচ্ছার নিয়মও অবস্থিতি করিতেছে। জ্ঞানপদার্থের ইচ্ছার উপরেই নিয়ম নির্ভর করে, কিন্তু জড়ের তো ইচ্ছা নাই সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাহাদের নিয়মের কারণ। জড়ের কোন এক অংশেরও যে ক্ষমতা, সমস্তটারও সেই ক্ষমতা। ঈশ্বরের বর্ত্তমান ইচ্ছা প্রবলভাবে প্রতি পরমাণুতে রহিয়াছে, ইহা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। পরমাণুর যে নিয়ম সে তাঁহার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর একবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, আর ইহা হইতেছে বা হইতে পারিতেছে না। যেমন লিখিবার সময় হাতের উপর আমাদের ইচ্ছা প্রতিক্ষণ রহিয়াছে এবং তাহাই কলমকে চালাইতেছে, তেমনি ঈশ্বর যে কোন অলক্ষিত কালে নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন তাই এই জগৎ চলিতেছে তাহা নহে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তিনি ইচ্ছা প্রয়োগ করাতে ইচ্ছার কার্য্যকারিতা প্রকাশ পাইতেছে। কোন নিয়ম হইতে সেই ইচ্ছার লোপ হইলে, তাঁহার ইচ্ছা কোন এক নিয়মকে ছাড়িয়া দিলে সে নিয়ম থাকিতে পারিবে না। যদি শুদ্ধ মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছা লোপ হয়, যেখানে যাহা কিছু আছে অমনি ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, জগৎ যন্ত্র চিত্রপটে আলেখ্যমাত্র হইয়া থাকিবে।

৺হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

# গীতিকুঞ্জ।

## তবুরে একাকী।

সিন্ধুকাফি—জৎ।

কত সুখে থাকি
তবুও একাকী
কেমন কেমন ঠেকে যে আমার,
কত হাসি খেলা,
তবু রে একেলা
কেমন কেমন ঠেকে যে আমার,
কেন প্রাণে হেন জাগে হাহাকার?
গাহিয়া গাহিয়া
আকাশে চাহিয়া
দেখি উড়ে যায় কত শত পাখী
বনে উপবনে,
ভাসিয়া পবনে;—
পাখীদের মত প্রাণটীরে রাখি,
তবু চারিধার হেরি ম্লানআঁখি।
ফুটে কত ফুল
সুবাসে আকুল
হয় মন প্রাণ, গেয়ে উঠি গান
তবু যে কেমন
করে এই মন,



মনের যেন গো দিবা অবসান
প্রাণে ধ্বনিত রে একা একা তান।

---

## তোমায় জেনেছি।

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

তোমায় জেনেছি তাই
আনন্দের সীমা নাই,
গাহিছি আনন্দে মাতি
তোমাতরে দিবা রাতি।

তোমারি কহিয়া কথা
ঘুচে যায় দুঃখ ব্যথা,
পূজার আসন পাতি
তোমাতরে দিবা রাতি।

তোমারেই চাহি আমি;
তুমি জগতের স্বামী—
কর মোরে চিরসাথী
তোমাতরে দিবারাতি।

---

## আমার নয়ন পরে তোমার, নয়ন।

সাহানা—জৎ।

আমার নয়ন পরে তোমার সয়ন
তুমি মোরে করিয়াছ হেথা আনয়ন!

তব সুধাময়ী দৃষ্টি
প্রাণে সুধা করে বৃষ্টি ;
কেহ নহে ভবে মোর তুমি গো যেমন
তোমার তরেই সদা জাগে প্রাণ মন।

---

## পাপীর প্রতি দয়া।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

প্রীতি করি বা না করি,
তবু দয়া কর হরি ;
পাপীরে না পরিহরি,
কত দয়া কর হরি।
ল'য়ে তব পুণ্য নামে
পাপী যায় তব ধামে।

---

## করুণাময়।

খাম্বাজ—ঠুংরি।

হে করুণাময় আর পারি না পারি না,
অতি দুরবল আমি তব বল বিনা।
আমারে শকতি দাও
মোর মুখ পানে চাও
তোমার প্রসাদ সুর প্রাণে বাজে বীণা।

---



## তব পদসেবা।

গৌরী—জলদতেতালা।

করিলে তোমার পদানুসরণ
ভয় দেখাইতে পারে না মরণ,
তুমি রক্ষা কর ভকতে তোমার
তুমিই আমার তুমিই আমার।
বিপদনাশিনী তব পদসেবা
তোমার সমান বন্ধু আছে কেবা।

---

## প্রেম।

বাহার—কাওয়ালি।

আমি করি প্রাণ ভ'রে প্রেমের সম্মান,
প্রেমপুষ্প কি আনন্দে তুলি
প্রেমছবি আঁখি দিয়া তুলি
হৃদয় ভরিয়া আমি গাহি প্রেম গান
প্রেমের দেখিতে নারি মৃত্যু অবসান ;
আমি করি প্রাণ ভ'রে প্রেমের সম্মান।
বিশ্বে প্রেম এমনি রে মধুর জিনিষ
তারে বলিবারে পার সুধা,
তারে চায় স্বর্গ এ বসুধা
মর্ম্ম হ'তে পরিহার ক'রে দেয় বিষ,—
তাহা সত্য সনাতন আনন্দ আশীষ।
আমি করি প্রাণ ভ'রে প্রেমের সম্মান ;—
তুচ্ছি তারে কেহ বিষ বলে,
বলে, প্রেমানলে গেছি জ্বলে,

তাহারা প্রকৃত প্রেম করে নাই পান,
তাহ'লে বলিত প্রেম সুধার সমান।
আমি করি প্রাণ ভ'রে প্রেমের সম্মান,
প্রেমপুষ্প কি আনন্দে তুলি,
প্রেমছবি আঁকি দিয়ে তুলি,
হৃদয়ের সঙ্গে আমি গাহি প্রেমগান
প্রেমের দেখিতে নারি মৃত্যু অবসান।

---

## রাগ।

বাহার—কাওয়ালি।

বুঝি চেয়ে মম পানে—
পাও মনে দুখ—
কেন মোর পরে তুমি করিয়াছ রাগ?
ব'সে আছ অভিমানে
ফিরাইয়া মুখ,
পুষ্পরেণু সম তুমি ফুলের পরাগ;
মেতে আছি তব গানে,
তবু নাই সুখ—
বৃথা তুমি মোর পরে করিয়াছ রাগ;
কেন দুখ দাও প্রাণে,
কেন গো বিমুখ—
তুমি গো রাগিণী মম আমি তব রাগ।

---



## কি কথা।

বেহাগ—পোস্তা।

কি—কথা—কি কথা
এত যে আবেগ;—
নিদাঘের মাঝে যেন
জলভরা মেঘ;
কি-কথা কি-কথা—
এত যে আবেগ;—
কথা বুঝি রূপ নিয়ে,
রূপ সে কেমন;—
রূপ ওঠে উছলিয়ে,
মোহিত এ মন,
রূপ সেই গাঁথা হিয়ে
দেখিনি এমন।

---

## দূরে ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে—

মুলতান—কাওয়ালি।

ওই দূরে বেজে যায় ঘণ্টা
শুনিয়া উদাস হয় মন্‌টা,—
মনে হয় কাল যায় ব'য়ে,
সঙ্গে কত লোকে যায় ল'য়ে;
ইহলোক মোদের প্রবাস,
হেথা কিছু কাল তরে বাস
কোথা যেতে হবে চ'লে ফের
সময় আসিলে আমাদের।

---

## এখনো ভুলিনি।

মুলতান—জলদ তেতালা।

কেহ নাই বড় কাছাকাছি
নদী বহে ধীরে,
সন্ধ্যা হ'ল একা ব'সে আছি
তটিনীর তীরে;
কাছে গাছে কার মালাগাছি
দুলিছে সমীরে।
আসিতেছে পরিমল তার
যেন প্রেমমাখা,
ছায়া ক'রে চৌদিক আমার
শত তরু শাখা;
ডালে পাখী নাচে বারবার
তুলে প্রেম পাখা।
একা বসি হেথায় নীরবে
দেখি ফুল মালা,—
স্মৃতি জাগে দেখিয়াছি কবে
সেই বন বালা—
এখনো ভুলিনি সুধা রবে—
সেই-ফুলডালা
সেই ফুলমালা—
হাসি সুধা ঢালা।

---



## কার মনে কি যে আছে।

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

কার মনে কি যে আছে
কে যে দূরে কে যে কাছে
বুঝেও বুঝিনি ভাল;
কেহ হাসে কেহ কাঁদে
ভ্রমে ভবে মায়া ফাঁদে,
কে যে আল কে যে কাল
বুঝেও বুঝিনি ভাল।

---

## ছদ্মবেশ।

ধনাশ্রী—কাওয়ালি।

শুনিতে চাই না আর শুনিতে চাই না
বৃথা ধর্ম্মের ভণিতা;
মুখে শুধু ধর্ম্ম বলে, চলে ধর্ম্মবিনা
আবাল বৃদ্ধ বনিতা।
ভাণ শুধু ভাণ আর লাগেনাকো ভালো
কষ্ট হয় ভাবিলে যে,
মিথ্যা হ'য়ে যায় হৃদি অন্ধকার কালো
ধর্ম্ম-ছদ্মবেশ সেজে।

---

## তবতরে।

ঝিঝিঁট—ঝাঁপতাল।

এ দেহ এ মন এ অন্তর
তবতরে জাগে নিরন্তর
তোমা হ'তে পেয়েছি সকলি
পান করে মন প্রাণ অলি —
ও চরণকমল অমিয়া,
চারিধারে বেড়ায় ভ্রমিয়া।
এ দেহ এ মন এ অন্তর
তবতরে জাগে নিরন্তর।

---

## দূর নিকট।

বাহার—ঠুংরি।

তুমি কত দূরে আছ
তবু যেন আছ কাছে,
সমীরিত প্রেম তব
কি অমৃত তাহে আছে;
তব প্রেম এক বিন্দু
সুধাসিক্ত করে প্রাণ,
শূন্যে যেন পূর্ণ-ইন্দু
হৃদিমাঝে শোভমান।

---



## মুখচন্দ্র।

ইমনকল্যাণ—জৎ।

উঠিছে পূরবে
চন্দ্রমা নীরবে,
শোভিত সে এইরূপ;
মনে পড়ে তার
মুখটী আমার,—
জোছনার মত রূপ।
যেন প্রাণ তার,
করিছে বিহার,
স্তব্ধ অন্তরীক্ষ মাঝে,—
শোভে শশী সম,—
এ অন্তরে মম
তারি প্রেমছবি রাজে।

---

## বৃন্দাবনে।

সাহানা—পটতাল।

সহসা কেন এ প্রফুল্লতা
কেন এ আনন্দ?
দোলে গাছপালা পুষ্পলতা
সমীর সুমন্দ;
বহিছে উচ্ছ্বাস আজি কিবা
সকলের মনে,
কি সঙ্গীত বাজে নিশি দিবা
আজি বৃন্দাবনে।

সমীরণ আজি লাগে ভাল
মন মধুময়,
অন্ধকারে যেন নব আলো
হইছে উদয় ;—
আজি ফুল্ল সমুদয়।

---

## যতক্ষণ দেহ।

জয়জয়ন্তি—জৎ।

যতক্ষণ আছে দেহ
ততক্ষণ আছে সব
আর থাকিবে না কেহ
যেই দেহ হবে শব।
যাইবে যে যার ঘরে
ল'য়ে নিজ নিজ কাজ,
কে ভাবে কাহার তরে
কার তরে কার লাজ ?
আপন দায়িত্ব ল'য়ে
আপনি চলিয়া যায়,
তাহে কার যায় ব'য়ে—
চলে যায় কে কোথায়।

---



## হাসি ও অশ্রু।

ছায়ানট—কাওয়ালি।

তুমি ঘন ঘন হাস
আমি হাসি না,
হাসি বড় ভালবাস
আমি বাসি না।
অশ্রু মোর হৃদে জাগে
কিবা সুন্দর,—
সিক্ত করে অনুরাগে
হৃদি কন্দর।
হাসি ঠেকে ফাঁকা ফাঁকা
মোর কেমন ;
সুধাময় অশ্রুমাখা
মোর এ মন ;
তুমি চাও,—হাসি নিয়ে
থাকি বসিয়া,
আর তুমি হাসি দিয়ে
যাও হাসিয়া।—

---

## আলেয়ার আলো।

বাহার—মধ্যমান।

আমি যেন পাগলের প্রায়
ছুটাছুটি ক'রে মরি হায়,
ভালবাসে কি সে নাহি বাসে
ভেবে ভেবে ফিরি তারি আশে,

বৃথা ফেরা বৃথা ভালবাসা
সংসারের সব ভাসাভাসা,
এ সংশয় লাগেনাকো ভালো,
হিত কহে আলেয়ার আলো।

---

## করিব না কারো হানি।

কেদারা—মধ্যমান।

করিব না কারো হানি
প্রাণ যত দিন রবে,
কেহ দুঃখ নাহি পায়, এই সদা প্রাণ চায়,
কি আনন্দ সুখবাণী
বিশ্বে বাজে গো নীরবে।
গিরি নদী এ আকাশ
কহে হানি করিও না,
ধ্বনি সেই স্বাভাবিক শুনি হ'তে চারিদিক,
বিশ্বে ধ্বনি এ প্রকাশ—
খাঁটিকাণে যায় শোনা।

---

# মনুষ্যশরীরের কৌশল। *

"আনন্দাদ্ধ্যেবখল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"
"আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে জীব সকল উৎপন্ন হয়"

আমাদিগের শরীর ও মনে যে প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ আছে, তাহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা প্রত্যহই দেখি যে, যখন কোন বাহ্যবস্তুর প্রতিরূপ আমাদিগের চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন আমাদিগের মনও ঐ বস্তুর ব্যাস পরিধি ও গভীরতা এবং আকৃতি ও বর্ণ জানিতে সমর্থ হয়, আমরা দেখি যে যখন এক প্রকার স্পন্দিত বায়ু আমাদিগের কর্ণে প্রবেশ করে, তখন মনেও শব্দজ্ঞান হয়; অতএব এই প্রকার আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তু সকল সহস্র সহস্র প্রকারে যে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা আমরা জ্ঞাত হই। ইহা কোন্ তুচ্ছ বিষয়! এমন কি আমরা অন্যের মনের ভাব পর্য্যন্তও সময়ে সময়ে বলিতে পারি। আমরা দেখি যে, যখন মনের ইচ্ছা হয় যে এই শরীর এস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিবে কিম্বা অন্য কোন কর্ম্ম সমাধা করিবে তৎক্ষণাৎ উহা আজ্ঞাবহ হইয়া তদনুযায়িক করিয়া থাকে, আমাদিগের হস্ত পদ ও অন্যান্য অঙ্গ সকলও নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু যে কি নিয়মে এই সকল ঘটনা হয় তাহা আমাদিগের জ্ঞানাতীত; ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর আর কিছুই নাই। আবার যদি কেবল আমাদিগের শরীরের বিষয় বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলেও পরমেশ্বরের যে ইহাতে আশ্চর্য্য কৌশল আছে, তাহার আর কিছু মাত্রই সন্দেহ থাকে না; ইহাতে অতিরিক্তও কিছু নাই ও অসম্পূর্ণও কিছু নাই। কর্ম্মের নিমিত্তই কি, আর শোভার নিমিত্তই বা কি প্রত্যেক প্রত্যেক অঙ্গই যথোপযুক্ত স্থানে সংলগ্ন আছে। আমাদিগের শরীর যে কেবল এক কর্ম্মের নিমিত্ত রহিয়াছে, তাহাও নহে, কিন্তু ইহা নানা

---

* ১লা বৈশাখ ১৭৮১ শকে লিখিত। এক্ষণে ১৮২৪ শক বাঙ্গলা ১৩০৯ সাল চলিতেছে। তাহা হইলেই জানা গেল যে ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে ইহা রচিত।

প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যেকেতেই পরমেশ্বরের অলৌকিক ও আশ্চর্য্য ক্ষমতা জ্ঞান ও করুণার স্পষ্টরূপে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত সামান্যরূপে বলাও অল্প ব্যাপার নহে। অতএব ও বিষয় এস্থলে কিছুই উল্লেখ করা গেল না।

আমাদের শরীর ও মনের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে আমাদের চলৎশক্তি আবশ্যক করে তাহা নিশ্চয়ই বলিতে হইবেক। কিন্তু এই একের সিদ্ধির নিমিত্ত কতপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ একত্রিত হইয়াছে, কত অস্থি শিরামাংস পেশী সকল তাহারই জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য যন্ত্র নিত্য চালনাদ্বারা শীঘ্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সেই নিমিত্তে আমাদিগের অশেষ প্রকার অঙ্গ প্রস্তুত আছে ;—কেহ আমাদিগের গলায় আহারীয় দ্রব্য সকল ধারণ করিতেছে, কেহ উহাকে চূর্ণ করিতেছে, কেহ উহাকে জীর্ণ করিতেছে, কেহ বা আবার ঐ পুষ্টিকর সত্বকে দেহের মধ্যে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করিতেছে এবং শরীরের চালনাদ্বারা যে কোন অংশের যাহা কিছু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা ঐ সত্ব দ্বারা পরিপূর্ণ করিতেছে।

এই সকল অঙ্গ প্রত্যেকেই এমত প্রকার উপযুক্ত স্থানে আছে, যে, যেযে কর্ম্মের নিমিত্ত পরমেশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সকল করিতে ইহারা বিলক্ষণরূপে সক্ষম, অতএব এমত প্রকার কৌশল যখন আমরা প্রতি অঙ্গেতেই দর্শন করিতেছি, তখন কি আমরা বলিতে পারি, যে, এমত আশ্চর্য্য কৌশল আপনা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে ? যেমন কোন কোন বিদ্বানেরা কহিয়া থাকেন। আমরা যখন একটা ঘড়ি বা একটা অট্টালিকা কিম্বা একটা বাষ্পীয় জাহাজ দেখিলে মনে করি, যে ইহা কখন আপনা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তখন আমরা কি সাহসে ইহা বলিব, যে, মনুষ্যরূপ মহাযন্ত্র আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।—অতএব এই প্রকার তিনি সকল ভূতেরই সৃষ্টিকর্ত্তা।

৺হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

---

# সংস্কৃত ও প্রাকৃত। *

আর্য্য হিন্দুরা অতি আদিম কালে যে চলিত ভাষায় কথাবার্ত্তা করিতেন, তাহাই বৈদিক ভাষা। তাঁহাদের সহজ ভাষায় তাঁহারা যে সকল কবিতা প্রস্তুত করিতেন, তাহাকেই ঋক বলিতেন। ঋক কিনা ছন্দ, কবিতা। যতদিন উচ্চভাবের কবিতা বা গাথা প্রস্তুত হয় নাই ততদিন ভাষা স্রোতে চলিয়া যাইতেছিল, কেহ তাহার প্রতি বড় একটা মনোযোগ দেয় নাই, যেই ভাবুক ঋষি প্রস্তুত দেবভাবসম্পন্ন এবং কল্পনাময় কবিত্বরসান্বিত ঋকসকল লোকের হৃদয়াকর্ষণ করিল অমনি সেই ভাষা ও তাহার গঠনপ্রণালীর প্রতি ক্রমশঃ লোকের দৃষ্টি যাইতে লাগিল। ক্রমে যত সেইরূপ ভাষা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমনি তাহার মধ্য হইতে ভাষার একটী নিয়ম প্রকাশ পাইতে লাগিল। আবার যতই সেই সকল নিয়ম ধরা পড়িতে লাগিল, ততই সেই ভাষার একদিক থেকে যেমন উন্নতিও হইতে লাগিল, তেমনি আর একদিক থেকে তাহার অষ্টাঙ্গ নিয়মসূত্রে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের উপায় হইতে বঞ্চিত হইয়া মৃতপ্রায় হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে বাস্তবিকই মৃত হইল। মনুষ্য যেমন মৃত হইয়া, আত্মজ সন্তান সন্ততি দ্বারা জীবিত থাকে, বৈদিক ভাষাও সেইরূপ মৃত ভাষায় পরিণত হইয়া নানা উপভাষারূপ সন্তান সন্ততি দ্বারা জীবিত রহিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে যেমন অস্থি সকল পুষ্ট এবং গ্রন্থি সকল আড়ষ্ট হয়, শরীর চলিতে বলিতে অক্ষম হয়, ভাষা সেইরূপ যখন আসন্ন দশায় উপস্থিত হয়, তখন অতিমাত্রায় ব্যাকরণের নিয়মে বদ্ধ হয় এবং মনের ভাব, যাহা সহজে সতেজে উদয় হয়, তাহা সেই ভাষার দ্বারা তখন বাহিরে তেমন ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। তখন সে আপনার সন্তান সন্ততিগণের উপর কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সহজেই মৃত হয়।

---

* এই প্রবন্ধ রচনার তারিখ জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা "বঙ্গপ্রাকৃত"র সমসাময়িক রচনা।

বৈদিক ভাষা যখন বাহুল্য নিয়মে বদ্ধ হইয়া সংস্কৃত হইতে হইতে ক্রমে সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হইল, সেই সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সর্ব্বদাই সাময়িক শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, তাঁহারাই সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিলেন। ক্রমে পুরাণ বৈদিক ভাষায় রচিত বিষয়সমূহের অর্থবোধ মর্ম্ম এবং প্রবাদ সকল লোকের স্মৃতি হইতে দূর হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সেই সকল জীবিত রাখিবার জন্য আকুল হইলেন,—উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হৃদয়ের সহিত কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাহা কখন অসম্পন্ন থাকে না। সকল অভাব মোচন করিতে সক্ষম এমন সব প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণেরা উদয় হইলেন। সংস্কৃত ভাষা যাহাতে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়, ব্রাহ্মণেরা সেই উদ্দেশে সূত্র রচনা করিয়া, সেই সকল মালা গাঁথিয়া দিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় যে সকল নিয়মাবলী বাহির হইল, তাহার অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া পড়িল, তাহা পণ্ডিতদিগেরই আয়ত্তে আসিল। যাহারা অন্য ব্যবসায়াবলম্বী তাহাদিগের সাধারণ আয়ত্তে আসিতে পারিল না। তাহাদিগের হস্তে সেই একই বৈদিক ভাষা প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হইল। সংস্কৃত ও প্রাকৃত যে প্রথমেই এককালে ভিন্ন হইয়াছিল তাহা নয়; ক্রমে যতদিন যাইতে লাগিল উহা এক পথে যাইতে লাগিল ইহা একপথে যাইতে লাগিল, যে পর্য্যন্ত না ঐ প্রাকৃত ভাষা নিজে আবার বহুদূরব্যাপী এবং প্রণালী ও নিয়মবদ্ধ হইয়া অন্যান্য ভাষার জনক হইয়া দাঁড়াইল।

একই ভাষা আবার পণ্ডিতদিগের নিকট একরূপ হয়, মধ্যমবিৎদিগের নিকট একরূপ হয়, আবার ছোট লোকদিগের নিকট একরূপ হয়। নগরে এক প্রকার থাকে, আবার দূর দূরস্থ পল্লিগ্রামে রূপরূপান্তর প্রাপ্ত হয়। সংস্কৃত ভাষার দুরূহ প্রণালী এবং নিয়ম সকল প্রাকৃত ভাষাতে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারিল না। ইতর লোকের মধ্যে ভাষা যাহাতে সহজ হয়, এইরূপ ভাবে দাঁড়াইল। যেমন সংস্কৃতে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন আছে, প্রাকৃতে একবচন বহুবচন মাত্র রহিল, সংস্কৃতে বিভক্তি আছে, প্রাকৃতে দুটী একটী বিভক্তি রহিল। অপর বিভক্তি সকল কথার যোগে ব্যক্ত হইতে লাগিল। আর সংস্কৃতে যে সকল কঠোর উচ্চার্য্য শব্দ, তাহা অনভ্যস্ত ইতর লোকদিগের মুখে কোমলতায় পরিণত হইল। অর্থাৎ অশিক্ষিত ছোট লোকদিগের



মধ্যে সংস্কৃত ভাষা যেরূপে থাকিতে পারে তাহাই প্রাকৃত ভাষা।

আর্য্যেরা এদেশের জেতা হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এখানে আসিয়া আপনার গৌরবে দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের নিজের ভাষার উপরেও গৌরব অনুভূত হইল। সুতরাং বিজিতদিগের অথবা অন্য কোন জাতির ভাষা এমন কি শব্দ পর্য্যন্ত তাহাতে মিশ্রিত করেন নাই। আপনাদের ভাষার মধ্যে অপর ভাষার কোন শব্দ তাঁহাদের কর্ণে অতি কটু লাগিত। কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় অতটা কড়াকড়ি রহিল না। যে হেতু আর্য্যজাতি যত হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তত নানা জাতির সঙ্গে তাঁহাদের মিশ্রণও হইল। এই সঙ্গে তাহাদের অনেক শব্দ প্রাকৃত ভাষায় প্রবেশ না করিয়া যাইতে পারিল না। কিন্তু তাহাতে কটু শুনিতে লাগিত না কারণ সংস্কৃত যেমন শিক্ষিতদিগের ভাষা, উহাতে যেমন কিছুই অপর সহ্য হয় না, প্রাকৃত সেইরূপ অশিক্ষিতদিগের ভাষা ইহাতে "যা সওয়াইবে তাই সয়।" কিন্তু ঐ প্রাকৃত, কালে যখন আবার একদল শিক্ষিতের ভাষা হইল, উহাতে যখন ধর্ম্মপুস্তক প্রভৃতি পুস্তক সকল রচনা হইতে লাগিল, উহার যখন ব্যাকরণ তৈয়ারী হইয়া গেল তখন আবার উহাতে অন্য সামগ্রী প্রবেশ করান কঠিন হইয়া উঠিল।

সংস্কৃত প্রাকৃতের ভাব আমরা বাঙ্গলা ভাষার উপমায় বেশ টের পাইতেছি। আমাদের বাঙ্গলা ভাষার গঠন এখনো দাঁড়ায় নাই, এখনো স্রোতের মুখে আছে, এখনো ইহার ব্যাকরণ কিছুই তৈয়ারী হয় নাই। মিথিলা দেশের হিন্দি এদেশে আসিয়া বাঙ্গলা আকারে পরিণত হয়। মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিদিগেরদ্বারা প্রথম বাঙ্গলা এক রকম দাঁড় করান হয়। তারপরে ধর্ম্মসংস্কারক চৈতন্যের পরে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বাঙ্গলা ভাষার আদর হয়। তাহার পরে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়, উহার অনেকটাউন্নতি হয়। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাকে বর্ত্তমান ভাবে দাঁড় করান রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ধরিতে হইবে। ধর্ম্মের আলোচনা ভাষাতে আন্দোলিত না হইলে, সে ভাষার মর্য্যাদা হয় না। আর ধর্ম্মের আন্দোলনের সময় যত প্রতিভাসম্পন্ন লোক উদয় হয়, এমন অন্য কোন সময় হয় না। ধর্ম্মদ্বারা নাকি লোকের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত টান পড়ে, সেই জন্য ধর্ম্মের অভাব পূরণ করিবার

জন্য মহা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়, সুতরাং সেই সময়ের উপযোগী মনুষ্যেরা আসিয়াও জন্ম গ্রহণ করে। প্রথমে-যে মহা অভাব সকল মনে হয়, ক্রমে ক্রমে দেখি, যে সে সব অভাব মোচন হইতে চলিয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষা যে রকম দেখিতেছি, ইহার যেরূপ উন্নতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহার লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার অনেকটা প্রভেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার শিক্ষিত নাগরিকদিগের এবং অশিক্ষিত পল্লিগ্রামের লোকদিগের ভাষার আরো প্রভেদ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের কথা আমাদের বুঝিতে অনেক কষ্ট হয়। কোন কোন কথা আমরা বুঝিতে পারিই না। তাহাদের ভাষায় ও সাময়িক পত্রাদির ভাষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। মুসলমান দাঁড়িমাঝিদের যে অল্প সংখ্যক পাঠ্য পুস্তক বটতলায় প্রকাশ আছে, তাহা পড়িলেই ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের কথিত ভাষা আবার উহা অপেক্ষাও কঠিন। আবার এই একই বাঙ্গলা ভাষা আসাম ও উড়িষ্যা অঞ্চলে এতটা বিসদৃশ হইয়া গিয়াছে, যে, এই জন্য বাঙ্গলা ভাষার পরিবর্ত্তে আসামী ও উড়িষ্যা ভাষার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহা মধ্যবাঙ্গলার সহিত আসাম ও উড়িষ্যার, সহৃদয়তার কতকটা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনও যাহা সাদৃশ্য আছে ঐ ঐ ভাষার পুস্তক সকল বাহির হইতে লাগিলে উহারা স্বতন্ত্র ভাষাতে পরিণত হইয়া যাইবে। সাময়িক পত্রাদিতে যেরূপ সচরাচর লিখিত হয় তাহা যদি সংস্কৃত বঙ্গ ভাষার আদর্শ মনে কর তাহা হইলে এখন আমরা যেরূপে কথা কহি তাহা হইবে ভদ্রপ্রাকৃত। নীচপ্রাকৃতও অনেক প্রকার আছে। আমরা যেমন করিয়া কথা বলি, সেই রকম করিয়া যদি লিখি, তাহা হইলে আর সহস্র বৎসর পরে কোন পণ্ডিত যদি এই দুই ভাষা (কথিত ও লিখিত ভাষা) মিলাইয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার মহা ভ্রম হইবে। তিনি মনে করিবেন মৈথিলী হিন্দি ভাষা হইতে এই দুইটা স্বতন্ত্র ভাষা বাহির হইয়াছে। সংস্কৃত বঙ্গভাষার অপভ্রংশ যে প্রাকৃত বঙ্গভাষা তাহা তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া উঠা কঠিন হইবে। যেমন আমরা দেখিতে পাই যে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ সাব্যস্ত করিয়াছেন যে সংস্কৃতের অপভ্রংশ প্রাকৃত নয়, কিন্তু উভয়ই স্বতন্ত্র ভাষা।

বেদের সংহিতার পর ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পর উপনিষদ, উপনিষদের পর



ইহাদিগকে আয়ত্তে আনিবার জন্য সূত্র সকলের সৃষ্টি। তাহার পরে গৃহ্যসূত্র বা স্মার্ত্তসূত্র, তারপরে মনুস্মৃতি, পরে রামায়ণ মহাভারত, তাহার পর পাণিনি ব্যাকরণ। রামায়ণ মহাভারত পাঠে বেশ বোধ হয় পাণিনি ব্যাকরণের নিয়মানুসারে উহাদের শ্লোকের সকল ক্রিয়া সন্ধি প্রভৃতি প্রযুক্ত হয় নাই। মনে কর মহাভারতে এক জায়গায় আছে,

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ।
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুং॥

এখানে 'প্রিয়া' শব্দের ষষ্ঠীতে 'প্রিয়ায়াঃ' হয়। 'প্রিয়ায়াঃ'র বিসর্গান্ত আকারের পরে 'অর্হসির' অকার থাকাতে বিসর্গের লোপ হওয়া উচিত, কবি তাহা করেন নাই। সংস্কৃত তখন চলিত ভাষা থাকাতে ব্যাকরণের তাবৎ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন না। এইরূপ রামায়ণে "করোমি" স্থানে অনেক সময়ে "কুর্ম্মি" দেখিতে পাইবে। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণেরা ঐ সকল স্থলে ভাষার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া ঐ সকলকে আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া বলিয়াছেন। আবার দেখা যায়, সংস্কৃত সাধু ভাষার মধ্যে অপভ্রংশ প্রাকৃত শব্দও সংস্কৃতরূপে চলিত হইয়া গিয়াছে। যেমন বেদের একটা অভিধান আছে তাহাকে 'নিঘণ্টু' বলে, কিন্তু 'নিঘণ্টু' শব্দ প্রাকৃত; 'নির্গ্রন্থ' শব্দের অপভ্রংশ নিঘণ্টু হইয়াছে। নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ নিঃশেষেতে গাঁথিয়া ফেলা অর্থাৎ এক এক অর্থের যত শব্দ তাহাদের এক এক শ্রেণীতে বাঁধিয়া ফেলা। মহাভারতে দেখ শ্রীকৃষ্ণের নামবাচক 'গোবিন্দ' শব্দ চলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা 'গোপেন্দ্র' শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ বই আর কিছুই নয়। বিশুদ্ধ সংস্কৃত, পাণিনির পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থকারদিগের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন কালিদাসের সংস্কৃত। যদিও কালিদাসের গ্রন্থেও ব্যাকরণদোষ দুই একটা না পাওয়া যায় যে, তাহা নয়।

সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে যে যে সম্বন্ধের কথার উল্লেখ করিলাম, এ সকলেরই উদাহরণ বাঙ্গলাতে ঢের ঢের পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা আমাদের এই শিক্ষা হইতেছে যে, আমরা বঙ্গভাষাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ না করিয়া ফেলি, কিন্তু ভাষার স্বাধীনতার দ্বার যেন মুক্ত রাখি, তাহা হইলে যদিও ইহার নিয়ম বদ্ধ হইতে দেরী লাগিবে কিন্তু ভাষার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্ট ও সারবান হইয়া

পণ্ডিত মূর্খ উভয়েরই অনুকূল হইবে।

সেই পুরাকালে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সমকালীন ভিন্ন ভাষারূপে প্রচলিত থাকিবার আর এক কারণ এই ছিল যে, পণ্ডিতদিগের মূর্খের সহিত বড় ঘনিষ্ঠতা ছিল না, আর দূর দূর দেশে যাতায়াতেরও সুবিধা ছিল না। আর্য্যেরা যত হিন্দুস্থান জয় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহারা আপনাদের সমগ্র জাতি হইতে দূরে পড়িতে লাগিলেন, ততই সংস্কৃতের অপভ্রংশ হইবার সুবিধা হইতে লাগিল—তাহাকে কেহ প্রতিবন্ধক দিয়া রাখিতে পারিলেন না। যদি সে সময় লেখা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ দূরতার অভাব মোচন হইত। মহাভারতাদির সময় লেখার প্রচার হইলেও উহা বহুপরিশ্রমসাধ্য বলিয়া এবং পুঁথির অনাটন বলিয়া সাধারণের অগোচর থাকিত। সমস্ত বহুবিস্তৃত শাস্ত্র কণ্ঠস্থ রাখা ইহা কি বৃহদ্ব্যাপার! তজ্জন্য ব্রাহ্মণেরা কি কৃতজ্ঞতার পাত্র! এমন আর কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন লেখা ও মুদ্রাযন্ত্রের বহু প্রচার জন্য বঙ্গভাষার যেমন উন্নতিও আশা করা যাইতে পারে উহা যে দীর্ঘজীবী হইবে তাহারও আশা হয়।

---

# সাংখ্যস্বরলিপি।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

সত্যসূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
দারাসুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায়।
সে অতীত ত্রৈগুণ্য উপাধি কল্পনাশূন্য, ভাব তাঁরে হবে ধন্য সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।

মাকুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদং মখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।
নলিনীদলগত জলবত্তরলং
তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।
দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ,
শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু স্তদপিন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ।
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণ স্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ।

কথা—রামমোহন রায়। সুর—বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তালি | ১ | ২ | ৩ | | ০ | (ভো) | ॥ |
| মাত্রা | ৪ | ৪ | ৪ | | ২,১(স্থা),১(স্ত) | | ॥ |

(স্থা) ঃ— মা নঁ্ধাঁ । + ধাঁ পা পা২্ মা২্
(স্থা) ঃ— স ত্য । — — স্ব —

পা । মা২ পা২্ মা২্ + মা । + "মা২" বা "মা গা" পা
চ । না — — — । — — — বি

রেঁ । সা৩ সা । রেঁ র্‌ঁমা গা মা । ম্ধাঁ৩
— । না স । ক লি — বৃ । ধা

পা । নিঁ ধাঁ ধাঁ২্ ধাঁ২্ পা২্ মা২্ পা২্
— । — — — — — — — ।

মা২্ গা২্ মা (স্থা-পু) ঃ— মা ম্ধাঁ ।
— — — (স্থা-পু) ঃ— স ত্য ।

+ ধাঁ পা পা২্ মা২্ পা । মা৪ । ম্পা
— — স্ব — চ । না । —



গা গা রেঁ । সা৩ (স্ত) ঃ— ধাঁ । ধাঁ
— বি — । না (স্ত) ঃ— সে । অ

ধাঁ সা নি । সা৪ । + সা সা সা২্ নি২্ ।
তী — ত । ত্রৈ । — গু ণ্য — ।

সা৩ ধাঁ । ধাঁ ধঁ্সা নি সা । সা স্‌রেঁ৩ ।
— উ । পা ধি — ক । ল্প না ।

+ রেঁ সা সা২্ নিঁ২্ সা । নঁ্ধাঁ৩ ধাঁ ।
— — শূ — — । ন্য ভা ।

ধাঁ ধাঁ সা নি । সা সা সা২ । + সা২
ব তাঁ — রে । হ বে — । —

সা২্ নিঁ২্ সা । নঁ্ধাঁ৩ পা । ধাঁ ধঁ্নিঁ ধাঁ
ধ — — । ন্য স । র্ব্ব শা স্ত্রে

পা½ নি৺½ । নি৺ ধা৺৩ । ধা৺ পা ধা৺½ ধা৺½
— — । গা — । — — — —

পা½ মা½ পা½ । মা½ গা½ মা
— — — । — — —

( স্থা-পু ) ঃ— মা ন৺ধা৺ । + ধা৺ পা
( স্থা-পু ) ঃ— স ত্য, । — —

পা½ মা½ পা । মা৪ । + মা গা৩ ।
সৃ — চ । না । — — ।

( ভো-প্র ) ঃ— মা২ মা½ গা½ মা
( ভো-প্র ) ঃ— মা কু — রু
( ভো-দ্বি ) ঃ— ন লি নী —
( ভো-তৃ ) ঃ— দি ন ষা —
( ভো-চর্থ ) ঃ— বা — ল



পা পা পা পা । ধা৺২ ধা৺ ধা৺ ।
ধ ন জ ন । যৌ ব ন ।
দ ল গ ত । জল বৎ — ।
মিন্ — স্তৌ — । সা য়ং — ।
স্তা — বৎ — । ক্রী ড়া — ।

পৃধা৺। পা½ ধা৺½ পা২ । ধা৺ ধা৺ ধা৺ ধা৺ ।
গ — — র্ব্বং । হ র তি নি ।
ত — র লং । ত — দ্ব দ্ ।
প্রা — — তঃ । শি শি র ব ।
স — — ক্তঃ । স্ত রু ণ — ।

ধা৺ সা½ নি½ সা২ । সা½ নি½
মে — — ষাৎ । কা —
জী — — বন । অ —
স — — স্তৌ । পু —
স্তা — — বৎ । ত্ত —

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রেঁ | সা২ | \| | সা½ | নি½ | সা | নঁ্ধাঁ২ | \| |
| — | ল | \| | স | — | — | র্ব্বং | \| |
| তি | শয় | \| | চ | — | প | লং | \| |
| ন | রা | \| | য়া | — | — | তঃ | \| |
| ক্ল | ণী | \| | র | — | — | স্কঃ | \| |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধাঁ২ | ধাঁ২ | \| | ধাঁ | ধাঁ | পা | মা | \| | ধাঁ | ধাঁ | ধাঁ২ | \| |
| মা | য়া | \| | ম | য় | মি | দ | \| | ম | খি | লং | \| |
| ক্ষণ | মিহ | \| | স | — | জ্জ | ন | \| | সং | — | গতি | \| |
| কা | লঃ | \| | ক্রী | — | ড় | তি | \| | গ | — | চ্ছ | \| |
| বৃ | দ্ধ | \| | স্তা | — | ব | ত | \| | চি | — | স্তা | \| |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নিঁ২ | সা২ | \| | ধাঁ | ধাঁ | ধাঁ | ধাঁ | \| | সা২ | সা | সা | \| |
| হি | ত্বা | \| | ব্রহ্ম্ | — | ম | প | \| | দং | প্র | বি | \| |
| রে | কা | \| | ভ | ব | তি | ভ | \| | বা | র্ণ | ব | \| |
| ত্যা | যু | \| | স্ত | দ | পি | ন | \| | মু | — | ক্ত | \| |
| মগ্ন | নঃ | \| | প | র | মে | — | \| | ব্রহ্ | ম | ণি | \| |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নি½ | সা½ | রেঁ | সা | সা | \| | নিঁ¼ | ধাঁ¼ | পা¼ | নিঁ |
| শা | — | — | শু | বি | \| | দি | — | — | — |
| ত | — | র | ণে | — | \| | নৌ | — | — | — |
| ত্যা | — | — | শা | — | \| | বা | — | — | — |
| কো | — | — | পি | ন | \| | ল | — | — | —পূ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধাঁ½ | ধাঁ½ | পা¼ | মা¼ | পা½ | \| | মা½ | গা½ | মা |
| স্বা | — | — | — | — | \| | — | — | — |
| কা | — | — | — | — | \| | — | — | — |
| যু | — | — | — | — | \| | — | — | — |
| ন | — | — | — | — | \| | — | — | — |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (স্বা-পূ) | মা | নঁ্ধাঁ | \| | + | ধাঁ | পা | পা½ | মা½ |
| (স্বা-পূ) | স | ত্য | \| | | — | — | স্থ | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| পা | \| | মাঃ | ‖ ‖ |
| চ | \| | না | ‖ ‖ |

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল একতালা ।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদিকারণে
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।
বিষয়ের দুঃখ নানা বিষয়ীর উপাসনা,
ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে।

কথা—রামমোহন রায়। স্থর—বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তালি। ১ । ২ । ৩ । ০ (স্থা) ॥
মাত্রা। ৪ । ৪ । ২ । ২ ॥

২............
(স্থা-পু) ঃ— সা সা½ নি̐½ । মা২ মা মা ।
(স্থা-পু) ঃ— স্ম র — । — প র ।

পা মা ম্গাঁ । + গাঁ রে । ম্গাঁ২ । + গাঁ২
মে — — । — শ্ব । রে । —

মা মা । পা২ ধা২ । ধ্নি̐ নি̐ ।
অ না । দি — । — কা ।



২............ ২
নি̐২ । সা২ সা½ নি̐½ ন্̐রে ।
— । — — — র ।

২ ২
সা২ নি̐ ধা । পা½ ধা½ নি̐½ সা½ ।
ণে — — । — — — — ।

২
সা নি̐½ ধা½ । নি̐½ পা½ + পা মা মা ।
স্ম র — । — — — প র ।

স্পা২ মা + ম্গাঁ । + গাঁ রে । ম্গাঁ২ । গাঁ ।
মে — — । — শ্ব । রে । বি

২
গাঁ গাঁ গাঁ । মা ধা ধা সা½ নি½ ।
বে ক বৈ । রা — গ্য দু — ।

২..........................................................
সা সা । সা সা । মা½ গাঁ½ মা রে½
— ই । স হা । — — — —

সা৷ রে । সা২ নিঁ ধা । পা৷ ধা৷
— সা । ধ — — । নে —

নিঁ৷ সা৷ । (স্থা-পু) ঃ— সা নিঁ৷ ধা৷ ।
— — । (স্থা-পু) ঃ— স্ম র — ।

নিঁ৷ পা৷ + পা (স্ত) ঃ— মা মা ।
— — — (স্ত) ঃ— বি ষ ।

মা২ নিঁ ধা । সা সা । সা স্না ।
য়ে — — । — য় । ত্বঃ খ ।

। + সা২ সা৷ নিঁ৷ সা । সা৩ সা৷ নিঁ৷ ।
। — না — — । না বি — ।

সা৷ নিঁ৷ সা । রে রে৷ সা৷ ।
ষ — য়ী । র — — ।



সা সা৷ নিঁ৷ রে । সা২ নিঁ ধা ।
উ পা — স । না — — ।

পা৷ ধা৷ নিঁ৷ সা৷ । সা নিঁ৷ ধা৷ ।
— — — — । ত্য জ — ।

ধ_নিঁ পা মা মা৷ গাঁ৷ । মা ধ_নিঁ
ম — — ন এ । য —

ধা সা৷ নি৷ । সা সা । সা সা৷
— ত্র — । — ণা । স ত্য

নিঁ৷ । মা রে সা রে স্রে ।
— । — — — ভা ব ।

সা২ নিঁ ধা । পা৷ ধা৷ নিঁ৷
ম — — । — — —

২.........................................

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা২ | । | (স্থা-পু) ঃ— | সা | নিঁ২ | ধা২ | । |
| — | । | (স্থা-পু) ঃ— | স্ম | র | — | । |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নিঁ২ | পা২ | + | পা | মা | মা | । | স্পাঃ | ॥ | ॥ |
| — | — | | — | প | র | । | মে | ॥ | ॥ |

---

রাগিণী ভৈরব—তাল আড়াঠেকা।

এই হল এই হবে এই বাসনায়। দিবানিশি মুগ্ধ হ'য়ে দেখিতে না পায়। মরে লোক প্রতিক্ষণে দেখে তবু নাহি জানে, না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায়।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং।

কথা—রামমোহন রায়। স্থর—কালিমুকুয্যে।

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তালি | । | ১ | । | ২ | । | ৩ | । | ০ ॥ |
| মাত্রা | । | ৪ | । | ৪ | । | ৪ | । | ৩,১(স্থা,স্ত,) ॥ |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (স্থ) ঃ— | মা | । | গা | মা | পা২ | । | পা২ | মা২ |
| (স্থ) ঃ— | এ | । | ই | হ | ল | । | এ | — |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পা | নঁ্ধাঁ২ | । | পা | মা | প্ধাঁ২ | ধাঁ২ | পা২ | মা২ |
| — | ই | । | — | — | হ | — | — | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পা২ | । | মা | গা | রেঁ | রেঁ | । | রেঁ | রঁ্মা২ | গা | । |
| — | । | বে | -- | — | এ | । | ই | বা | — | । |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্পা | মা | মা২ | । | স্পা | গা | রেঁ২ | । | সা২ |
| — | স | না | । | — | — | — | । | — |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | "স্গা" বা | "গ্রেঁ" | । | + | রেঁ | রেঁ২ |
| দি | বা | বা | । | | — | — |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সা২ | সা | সা | । | স্রেঁ২ | নি২ ২ | সা |
| — | নি | শি | । | — | — | — |

মা মা । + মা গা মা মধাঁ । ধাঁ৩ ধাঁ ।
মু গ্ধ । — — হ য়ে । — দে ।

২········· ২ ২
ধাঁ ধঁসা সা নঁসা½ নঁসা½ । নধাঁ৩ পা ।
থি তে — না — । পা — ।

+ পা ধাঁ নঁধাঁ ধাঁ½ পা½ । (স্থা-পু):— পধাঁ½
— — — — — । (স্থা-পু):— এ

পধাঁ½ পা½ মা½ পা মা¼ গা¼ । মা½ গা½
— — — — ই — । — —

মা পা২ । পা¼ মা¼ পা নঁধাঁ২ । পা মা
হ ল । এ — — ই । — —

মধাঁ½ ধাঁ½ পা¼ মা¼ পা½ । মা গা
হ — — — — । বে —



২
রে (স্ত-প্র):— ধাঁ । ধাঁ ধাঁ সা নি ।
— (স্ত-প্র):— ম । রে লো — ক ।

২········· ২············
সা সা২ নি । সা২ সা "নি½ সা½"
প্র তি — । — ক্ষ — —

২ ২················· ২
বা + "সা¼ নি¼ সা½" । সা৩ ধাঁ । ধাঁ ধঁসা
— — — । গে দে । খে ত

২······································· ২
নি সা । রেঁ রেঁ৩ । + রেঁ সা নসা
— বু । না হি । — — জা

"নিঁ½" বা "নি½" সা½ । নধাঁ২ পা পা ।
— — — । নে — না ।

। নিঁ নিঁ½ ধাঁ½ ধাঁ২ । পধাঁ পা৩ ।
। ম রি — ব । এ ই ।

। মা গা মা২ গা২ মা । ম্ধাঁ৩ ধাঁ । ধাঁ
। — — — — ম । নে কি । আ

২.......... ২..........
রেঁ২ সা২ সা সা । ন্সা সা নিঁ
— — শ্চ র্য্য । হা — —

"ন্ধাঁ" বা "নিঁ২ ধাঁ২" । + ধাঁ পা + পা ধাঁ ।
— — — । — — — — ।

। ন্ধাঁ২ (স্থা-পু) ঃ— প্ধাঁ পা২ মা২ ।
। — (স্থা-পু) ঃ— এ ই — ।

পা২ মা২ গা২ মা পা২ । পা২ মা২ পা
— — — হ ল । এ — —

ন্ধাঁ২ । পা মা ম্ধাঁ ধাঁ২ পা২ মা২ পা২ ।
ই । — — হ — — — — ।

মা গা রেঁ (স্ত-দ্বি) ঃ— ধাঁ । ধাঁ
বে — — (স্ত-দ্বি) ঃ— অ । হ



২ ২.......... ২...
ধাঁ সা নি । সা + সা + সা নি । সা
ত্য হ নি । ভূ — — — । —

.......... ২..........
+সা সা নি । সা সা + সা ধাঁ ।
— তা — । — নি — গ ।

২ ২..........
। ধাঁ ধ্সা নি সা । সা স্রেঁ৩ ।
। চ্ছ স্তি — য । ম ম ।

.......... ২ ২
+ রেঁ সা ন্সা২ নিঁ২ সা । নিঁ২
— — ন্দি — — । রং

ধাঁ২ + ধাঁ পা পা । নিঁ নিঁ
— — — শে । — ষা

ধাঁ ধাঁ । প্ধাঁ প্ধাঁ পা২ । মা গা
— স্থি । র ত্ব মি । — —

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মাঃ | গাঃ | মা | । | মনি২ | নি | নি | । |
| — | — | চ্ছ | । | ন্তি | কি | মা | । |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ন্রেঁ | সা | সা | সা | । | ২ন্সাঃ | নিঁঃ |
| — | — | শ্চ | র্য্য | । | ম | — |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২সা + সা | ২ন্সাঃ | নিঁঃ | । | ২সা | নিঁঃ | ধাঁঃ |
| তঃ — | প | — | । | — | রং | — |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পা | ধাঁ | । | নিঁঃ | ধাঁঃ | + ধাঁ | (স্থা-পু):— |
| — | — | । | — | — | — | (স্থা-পু):— |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্ধাঁ | পাঃ | মাঃ | । | পা৩ | মা৩ | গা৩ | মা |
| এ | ই | — | । | — | — | — | হ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| পাঃ | । | পাঃ | ॥ ॥ |
| ল | । | এ | ॥ ॥ |

# রাঙা-আলু-সিদ্ধ গুড় দিয়া।

উপকরণ।—রাঙা আলু আধসের, গুড় তিন ছটাক, জল এক পোয়া (গুড়ে মিশাইবার জন্য)।

প্রণালী।—আধসের রাঙা আলু আনিয়া প্রথমে তাহার খোসা ছাড়াইয়া ফেলিবে, তারপরে ধুইয়া জলে সিদ্ধ করিতে চড়াইয়া দিবে। যখন দেখিবে আলুগুলি বেশ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন জলটী ঝরাইয়া আলুগুলি তুলিয়া রাখিবে। এখন তিন ছটাক গুড়ের সঙ্গে এক পোয়া জল মিশাইয়া সেই গুড়ে আবার আলুগুলি সিদ্ধ কর। জলটা মরিয়া গিয়া গুড়টা অল্প ঘন হইয়া আসিলে নামাইয়া ফেল।

ভোজন বিধি।—জলপানে বাজারে খাবারের পরিবর্ত্তে এইরূপ সহজ-প্রস্তুত ঘরের দ্রব্য ব্যবহৃত হইলে দুষ্য ঘৃতাদিজনিত অম্লরোগের ভীতি অনেকটা কমিতে পারে।

# কাঁচা আম দিয়া মটন্-কারি।

উপকরণ।—ভেঁড়ার মাংস এক সের, পেঁয়াজ-বাঁটা এক ছটাক, আদা একটুকরা, হলুদ-বাঁটা এক তোলা, দই আধ পোয়া, নুন এক তোলা, ঘি আধ ছটাক, আলু আটটী, জল তিন পোয়া, কাঁচা আম্ দুইটী, পটোল ছয় সাতটী।

প্রণালী।— এক সের ভেঁড়ার মাংসে এক ছটাক পেঁয়াজ-বাঁটা, একটুকরা আদা-বাঁটা, এক তোলা হলুদ-বাঁটা, আধ পোয়া দই, এক তোলা নুন ও আধ ছটাক ঘি এইগুলি সব মাখিয়া একটী কলাই-করা হাঁড়ি কিম্বা মাটির তিজেল হাঁড়ি করিয়া উনানে চড়াইয়া দাও। সরা দিয়া হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া দাও।

ভাপে ভাপে মাংস সিদ্ধ হইয়া আসিলে পর, আটটী আলু অর্দ্ধেক করিয়া কাটিয়া ইহাতে দাও, এবং এই সঙ্গে আধসের বা তিন পোয়াটাক আন্দাজ জল দাও। তারপরে আলু সিদ্ধ হইয়া গেলে, দুটী কাঁচা আম বানাইয়া ছয় টুকুরা করিয়া এবং ছয় সাতটী পটোল অর্দ্ধেক করিয়া কাটিয়া ইহাতে ছাড়িয়া দিবে। মাংস ও তরকারী সিদ্ধ হইয়া ভাল রকম নরম হইয়া আসিলেই কারী রাঁধা হইয়া গেল। ইহাতে দেড় পোয়াটাক্ ঝোল থাকিবে। বেশী ঝোল রাখিতে ইচ্ছা করিলে বেশী পরিমাণে জল দিতে হইবে।

ভোজন বিধি।—লুচি, ভাত, খেচুড়ি প্রভৃতির সঙ্গে খাও বেশ লাগিবে।

---

# কুইন্স্ কেক্।

উপকরণ।—চিনি এক পোয়া, মাখন এক পোয়া, ডিম ছয়টা, * ময়দা পাঁচ ছটাক, ভাজা কিসমিস এক ছটাক, জায়ফল আধখানা, দারচিনি-গুড়া এক চুট্‌কি ভর।

প্রণালী।—প্রথমে মাখনটা একটু জল-হাত করিয়া একটা পাথরে ফেনাইয়া লও, তারপরে চিনি, জায়ফল-গুঁড়া ও দারচিনি-গুঁড়া মাখনের সঙ্গে বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া লও। ছয়টা ডিম ভাঙ্গিয়া বেশ করিয়া চামচের দ্বারা ঘাঁটিয়া লও। ডিমের অর্দ্ধেকটুকু মাখনের সঙ্গে মিশাইয়া দশ মিনিট কাল ধরিয়া খুব ফেনাও। এক্ষণে ইহাতে অল্প অল্প করিয়া ময়দা দিতে থাক আর ফেনাইতে থাক। সবশেষে কিসমিস দাও। ইহা যত ফেনাইবে ততই বাড়িতে থাকিবে। তারপরে একটী বড় অথবা ছোট ছোট কয়েকটী টিনের

* হাঁসের ডিম হইলেই চলিবে কিন্তু তাহাতে আঁশটে গন্ধ হয়। ইংরাজেরা সচরাচর এ সকল খাদ্য মুর্গীর ডিম দিয়াই করিয়া থাকে। মুর্গীর ডিম ব্যবহৃত হইলে আঁশটে গন্ধ হয় না।



ছাঁচে ঢালিয়া দাও। টিনের ছাঁচের অভাবে বিস্কুটের বাক্স বা অন্য কোনরূপ টিনের কৌটায় ঢালিতে পার। এইবারে কাঠের কয়লার আগুনের উপর একটা টিন বা লোহার তাওয়ার মত দিয়া তাহার উপরে টিনের ছাঁচগুলি রাখিতে হইবে। টিনের ছাঁচগুলি রাখিয়া তাহার উপরে আরেকটী তাওয়ার মত কিছু রাখিয়া তাহার উপরেও জ্বলন্ত কাঠ-কয়লা রাখিয়া দিতে হইবে। এইরূপে উপর নীচে আগুন দিয়া কেক সেঁকিতে হইবে। কাঠকয়লার আগুনের আঁচ বেশী তেজ-আঁচ না হয় যেন, বেশ নরম আঁচ করিয়া দেওয়া চাই। এইরূপে সেঁকাকেই ইংরাজীতে 'বেক' করা বলে। যাঁহাদের রাঁধিবার ঘরে সেঁকিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে তাঁহারা তাহাতেই করিবেন। আমরা সাধারণের জন্য সহজ উপায়ে যেরূপে প্রস্তুত করিতে পারা যায় তাহাই এখানে বলিলাম। তৈয়ারী করিতে প্রায় ঘণ্টা তিন সময় লাগে। পাঠকগণ সহজে এইরূপে ঘরে ঘরে কেক্ প্রস্তুত করিতে পারিলে আর বাজারে বেশী মূল্য দিয়া কেক্ কিনিতে হইবে না।